ঠের দশায় কি কর্ম্মক্ষেত্রে—কি ভ্রমণ কালীন্—কি নিমন্ত্রণে—সকল সময়েই স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্ষতি সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাই উচিত।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রণে আহারের সময় সমাজহিতকর বা রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন করি না। কেবল আহারের ভাল মন্দ ও অমুকের বাটিতে বেশ পরিপাটি ভোজ হইয়া থাকে ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ঠিক ইহার বিপরীত। ভোজগুলি প্রায়ই বিশেষ ফলদায়ক হয়। অমুক চিকিৎসালয়ে মূল ধন কমিয়া গিয়াছে বা একটি নূতন বাটীর আবশ্যক, একটি ভোজের আয়োজন হইল। এমন কি রাজপুত্রেরাও ইহাতে যোগ দিয়া অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। প্রকাশ্য ভোজে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কোন একটি গুরুতর রাজকীয় বিষয়ে কোন দলের কি মত তাহা ভোজ শেষে বক্তৃতাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা কোন বিষয়ে নিজের মত প্রায়ই প্রকাশ করেন না কিন্তু কোন প্রকাশ্য ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে আহারশেষে বক্তৃতার সময় মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। একত্র ভোজনে ইংরাজের বন্ধুতা যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া থাকে এমত আর কিছুতেই হয় না। পারিবারিক ভোজ গুলিও ইংরাজ সমাজে বিশেষ আদরণীয়। অবিবাহিতা কন্যাদিগের পক্ষে এই ভোজ গুলি স্বয়ম্বর সভার ন্যায় কার্য্য করে। যাঁহার অবিবাহিতা যুবতী কন্যা আছে তিনি অবিবাহিত নিজ মনোমত যুবকদিগকে প্রায়ই পারিবারিক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। এই উপায় দ্বারা অবিবাহিত যুবক যুবতীদিগের মিলন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সামাজিক সকল কাজেই আহার একটি প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। অতএব ভক্ষ্য দ্রব্যের বিশেষ জ্ঞান ও আহারের নিয়ম যে ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আবশ্যক তাহার আর সন্দেহ কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এল্, এম্, এস্।

হিমালয়ে প্রকৃতি দর্শন।

স্থান—ধবলগিরির উপত্যকা।

সময়—অন্ধকার রাত্রি।

উঃ কি গভীর নিশি, ঝাঁ ঝাঁ করে দিশি দিশি
দেব-মন্ত্রে মুগ্ধ চারি ধার,
সহসা মনেতে হয়, এ যেন পৃথিবী নয়,
ধরার নাহিক ধারে ধার।
স্বন্‌ঃস্বন্‌ বহি বায়, নীহার কাঁপায়ে গায়,
এ ত নহে ধরার পবন,
এই যে আঁধার ঘন, ছিদ্র তাহে নাহি যেন,
কে দেখেছে ভূতলে এমন।
এ ঘোর গগণ-গায়, কি ওই মহান ছায়
দিগন্ত ক'রেছে আবরণ!
ও কি রে বিরাট মূর্ত্তি—অনন্তের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—
কল্পনার অসাধ্য সাধন!
কটাক্ষে পৃথ্বিরে ঠেলি, ব্যোমমার্গ ঢেকে ফেলি
সপ্তম স্বরগে ওঠে শির,
বক্ষে ভ্রমে মেঘরাশি, বিকট হাসিয়ে হাসি
নেচে যায় চপলা অধীর।
অহো কি কঠোর ঠাঁই, শব্দ সাড়া কিছু নাই,
অনির্দ্দেশ—মহান—গম্ভীর!
প্রকৃতি! পেয়েছি তোরে, আর না ঘুরিব ঘোরে
এই তোর তপস্যা-মন্দির?
উর তবে মহামায়া! দেহ গো চরণ ছায়া,
কাতরে কর গো কৃপাদান,
আকুল ব্যাকুল হোয়ে দুর্ব্বল পরাণ লোয়ে
করেছি তোমার বহু ধ্যান।

মা গো মা! খুঁজেছি তোরে, শ্মশান-মশান ঘোরে
দেদীপ্য বিভীষিকা মাঝে,
ও প্রতিমা হেরিবারে, বসি মহাসিন্ধু ধারে
উপেক্ষা করেছি বৃষ্টি-বাজে!
কে জানিত এই স্থলে, এই মহা হিমাচলে
তুমি মা গো পেতেছ আসন,
উরঃ তবে মহামায়া, মাগি ও চরণ-ছায়া
একবার দেহ দরশন!
একবার কহ মাতঃ কিছুই ত বুঝিনা ত
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিলে,
বিশাল মশান ভূমি এই যে এ বিশ্ব এ তুমি
কোন প্রাণে কহ বিরচিলে?
আঁধারে আবৃত মা গো—কিছুই ত দেখনাগো
কি হতেছে শূন্য জলে স্থলে,
অধিক শকতি যার দুর্ব্বল শীকার তার,
মমতার গন্ধ নাহি মূলে।
বাজ পক্ষী ছিঁড়ে খায় হীনশক্তি চটিকায়,
শার্দ্দুল চিবায় হরিণীরে,
মকরে মমতা নাই, ক্ষীণ ক্ষুদ্র মাছে তাই
অকাতরে গ্রাসে সিন্ধু নীরে!
কি আর বলিব হায়, মানুষে মানুষ খায়,
হৃদয়ে হৃদয় করে গ্রাস,
যদি সে শকতি পায়, পরাণ চিবায়ে খায়
দেখিয়ে গৃধিনী পায় ত্রাস।

বাজ পক্ষী রূঢ় অতি, বিষধর ক্রূরমতি
    শার্দ্দূল নৃশংস অতিশয়,
হিংস্রক মকরগণ, মানুষ পাষাণ মন
    এই ত কলঙ্ক দেশময়।
কিন্তু মা প্রকৃতি তোরে, জিজ্ঞাসি কহ ত মোরে
    কার দোষ কাহারে চাপাই !
জীব জন্তু কে সৃজিল, কেই বা প্রবৃত্তি দিল
    সে প্রবৃত্তি কোথা পায় ঠাঁই ?
নিজে সব বিরচিলে, নিজেই প্রবৃত্তি দিলে
    বল দেবি ! অপরাধ কার ?
স্বাধীন কে আছে ভবে, ঘোর পরাধীন সবে
    ইচ্ছা শক্তি প্রকৃতি বিকার ?
জনম-মন্দিরে মা গো জানি নাই কিছু যেগো
    হাসিনু কাদিনু মন্ত্র বলে,
কিসে যে হাসিতে হয়, কিসে যে কাঁদিতে হয়
    কহ তা আমারে কে শিখালে !
যৌবন, মোহের মায়া, স্বপনের উপছায়া
    দীপ্ত প্রাণ দগ্ধ দুরাশায়,
ফুটন্ত না হতে ফুল, কীটে করে ছিন্নমূল,
    শুষ্ক পাপ্‌ড়ী ঝরে ঝরে যায়।
বার্দ্ধক্যে শিথিল অঙ্গ, জীবন স্বপন ভঙ্গ
    ঔদাস্য বৈরাগ্যময় প্রাণ,
মরণ আসিলে ক্রমে, তরুটী লুটায় ভূমে,
    মাটীতে মাটীর অবসান !
এই ত জীবন লীলা, তোমার সখের খেলা,
    আমি ত গো পুত্তলিকা তার,
যেমন খেলাও তুমি তেমনি ত খেলি আমি
    নাহি স্বত্ব আমাতে আমার !
এ ঘোর ভবের ঘোরে, তুমিই ফেলিলে মোরে
    উঠি পড়ি তোমারই শাসনে,
ক্ষুদ্র শক্তি এ আমার, তৃণ-বাঁধ ঝটিকার,
    চলিবে ত তোমারি চালনে !
বুদ্ধি—সেত বল-হীন, জ্ঞান—সেত ভ্রমাধীন
    বিবেক ত অহঙ্কারময়,
আমি ত প্রবৃত্তি-দাস, পরায়েছ মায়াফাঁস
    এ আমি তোমারি বই নয় !
এ ঘোর মরুভূ ভবে, তুমি না রাখিলে তবে
    কে আর রাখিবে, মহামায়া !
কিন্তু গো পাষাণ মেয়ে (কঠোর পাষাণ চেয়ে)
    কই তোর মাতৃস্নেহ ছায়া ?

*   *   *
*   *   *

(পরদিন সন্ধ্যাকালে
স্থান ধবলগিরি—)

একি গো প্রকৃতি এবে মূরতি তোমার !
ভয়ে রুদ্ধ হৃদে মোর রুধিরের ধার।
এই ছিলে উল্লাসিনী, কেন হলে উন্মাদিনী,
    মৌন মুখে কেন দেবি বজ্রের হুঙ্কার ?
    মহামায়া কেন এবে এ মূর্ত্তি তোমার !
এই যে সুন্দরী-সাজে, শত ইন্দ্রধনু মাঝে,
    প্রশান্ত হরষ দীপ্তি করি বিকীরণ
নীরবে গাহিয়ে গান, মাতালে ভক্তের প্রাণ,
    জাগালে মর্ত্তের মাঝে নন্দন কানন,
গভীর রক্তিম ঘটা, অস্তমিত ভানুছটা,
    এই যে গো পরেছিলে সীমন্ত প্রদেশে,
জড়ায়ে রতন বাস হাসিয়ে মধুর হাস,
    রেখেছিলে পা দুখানি মেঘের উরসে !
    সে মূর্ত্তি এখন দেবি, লুকালে কোথায়,
    একি লীলা, লীলাময়ী, কহ গো আমায় !
একেবারে চারিধার, ঘনঘোর অন্ধকার,
    জমাট বেঁধেছে মেঘে ছিদ্র নাহি তার,

নদ নদী গাছ পালা, হিমাদ্রি শিখর মালা
লুকায়েছে, হারায়েছে, ডুবেছে কোথায়!
চপলা বিকট হাসি, বিদারি নীরদ রাশি
লহরে লহরে ঘন ঘনীভূত করে,
প্রলয়ের পরমাদ কড় কড় বজ্রনাদ
লাফায়ে লাফায়ে ছোটে শিখরে শিখরে।
শত গুণ প্রতিশব্দ, দিগঙ্গনা ভয়ে স্তব্ধ
সুকুমার বুকে রাখে আটকি নিঃশ্বাস,
বাসুকি অধীরপ্রায়, ঘন ভূকম্পন তায়
ব্রহ্মাণ্ডের আজ বুঝি হয় সর্ব্বনাশ!
ইন্দ্রকরী কর পারা, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা
আকাশ উজাড়ি যেন হতেছে বর্ষণ,
উথলি উঠেছে হ্রদ, উচ্ছ্বসিত নদী নদ
ঐক্যতানে করে সবে বিকট গর্জ্জন।
আছাড়িয়ে পাছাড়িয়ে, গিরি খণ্ড বিচূর্ণিয়ে
বিদরিয়ে বীরদর্পে ক্ষীণ ধরাতলে
অধীর উন্মত্ত পারা, ছুটেছে নির্ঝর-ধারা
সক্রোধে পশিছে যেন রসাতল তলে।
সর্ব্ব সংহারিতে যেন, ভয়ঙ্করী রূপে হেন
কেন গো প্রকৃতি আজি সাজিলে এ বেশে,
ক্ষান্ত হও মহামায়া! সংহর প্রলয় ছায়া,
গেল যে এ তৃণ ধরা রসাতল দেশে!
তুমি ত চলিলে ক্রোধে,কে তব ও গতি রোধে
কে পারে রাখিতে তব প্রতাপ ভীষণ!
ক্ষীণ এ পৃথিবী অতি তার কেন এ দুর্গতি
তার প্রতি কেন দেবি তাড়না এমন!
না ভ্রূক্ষেপি আগুপিছু, কটাক্ষ না করি কিছু
তুমি ত আপন তেজে চল গো গরবে—
উথলি সহস্র ধারা—বিচূর্ণিয়ে গ্রহ তারা
আকুল করিয়ে তোল দেবতা দানবে,
তোমার বিক্রম দেবি কেবা জানে ভবে।

বুঝি নাকি দেবি, তব মাতৃমমতায়
ভেবেছ কি চণ্ডালিনী চিনি না তোমায়!
কহ মাতঃ সত্য করি—বিদীর্ণিয়ে অগ্নিগিরি
ছাইয়ে বসুধা ব্যোম অনল শিখায়—
জীব জন্তু কত প্রাণ, রত্নশালী কত গ্রাম
বিসর্জ্জিলে অকাতরে জ্বলন্ত চিতায়!
ভীষণ ঝটিকা ঝড়ে—নির্ম্মম বন্যার তোড়ে
সর্ব্বনাশা ভূকম্পনে মাতিয়ে, জননি!
অবনীর স্তরে স্তরে প্রলয় বিপ্লব করে
কে খেলে রাক্ষসী লীলা সর্ব্ব সংহারিণী! ২
ছুঁড়িয়ে অনন্ত শূন্যে ভীম ধূমকেতু
একটী সমগ্র গ্রহ চূর্ণিলে কি হেতু?
বুঝি নাকি দেবি তব মাতৃমমতায়!
ভেবেছ কি চণ্ডালিনি চিনি না তোমায়!
যুগ যুগান্তর ধ'রে এত যে যতন করে
তুচ্ছ এক তৃণগাছি করিলে প্রকাশ,
এত কোটী কোটী কল্পে, প্রাণপণে অল্পে অল্পে
জড়ে প্রাণ, প্রাণে বুদ্ধি, করিলে বিকাশ,
পরিণাম কিবা তার—যদি তুমি বার বার
ভাঙ্গ গড় গড় ভাঙ্গ, সৌখীন লীলায়,
সৃষ্টি নাশে যদি তোর, এতই আমোদ ঘোর,
ব্রহ্মময়ি! ধিক তব ব্রহ্মাণ্ড গড়ায়!
করিছ মরণ-বৃষ্টি, যাহে লয় হয় সৃষ্টি
যাহে বিশ্ব রসাতলে লণ্ড ভণ্ড যায়—
গড়িতেছ গড় আরো, ভাঙ্গিতেছ যত পারো,
প্রণমি, প্রকৃতি তব মাতৃ মমতায়!

*　　*　　*

*　　*　　*

*　　*　　*

*　　*　　*

(সময়—পূর্ণিমা নিশি।)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি, স্বপ্রকাশ দিশি দিশি
　জোছনায় দিগন্ত ঘুমায়—
আপনি স্বপন রাণী, বরণ বরণ রঙ্গে
　বিশ্বপট সোহাগে সাজায়।
ধরায় ঝরিছে নদী, সুবর্ণ সূত্রটী যেন,
　পশিতে পশে না যেন চোখে;
ঝক ঝক জ্বলে তন্বী, আধ' স্বপনের রেখা
　আধ' আঁধারে তনু ঢেকে।
ও দিকে উঠেছে শৃঙ্গ, কত উচ্চে কত দূর—
　কল্পনার স্বপন ভেদিয়ে—
এদিকে পাতালপুরি, ওদিকে সপ্তম স্বর্গ
　কোন্ দিকে থাকিব চাহিয়ে!
এদিকে অনন্ত তল, ওদিকে অনন্ত শৃঙ্গ
　অনন্ত শয়ান দুই ধারে,
পাতাল ত মহাশূন্য মহাশূন্য ব্যোম দেশ
　কে আমি এ অনন্ত মাঝারে!
উর্দ্ধে ফোটে পূর্ণশশী, চারিদিক মোহে ঢাকি
　ঘুমন্ত জোছনা আবরণে,
গাছ পালা পুলকিত, দিগঙ্গনা উলসিত
　উলসে আলস লাগে প্রাণে।
ধবল শিখরে বসি—নীহারে চরণ রাখি
　ঝলকিত মুকুট মাথায়,
আজি মা প্রকৃতি দেবি, রাজ-রাজেশ্বরী রূপে
　কি মধুর হাসিছ হেথায়!
অদূরে সুধীরে ঝরে, নির্ঝরের শত ধারা
　চূর্ণিত হীরক-স্রোত প্রায়,
অন্নপূর্ণা হোয়ে আজি, ঢালিতেছ রত্ন রাশি
　যেন এই দরিদ্র ধরায়!
শূন্যে শূন্যে ওড়ে মেঘ আলোক আঁধার মাখি
　স্বরগের প্রজাপতি সম—
উড়ে উড়ে যায় চোখে ধরি ধরি ধরিব না
　পাছে দাগ লাগে স্পর্শে মম।
এ ঘোর ঘুমের মাঝে নিস্তব্ধতা চমকিয়ে
　কি বোল বলিল ওই পাখী——
"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"
　গীতিময় সব যেন দেখি!
একটী বিহঙ্গ গানে ব্রহ্মাণ্ডের মহাগীতি
　কহ মাতঃ কেমনে জাগিল,
একটী কোকিল স্বরে বাসন্তিক কুঞ্জে যেন
　বিহঙ্গম মণ্ডলী মাতিল!
গ্রহ উপগ্রহ মাঝে উথলে স্বর্গীয় গীতি
　স্তরে স্তরে শূন্যে ভেসে যায়,
শব্দ শূন্য বায়ু শূন্য বর্ণ শূন্য মহা শূন্য,
　সে সঙ্গীত তরঙ্গিয়ে ধায়।
এই এ সঙ্গীত মাঝে, অনন্ত সঙ্গীত মাঝে
　কেন মাগো আনিলে আমায়,
সহিতে পারিনে আর—দুর্ব্বল মানব হৃদি
　আনন্দে বা অনন্তে মিশায়।
এই মহা ঐক্যতান ইহার মাঝারে বসি
　তোমারে মা দেখিতে দেখিতে—
কেন না এ ছার প্রাণ অবসান হইতেছে
　প্রশান্ত এ সহাস নিশীথে!
আছি আমি থাকি আমি চাও মোরে—যাব
　আমি,
　বিমুক্ত করেছি মোহ ফাঁস,
জীবন স্বপন ময়, স্বপন প্রমোদ ময়—
　প্রমোদেতে স্বর্গের আভাস!
সে স্বর্গ যে মর্ত্ত ভূমে, মন্ত্রবলে আসে নেমে
　বুঝেছি এখন তাহা সার,
জন্ম জন্ম এই সুখে, জনম কাটায়ে যাব'
　এই তব উদ্দেশ্য উদার।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশের ইতিহাস।

ডাক্তার হন্টার সাহেব তাঁহার Statistical Report মধ্যে প্রত্যেক জেলায় কি কি আশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে, কি কি ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়াছিল অনেক যত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়াছেন। হন্টার সাহেব তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহার Report এ অনেক বিষয় নাই ও যাহা আছে তাহাও অনেকে জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারেন না। এই সমস্ত কারণে আমি বাঙ্গালায় মুরসিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে যে সকল অতি আশ্চর্য্য প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিয়াছি তাহা সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

এক সময়ে বিষ্ণুপুরে হিন্দুরাজারা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সময় বঙ্গদেশ মুসলমানাধিকৃত হইলে তাঁহার সনন্দানুসারে বিষ্ণুপুরের রাজা মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হন। কিছুদিন মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন থাকিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা পুনরায় স্বাধীন হইয়াছিলেন। বোধ হয় লোকে বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বিদিত আছেন। কিন্তু আমি রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের বংশের সকল রাজার নাম, রাজত্বকাল ও তৎসাময়িক ঘটনা সমূহের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাইয়াছিলাম; এবং তাহার সাহায্যে প্রচলিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিম্নলিখিত ইতিহাস লিখিয়াছি। ইহাতে কোন ঐতিহাসিক ভ্রম দর্শিত হইবে না। শুনিয়াছি মাননীয় মাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত ইহাঁদের ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রকাশ করিবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য আশা করি পাঠকবর্গ এই ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। বিষ্ণুপুরের ইতিহাস একটি নূতন বিষয়। বিশেষতঃ এখন মুরসিদাবাদের নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ দেখিলে বোধ হয় যেন বিষ্ণুপুরই বঙ্গদেশের প্রধান রাজ্য ছিল। হন্টার সাহেব মুরসিদাবাদের কথা যাহা লিখিয়াছেন সে অনুপাতে বিষ্ণুপুরের কথা কিছুই লেখেন নাই। বোধ হয় হন্টার সাহেব উপযুক্ত সাহায্য পান নাই। এই জন্য আমি প্রথমে বিষ্ণুপুরের সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি সেইগুলি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ঐতিহাসিক বিষয় ইতিহাসের ভাষায় লিখিব। পাঠকগণ ইহাতে কাব্যের কোন রসই পাইবেন না। আমার এ দোষ মার্জ্জনীয়।

১০২ মল্লাব্দে অর্থাৎ ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে

আদিমল্ল বিষ্ণুপুরে রাজত্ব আরম্ভ করেন। ইনি মল্লবংশীয়। ইনিই এই মল্লরাজ বংশের স্রষ্টা। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে ইনি একজন ক্ষত্রিয়ের সন্তান। ইহাঁর মাতা বানপ্রস্থাবলম্বী স্বামী সমভিব্যাহারে পশ্চিম দেশ হইতে জগন্নাথ-যাত্রাকালে বিষ্ণুপুরের নিকট আদিমল্লকে প্রসব করিয়া সকল মায়া মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পথপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া যান। সদ্য-প্রসূত অনাথ বালক একটী ব্রাহ্মণের নয়নপথে পতিত হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহার লালন পালনের উপায় করিয়া দেন। পরে বালক যৌবনে পদার্পণ করিলে অসাধারণ বল বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ এই বালকে অনেক সুচিহ্ন দেখিয়া তাহাকে বড় যত্ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ তত্রস্থ রাজার বাটী নিমন্ত্রিত হইয়া এই বালককে দাসস্বরূপ সঙ্গে লইয়া যান। সকলে আহারে বসিলেন। আদিমল্লও প্রাঙ্গনে আহার করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে বৃষ্টি আসিল। অতিথিপ্রিয় রাজা স্বয়ং আদিমল্লের মস্তকে ছত্র ধরিয়া বৃষ্টি নিবারিত করিলেন। আদিমল্ল তখন বলিলেন মহারাজ যখন স্বয়ং আমার মস্তকে ছত্র ধরিলেন তখন যাহাতে ইতঃপর অন্যে ছত্র ধরিতে পারে এরূপ করুন। রাজা এই কথা শুনিয়া আদিমল্লকে জমিদারী স্বরূপ একটি পরগণা দিলেন এবং রাজা উপাধি প্রদান করিলেন। আদিমল্ল ক্রমে ক্রমে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা আপনার রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। কিন্তু তিনি কাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন জানা যায় না। ইনি লাউগ্রামে একটি অতি উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত দেবালয় প্রস্তুত করিয়া দেন। এখনও এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইনি আপনার নামের মুদ্রা ও মল্লাব্দ নামে একটি সাল প্রচলিত করেন। ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া আদিমল্ল পরলোক গত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়মল্ল রাজা হইলেন। ইহাঁদের বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন। জয়মল্ল হইতে ১৯ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ৩১১ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাদের রাজত্ব কালে .টী প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে ৬ টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বিষ্ণুপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ১৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সময়ের কোন ঐতিহাসিক বিষয় জানা যায় না। একবিংশ রাজা রূপমল্ল ১০০৩ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সময়ে নিকটবর্ত্তী রাজারা বিষ্ণুপুরের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন। ইনি আপনাদিগের বাসস্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই প্রাচীর উর্দ্ধে ৪১ হাত ও প্রস্থে ১২ হস্ত পরিমিত। এখনও ইহার কিয়দংশ অক্ষুণ্ণ ভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রূপমল্ল দুইটী প্রস্তরময় প্রবেশদ্বার নির্ম্মিত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। এই দুইটি দ্বার আজও প্রায় অবিকৃত ভাবে রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বহির্দ্বারটি অতিশয় উচ্চ ও অপরটির নির্ম্মাণ অতি আশ্চর্য্য।

শুনা গিয়াছে ভরতপুরের কেল্লা নির্ম্মাণ-কৌশলতা প্রযুক্ত অজেয় ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত করিয়া যান। তিনি যে দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভরতপুরের কেল্লার দ্বারের অনুরূপ। বাস্তবিক যাঁহারা ভরতপুরের কেল্লার দ্বার দেখেন নাই তাঁহারা বিষ্ণুপুরের এই দ্বার ও তথাকার গড় নির্ম্মাণের প্রণালী দেখিলেই কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিবেন কিজন্য ভরতপুরের কেল্লা অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা যে ভাবে দুর্গ প্রাকারের মধ্যে স্থাপিত, ইহাতে যে ভাবে শত শত সৈন্য গোপনে রাখিবার উপায় আছে, ইহাতে যে ভাবে কামান স্থাপন করিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা দেখিলে বোধ হয় কোন রূপে এক জন সৈন্যও এই দ্বার অতিক্রম করিতে সক্ষম হইত না। ইহার মধ্যে এরূপ গুপ্ত ভাবে সোপানশ্রেণী অবস্থিত যে বহু আয়াস ব্যতীত সহজে কোন ব্যক্তি তাহা অনুসরণ করিতে পারেনা। বঙ্গদেশীয়েরা যে যুদ্ধপ্রণালী বিশেষ জানিত বিষ্ণুপুরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে সুন্দরমল্ল রাজা হইলেন। ইনি রাজা রূপমল্লকৃত গড় সুদৃঢ় করিবার জন্য গড়ের দুই দিকে ক্রমান্বয়ে পাঁচশ্রেণী অত্যুচ্চ প্রাচীর ও তৎপার্শ্বে পাঁচশ্রেণী গভীর পরিখা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গড়ের দক্ষিণদিকে এই সময়ে একটী কেয়ারাখানা প্রস্তুত করা হয়। এটী ইষ্টক নির্ম্মিত ও অতি উচ্চ দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত। এখনও এই কেয়ারাখানা দেখিলে নূতন বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায় গ্রীষ্মকালে রাজারা কোন প্রকার কল সংযোগে নিকটস্থিত জলাশয় হইতে জলোত্থিত করিয়া সেই জল আপনাদিগের বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে বিন্দু বিন্দু করিয়া বৃষ্টির ন্যায় পাতিত করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রয়োবিংশ রাজা কুমদমল্ল ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তৎপুত্র দুইজনে ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ হয়। দুর্গের দুই পার্শ্ব ইতিপূর্ব্বেই সুরক্ষিত হইয়াছিল। বিড়াই নদী এক সীমা রক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে অবশিষ্ট একপার্শ্ব অবরোধ করিবার জন্য ইহাঁরা বাঁদ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল বাঁদ বিড়াই নদীর জলে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। ইহাঁদের সময়ের শ্যাম বাঁদ ও কৃষ্ণবাঁদ নামক দুইটি বাঁদ দেখিলে মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখন ইহাদের যে অবস্থায় দেখা যায় ইহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত ছিল। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশমল্ল রাজা হন। ইনি কোন স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিতে পারেন নাই। ইহাঁর সময়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না। তদনন্তর প্রতাপ মল্ল রাজা হইয়া লাল বাঁদ প্রস্তুত করাইয়া দুর্গসীমার আরও কিয়দংশ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। লাল বাঁদ এক আশ্চর্য্য জলাশয়। একটী কাচের গ্লাসে কলের জল রাখিয়া

তাহাতে কোন দ্রব্য ফেলিয়া দিলে যেরূপ দেখা সম্ভব লাল বাঁদের জলে তৃণের ন্যায় দ্রব্যও থাকিলে সেইরূপ দেখা যায়। আজও দেখা যায় স্ত্রীলোকে লালবাঁদে স্নান করিতে সঙ্কুচিত হয়। ইহার তলদেশে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা জলের ভিতর দিয়া স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জল অতি সুস্বাদু। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত ও উত্তর দক্ষিণে ১ মাইলের ন্যূন নয়। লাল বাঁদ বিষ্ণুপুরের একটী মহৎ কীর্ত্তি। প্রকাশ মল্লের পর ৪ জন রাজা ১২১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকে চৌকান, গাঁড়াইত, যমুনা, ও কালিন্দী নামক ৪টী বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুপুরের দুর্গ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখন দেখিতে পাওয়া যায় এই ৪টী জলাশয়ের মধ্যে অনেক আবাদী জমী হইয়াছে। এই বাঁদ গুলির অবস্থানের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় রাজারা ইহা দ্বারা গড়ের এক পার্শ্ব শত্রুআক্রমণের উপায়শূন্য করিয়াছিলেন। এই রূপ প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে বিষ্ণুপুর নগর অবস্থিত ছিল। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন বিষ্ণুপুর হইতে স্বতন্ত্র স্থান। আধুনিক বিষ্ণুপুর প্রাচীন দুর্গের বহির্দ্দেশে স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহাদের পর ১৭ জন রাজা ৩৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সকল রাজাদের রাজত্ব কালে যে ১০টী অতি উচ্চ ও সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দশটী দেবালয়ের মধ্যে ২ টী একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে। বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্থাপনাবধি ৮৯১ বৎসরের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ৪৫ জন রাজা রাজত্ব করিলেন। কিন্তু আমি যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে এই পর্য্যন্ত সঙ্কলন করিয়াছি তাহাতে ইহাদের সময়ের—কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা পাই নাই। কেবল জানা গিয়াছে যে ইহাদের শেষ ২৪ জন রাজা ৫৮৪ বৎসরে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অনন্তর খৃষ্টীয় ১৫৮৭ সালে বীর হাম্বীর আপনার পিতা বীড়িমল্লের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সময়েই বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অন্তর্ভূত হইল। বীর হাম্বীর একজন বীরপুরুষ ছিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য মানসিংহকে প্রেরণ করেন। যদিও বীর হাম্বীরের সহিত মানসিংহের কোন যুদ্ধ হইয়াছিল কি না জানা যায় না তথাপি বিষ্ণুপুর যে দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে। এবং দিল্লীর সম্রাটের সনন্দানুসারে ইহাঁদিগকে মুরসিদাবাদের নবাবকে কর দিতে হইয়াছিল! বীর হাম্বীর সন্ধিরূপে মুরসিদাবাদের নবাবকে বৎসর ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা করস্বরূপে দিতে স্বীকার করেন। এই সময়ে মুরসিদাবাদের নবাব বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে "সিংহ" উপাধি দেন। সেই জন্য বীর হাম্বীরের উত্তরাধিকারীরা মল্ল উপাধি ত্যাগ করিয়া সিংহ উপাধি ধারণ

করেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা স্থপতি বিদ্যার যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহার প্রমাণস্বরূপ বীর হাম্বীর কৃত একটী রাশমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আধুনিক অবস্থা বড় হীন। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই মঞ্চে সমারোহের সহিত রাসলীলা হইয়া গিয়াছে। এই মঞ্চে স্থপতি বিদ্যার একশেষ হইয়াছে। তৎকালে স্থপতি বিদ্যার এরূপ উৎকর্ষ দেখিলে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। আকবরের চক্ষু দাক্ষিণাত্যে চাঁদ বিবির রাজত্ব আমেদ নগরের উপর পতিত হইল। বিষ্ণুপুরের রাজারাও কর দিতে হস্ত সঙ্কোচন করিলেন। বীর হাম্বীর ২৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পুত্র ৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইনিও এ পর্য্যন্ত কর দেন নাই। অনন্তর ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথসিংহ রাজা হইলেন। ইহাঁর বীরত্বের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কর না দেওয়া দোষে রঘুনাথসিংহ নবাব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মুরসিদাবাদে যান। তিনি যে সময় তথায় উপস্থিত হন সেই সময় দেখিলেন নবাব যুবতী রমণীগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে আমোদ করিতেছেন। সে সময়ে কোন ব্যক্তি নবাবকে রঘুনাথসিংহের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে অগ্রসর হইল না। রঘুনাথসিংহ আপনার আগমনবার্ত্তা নবাবের গোচর করিবার জন্য যে তাঁবুর মধ্যে নবাব বসিয়াছিলেন তাহার একটী বন্ধনকাষ্ঠ স্বহস্তে তুলিয়া ফেলিলেন, তাঁবু হেলিল; নবাব কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া শুনিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথসিংহ আসিয়াছেন। তখন নবাব নিঃস্তব্ধ হইলেন। পরদিন প্রাতে নবাবের সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। নবাব রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঘোড়ায় চড়িতে পার। রাজা বলিলেন "পারি।" তৎপরে নবাব একটী দুর্দ্দমনীয় ঘোড়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু রঘুনাথসিংহ বলিলেন "আমি চড়িলে ঘোড়া মরিয়া যাইবে। বাস্তবিক তাহাই হইল, দেখিয়া নবাব রঘুনাথসিংহের দেয় কর মথুব করিলেন। অন্য এক সময়ে রঘুনাথসিংহ একটী মত্ত হস্তীর শুণ্ড স্বহস্তে উৎপাটন করিয়া আপনার অসীম বলের পরিচয় দিয়াছিলেন। রঘুনাথসিংহ সত্যের অনুরোধে না করিয়াছেন এমন কার্য্যই নাই। একবার তিনি কর না দিয়া মুরসিদাবাদের নবাবের নিকট বলিলেন আমি কর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎপরেই বিষ্ণুপুর হইতে দেয় কর মুরসিদাবাদে পৌঁছিল। রঘুনাথসিংহ এই কথা শুনিবামাত্র সমস্ত অর্থ গঙ্গাগর্ভে নিহিত করিলেন। সত্যের অনুরোধে এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন শুনিয়া নবাব এবারও রাজার কর মাপ করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া রঘুনাথসিংহ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাঁর পর বীরসিংহ, দুর্জ্জনসিংহ, রঘুনাথসিংহ (২য়) ও গোপালসিংহ নামক ৪ জন রাজা ক্রমে রাজত্ব করেন। বীরসিংহ ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়া

ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা হয় নাই। ইনি পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের কৃত অনেক দেবালয়, গড়ের দুই প্রাচীর ও প্রবেশ-দ্বার সংস্কার করেন এবং নিজে ৫১৬ টী দেবালয় সংস্থাপন করেন। ও জোড় বাঙ্গালা নামক আর একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। জোড় বাঙ্গালা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার সময়ে পোকাবাঁদ নামক আরও একটী অতি বৃহৎ বাঁদ খাত হইয়াছিল। এই বাঁদ গ্রীষ্মকালে এক প্রকার পোকায় এরূপ পূরিয়া যায় যে তখন ইহার জল ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। পোকা ছাঁকিয়া ফেলিলে ইহার জল অতি পরিস্কার ও সুসেব্য। পণ্ডিত ও বহুদর্শী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পোকাগুলি কি, ও কিরূপে হয় জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল-প্রয়াস হন নাই। অবশিষ্ট তিন জনে ৬১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা দুর্জনসিংহের সময় একটী চমৎকার ইন্দারা প্রস্তুত হয়। ইন্দারাটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গভীরতা নিরূপণ করা সুকঠিন। বোধ হয় ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত সোপান-শ্রেণীর দ্বারা অবতরণ করিবার উপায় করা হইয়াছিল। রঘুনাথ সিংহের পুত্র না হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা গোপালসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালসিংহের সময় বর্গির হাঙ্গামে সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। গোপালসিংহ স্বয়ং একজন ভীরু রাজা ছিলেন। প্রায় অগণনীয় মহারাষ্ট্র সৈন্য বিষ্ণুপুরের দুর্গের সম্মুখে শিবির স্থাপন করিল। রাজা ভয়ে কাতর হইলেন। ইনি অনন্তর রাজাদিগের জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের শরণাপন্ন হইলেন, এবং আপনার সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। যাহা হউক রাজা কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে দলমদল কামানদ্বয়ের জলদ গম্ভীর—স্বর শুনিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার অনুমতি ব্যতীত কে কামান প্রয়োগ করিল। সকল সেনাপতিই আপনাদের কামান প্রয়োগ বিষয়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিলেন। তখন রাজা দূত দ্বারা শুনিলেন মদনমোহন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বীতালঙ্কৃত শরীরে সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। রাজা বুঝিলেন মদনমোহন স্বয়ং কামান ছুড়িয়াছেন। এই গল্পটী চির-প্রসিদ্ধ। কিন্তু কি ঘটনা হইতে যে এই গল্পের উৎপত্তি হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, অবশেষে সংবাদ পাইলেন যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কামানের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। এই স্থানে দলমদল কামানের একটী বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক। দলমদল দুইটী কামান। ইহাদের মধ্যে একটী আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কামানটী দৈর্ঘ্যে ১৩ হস্ত পরিমিত। ইহার পরিধি ৬ হস্তের কম নয়। এই কামানটী দক্ষিণ দিকের দুর্গপ্রাচীরের উপর অবস্থিত ছিল। কিন্তু অধুনা সেই

স্থান হইতে নিম্নভূমির উপর পতিত আছে। লেফটেনাণ্ট গর্ভনর কাম্বেল সাহেব এইটীকে কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আনিতে লক্ষ টাকার অধিক খরচ হইবে দেখিয়া আপাততঃ সে অভিলাষ ত্যাগ করেন। প্রায় দেড় শত বৎসর এই কামানটী এরূপ অযত্ন ভাবে থাকাতেও সম্পূর্ণ মসৃণ আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে ইহাতে একবার শব্দ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা হইয়াছিল। শুনা যায় সেই সময় গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাতের ভয়ে গৃহমধ্যে দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়াছিল। বিষ্ণুপুরের লোকে এই কামানটীর পূজা করিয়া থাকে। ইহার আর একটী কামান লালবাঁদের মধ্যে পড়িয়া আছে। লোকে বলে সেটী ইহার অপেক্ষা বৃহৎ।

বন্দীকৃত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে গোপালসিংহ দুর্গ মধ্যে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া থাকিতে দিয়াছিলেন। ঐ স্থান অদ্যাপি মহারাষ্ট্রী পাড়া বলিয়া খ্যাত। গোপালসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণসিংহ ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ৪৯ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহাঁর ভ্রাতা দামোদর সিংহের সহিত ইহাঁর রাজ্য লইয়া বিবাদ হয়। দামোদর সিংহ একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি প্রায় লক্ষ মহারাষ্ট্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজার দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য দুর্গ প্রাকারের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহার সৈন্যেরা অর্থের জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তখন রাজার শরণাপন্ন হইয়া লক্ষ মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। আর বলিলেন যে আপনার প্রধান সেনাপতিকে আজ্ঞা করুন আমার এই সমস্ত সৈন্যকে বিষ্ণুপুরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিয়া আইসে।" রাজা অর্থ দিলেন, এবং ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেনাপতিকে ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কা সত্ত্বেও যাইতে আজ্ঞা করিলেন। দামোদরসিংহ সৈন্যদিগকে অর্থদিয়া বশীভূত করিলেন। এবং সেনাপতি (চৈতন্যসিংহের) যেমন তাঁহার শিবিরের নিকট উপস্থিত হইল, অমনি তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রাজা ভয় পাইলেন। এদিকে দামোদরসিংহ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজার হাবসি সৈন্যগণও যুদ্ধসজ্জা করিল। কিন্তু অসংখ্য মহারাষ্ট্র সেনার নিকট সেই অল্প মাত্র সৈন্যে কি হইবে। তথাপি দুর্ভেদ্য দুর্গের ভরসায় রাজার ৫০০শত সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই উভয় পক্ষে বন্দুক ব্যবহার করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। ধূর্ত্ত ও কপটাচারী দামোদর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিল না। কিন্তু সত্যপরায়ণ রাজার সৈন্যেরা বন্দুক ব্যবহার করিল না। কাজেই ৫০০ শত লোক কতক্ষণ লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে, একে একে, যুদ্ধ করিতে করিতে সেই কয়েক শত অসমসাহসী লোক নিধন প্রাপ্ত হইল। রাজা গুপ্ত দ্বার দিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামোদর সিংহ দুর্গ অধিকার

করিয়া ৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বহুদিনের পর দিল্লীর সম্রাট, চৈতন্য সিংহকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত মুরসিদাবাদের নবাবের প্রতি আদেশ করিলেন। তখন বঙ্গদেশে ইংরাজ-পতাকা উঠিয়াছে। রাজা চৈতন্য সিংহ নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব সম্রাটের আজ্ঞানুযায়ী ১০০০০ দশ সহস্র পদাতিক, ১০০০ সহস্র অশ্বারোহী, হস্তী, ও ৩২ কামান দিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ক্লাইব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া কেবল দুই দল ইংরাজসৈন্য কাপ্তেন মাউ-রের অধীনে প্রেরণ করিলেন। দামোদর সিংহ ইতি পূর্ব্বে স্বচক্ষে পলাসীর যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের নাম শুনিয়া ভয় পাইলেন, এবং বহুকাল হইতে সঞ্চিত রাজাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া পলায়ন করিলেন। চৈতন্য সিংহ ৮ বৎসর পরে পুনরায় রাজত্ব পাইলেন বটে, কিন্তু কিছুমাত্র অর্থ পাইলেন না। বিষ্ণুপুরের রাজাগণ মুরসিদাবাদের নবাবের অধীন হওয়া পর্য্যন্ত যদিও রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন ও রাজার ন্যায় সৈন্য, অস্ত্র শস্ত্র রাখিতে পারিতেন তথাপি তাঁহারা একরূপ জমীদার মাত্র ছিলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে মীরজাফরের পর মীরকাশিমের রাজত্ব শেষ হইল। ইংরাজেরা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ সালে ইংরাজেরাই বঙ্গদেশের দেওয়ানী পাইলেন। ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়া ১৭৯৩ সালে জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা হীনবল; তিনি যেমন নবাবদের কর দিতে বাধ্য ছিলেন, সেইরূপ ইংরাজদের কর দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন কর দিবার সে বন্দোবস্ত নাই। এখন সূর্য্যাস্তের দিন অতীত হইলে, দেয় করের কিছু মাত্র বাকি থাকিলে জমীদারী নিলামে উঠিবে। বিষ্ণুপুরের রাজারা ৩৬০ টী দেবালয় স্থাপন করেন। এই সকলের রীতিমত বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনেক লাখরাজ দিয়াছিলেন; তাহাতে আবার তাঁহাদের ধনাগার দামোদর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের ঘরে অনেক টাকা সঞ্চিত ছিল না। খাজনাও অধিক আদায় হইত না। এখন প্রতি বৎসর খাজানা দাখিল করা বড় বিপদ হইল। রাজারা কখনও নিয়মিত রূপে কর দেন নাই। যথাসময়ে কর দাখিল করা অনভ্যাস বশতঃ এবং দেয় কর সমস্ত সংগ্রহ করিতে না পারায় রাজারা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খাজানা দাখিল করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে দুই একটী করিয়া পরগণা নিলাম হইতে আরম্ভ হইল। ইতি পূর্ব্বে হইতেই রাজাদিগের বীরত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এখন হইতে তাঁহারা অর্থহীন হইতে চলিলেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী আর পুরাতন স্বামীতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। রাজ সরকারে যাঁহারা কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাদের প্রতিই লক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। রাজারা ক্রমেই বিমর্ষ হইতে লাগিলেন।

রাজা চৈতন্য সিংহ প্রায় অর্দ্ধেক জমিদারী নষ্ট করিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গত হইলেন। তাঁহার পুত্র রাজা মদনমোহন সিংহ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র মাধব সিংহ ৮ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়েই ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, সূর্য্যাস্তের দিন খাজনা দিতে অসমর্থতা হেতু সমস্ত সম্পত্তি রাজাদিগের হস্তান্তর হইল। ইঁহারা নিঃসম্বল হইলেন। দিল্লীর সম্রাট নাম মাত্র। বাঙ্গালার নবাবও নাম মাত্র। ইংরেজই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহারাই বঙ্গদেশে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সৌভাগ্য ক্রমে ইংরাজ গবর্ণর রাজা মাধব সিংহকে পেন্সন্ দিলেন। এই সামান্য পেন্সনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত করিতে হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মাধব সিংহের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল সিংহ পিতার পেন্সনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি আর রাজা উপাধি পাইলেন না। গোপাল সিংহ রাজত্ব বা জমিদারী বিহীন হইয়া ৬৬ বৎসর পেন্সন্ ভোগ করিয়া পরলোকগত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদিগের একষষ্টিতম রাজা। রামকৃষ্ণ সিংহদেব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। রামকৃষ্ণসিংহের পুত্র নাই, বোধ হয় ইঁহার মৃত্যুর পরই এই বংশ লোপ হইতে চলিল।

রামকিশোর সিংহ দেব রামকৃষ্ণ সিংহের উত্তরাধিকারী হইবেন। এই বংশের একটী সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। তাহাতে অনেক বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যাইবে। জামকুড়ী, কুচিয়াকোল প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বংশীয়েরা জমীদার আছেন। বিষ্ণুপুরের দুর্গ প্রাকারের মধ্যে একটী গড় আছে। সেটি অতি সুদৃঢ়। কিম্বদন্তী আছে রাজারা যুদ্ধকালে স্ত্রীলোকদিগকে এই গড়ে রাখিতেন। এটী কোন সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

আর একটী কথা বলিয়া শেষ করিব। আজও সাহেব মহোদয়গণ ও এদেশীয় প্রায় সকলে রামকৃষ্ণ সিংহ দেবকে "রাজা" বলিয়া থাকেন। কিন্তু সরকারী কাগজ পত্রে "রাজা" লিখিবার নিয়ম নাই। অনেকেই এখন রাজা মহারাজা; কিন্তু যিনি পঞ্চদশ শত বৎসর স্বাধীন রাজা ছিলেন তিনি কিছুই নন। এ মহিমা বুঝিলাম না।

উপসংহারে এই মাত্র বলিতেছি যে বিষ্ণুপুর দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এক সময়ে বিষ্ণুপুর একটী বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন দুর্গ এক্ষণে বনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি ইংরাজেরা সেই বন সকল পরিষ্কার করিয়া দুর্গটী সংস্কার করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিবেন। মুরসিদাবাদ ও ঢাকা যদিও বাঙ্গালার রাজধানী ছিল কিন্তু মানসিংহের বঙ্গদেশে আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুরে স্বাধীন রাজগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন ও তাঁহাদের কীর্ত্তির যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বঙ্গ-

দেশের অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। আশা করি সকলেই বিষ্ণুপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে ইচ্ছা করিবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সভ্যতার উন্নতি সহকারে নরজাতির শারীরিক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে কি না।

এই বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ সভ্যতা কাহাকে বলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। আমাদিগের বোধ হয় যে সেই আভাস নিম্ন লিখিতরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে যে নরজাতির বাস অর্থাৎ ইংরাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ, স্পেনীয়, ও ইটালীয় এই পাঁচ জাতিকে আমরা সভ্যতা-মঞ্চের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধিষ্ঠিত বলিয়া জ্ঞান করি। এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কতিপয় জাতি সেই মঞ্চের অধস্তন শ্রেণী অধিকার করিয়া আছে বলিতে হইবেক! পাঠকবর্গ মনে মনে রাগ করিবেন না যে আমরা স্বজাতি অর্থাৎ হিন্দুজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করিতে পারিলাম না। তাঁহারা হয়ত মনে মনে ভাবিবেন 'কি আমরা আসল আর্য্যজাতি হইতেছি, আমাদিগের মধ্যে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির পুরুষরত্ন সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নহি?" সত্য, কিন্তু ইহার উত্তর এক কথায় হয়, সভ্য যে জাতি, সে কখন পরাধীন হইবার নহে, অথচ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আমরা অদ্য আটশত বৎসর হইল বৈদেশিকদিগের দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছি। এই একটী বিষয়ই আমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে খাট করিবে। পরাধীন হওয়ার মানে কি? কেবল দুএক যুদ্ধে হারিয়া যাওয়া নহে। তবে কি না, মনের সেই তেজ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া, যাহাতে করিয়া পরজাতির শাসনে থাকা অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর বোধ থাকে। এই বোধ কিংবা এই তেজ দুটী একটী পুরুষের থাকিলে হয় না যদি আপামর সাধারণের স্বভাবসিদ্ধ অন্তঃকরণবৃত্তি তাদৃশ হয়, তাহা হইলে কোন বিজেতা জাতিই তাহাদিগকে করতলগত করিয়া রাখিতে পারে না, অর্থাৎ কোন বিজেতা জাতির পক্ষে তাদৃশ লোকদিগকে শাসন করা পোষায় না। পরজাতির শাসন যাহারা যাহারা করিয়া থাকে, সকলেই কোন কোন

লাভের জন্য। কিন্তু বিজিত লোকগণ অত 'জলামেজাজের' হইলে তাহাদিগকে শাসন করিয়া কিছু লাভ থাকে না। মোটা মোটা বেতন, সস্তা চাকর বাকর, সস্তা আহারাদি, অসীম প্রভুত্ব, অসীম খোসামোদলাভ, বিশ্বহিতকারিতার যশ, এ সমস্তই দুর্লভ হয়। এই নিমিত্ত অত্যুন্নত সভ্যতা ও পরাধীনতা এই দুটী বিষয় একাধারে বর্ত্তমান বলিয়া জ্ঞান করিতে আমরা অপারগ। যাহা হউক, একথা কেবল প্রাসঙ্গিক মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই।

প্রকৃত প্রস্তাব হইতেছে এই যে, মানুষ যখন সভ্যতার কোন বীজ বপন করে নাই, তখন তাহার শরীরের গঠন যে প্রকারের ছিল, অনেক দূর সভ্যতা পাইবার পর তাহা এখনও আছে, কি অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে আমরা 'সভ্য' এই নাম উচ্চারণ কালে ইংরাজ ফরাশী প্রভৃতিদিগকে ধ্যান করিব আর পাটাগনিয়ার লোক বা হটেন্‌টট্‌দিগকে অপর দিকে ধ্যান করিব। অথবা আমরা স্বচক্ষে যাহাদিগকে দেখিয়াছি, অর্থাৎ আন্দামানী লোকদিগকে ধ্যান করিলেও ক্ষতি নাই।

যদি এই দুই জাতি লোকের ধ্যান এক সঙ্গে করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। যাঁহারা আপনাদিগকে দার্শনিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা সৌন্দর্য্যের কিছু ঠিকানা নাই এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে চীনেরা খাঁদা নাক ও ক্ষুদ্র চক্ষু সুন্দর জ্ঞান করে, আমরা তদ্বিপরীতকে। সুতরাং আমরা যদি বলি যে অসভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্যতর অবস্থায় মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, তাহা দার্শনিক অভিমানীরা ফুঁয়ে উড়াইয়া দিবেন। তাঁহারা কহিবেন, সৌন্দর্য্য কেবল মনের ধর্ম্ম মাত্র, সুন্দর পদার্থ-গত কোন ধর্ম্ম নহে। একই বস্তু বা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির চক্ষে সুন্দর বা সুশ্রী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে ইত্যাদি। কিন্তু তদুত্তরে বলা যায় যে কাল রঙ অপেক্ষা ফর্শা রঙের কি অপেক্ষাকৃত রমণীয়তা নাই, শরীরের চর্ম্মে ক্রমাগত দাগ কড়া আঁচড় মশা কামড় ইত্যাদি থাকিলে সেই চর্ম্ম দেখিতে সুন্দর হয় কি চর্ম্ম মসৃণ ও চোস্ত ও পরিষ্কার হইলে তাহা হয়? কিন্তু যখন বস্ত্রের মধ্যে দিগম্বর, অথবা সেলাই করা তরু পল্লব এই প্রকার পোসাকের বন্দোবস্ত, সেই অবস্থায় কি মসৃণ ও পরিষ্কার দেহচর্ম্ম হওয়া সম্ভব? আর এক কথা বলি, যদি উদরটি বিলক্ষণ লম্বমান হয়, তাহা হইলে দেখায় ভাল, না ক্ষীণ কটিযুক্ত সূক্ষ্ম উদর দেখিতে সুশ্রী? কিন্তু অসভ্য অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য দুর্লভ, শামুক গেঁড়ি বা বনফল যেদিন জুটিল সে দিন পেট ভরিয়া খাইতে হয়, আবার কবে জুটিবে স্থির নাই, এই নিমিত্ত উদরে এককালে এত বোঝাই লইতে হয়, যে উদর সহজেই স্ফীতাকৃতি ও লম্বমান হইয়া উঠে। অসভ্য মাত্রেরি এই লক্ষণ, অসভ্য মাত্রেরি এরূপ ক্ষমতা আছে যে, সে সুদীর্ঘ উপবাস সহ্য করিতে পারে, অথচ এককালে অত্যাজ

অতিরিক্ত পরিমাণের আহার দেহ-মধ্যগত করিতে পারে। এই নিমিত্ত বলিতে হই বেক যে লম্বোদরতা যদি কদাকার হয়, আর উদরের কৃশতা যদি অঙ্গসৌষ্ঠব বলিয়া গণ্য হয়, তবে অসভ্য অপেক্ষা সভ্যের অঙ্গসৌষ্ঠব এ অংশে প্রকৃষ্ট। আরও এক অংশে প্রকৃষ্ট, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠন মূর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে হইলে রীতিমত ও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যায়াম অভ্যাস করা চাই। অসভ্যকে সময়ে সময়ে আহারের অনুসন্ধানে ঘোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে করিয়া উহার শরীরের কোন কোন মাংসপেশী বিপুল পরিমাণে ব্যায়াম প্রাপ্ত হইয়া অসম্ভব বৃদ্ধি ও প্রকর্ষলাভ করে বটে, তাহার পায়ের ডিম হয়ত অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠে, পায়ের তলা হয়ত বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠে, কিন্তু কালিদাস যাহাকে বলেন চতুরস্র শোভি, অর্থাৎ চৌরস, চোস্ত, যেথানে যে রকমটী চাই সেই রকম, এ প্রকার গঠন সৌষ্ঠব উপার্জ্জন করা অসভ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহার পক্ষে সে বিষয়ের বিঘ্ন বিস্তর আছে। অসভ্য প্রচুর ও উৎকৃষ্ট আহার প্রাপ্ত হয়, উহার এমন পরিচ্ছদ নাই যে আবশ্যকমত শরীরকে আচ্ছাদন করিতে পারে; শীত, গ্রীষ্ম, বাত্তাতপ সমস্ত উহাকে একভাবে সহ্য করিতে হয়, শরীরের এক স্থানে একবার চোট লাগিলে চিরকালের জন্য সেই স্থানে কড়া পড়িয়া যায়, শয়ন-সুখ বা বাসস্থানের সুখস্বচ্ছন্দ যাহাকে বলে, তাহার কিছুই অসভ্যের পক্ষে ঐকান্তিক অপ্রাপ্য। এ অবস্থায় কখন শরীরের চর্চ্চা হইতে পারে! আজি কালি লোকে মনেরি চর্চ্চা, মানসিক শক্তিরই অনুশীলনে উন্নতি সাধন এই বিষয়টী বুঝে। কিন্তু শরীরের যে একটা চর্চ্চা ও উন্নতি সাধন আছে, সে বিষয়ে এক্ষণে লোকের মনোযোগ বড় কম হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্যই আক্ষেপের বিষয়। মনের উন্নতি সাধনের ফল চিরস্থায়ী, অর্থাৎ তদ্দ্বারা নুতন নুতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া আর প্রকৃতির রহস্য উদ্ভেদ পূর্ব্বক প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে অধিকতর রূপে আমাদিগের স্বকার্য্যসাধনোপযোগী করিতে পারি, ইহা সত্য বটে। কিন্তু শরীরের উন্নতি সাধনের ফলও কি সেইরূপ চিরস্থায়ী নহে? তাহাও কি সন্তান-পরম্পরাক্রমে স্থায়ী হইয়া যায় না? আমরা ছিলাম বনমানুষ, হয়ত লাঙ্গুল ধারী, আমাদিগের হস্ত পদ দুইই এক প্রকারের ছিল, অর্থাৎ হাত দিয়া এক্ষণে যেমন ধারণকর্ম্ম সাধন করিয়া থাকি, শাখামৃগ অবস্থায় পা দিয়া সেই কার্য্য করিতাম। আর ঠিক্ হইয়া বা স্থিরভাবে বা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম না, দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে ডাহিনে বামে হেলিতে দুলিতে হইত। সেই অবস্থা হইতে আমাদিগের কত উন্নতি ও সুশ্রীকতা বৃদ্ধি হইয়াছে দেখ। আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গের লোম প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, আমাদিগের দুই পা শরীরের ভর ধারণ করিতে এতদূর সক্ষম হইয়াছে যে আমরা সচ্ছন্দে খাড়া হইয়া দ্রুতবেগে দৌড়িতে পারি, আমাদিগের অনেক স্থানের মাংসপেশী সুন্দর সুগোল সুগঠন প্রাপ্ত

হইয়াছে, বক্ষস্থল চেটাল হইয়াছে, মস্তিষ্ক অনেকটা সম্মুখদিকে ঠেলিয়া আসিয়াছে, দুই চক্ষু দীর্ঘ ও সুশ্রী হইয়াছে, ললাট প্রশস্ত ও নাসিকা সুগঠন হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্ত্ত কি একেবারে হইয়াছে, কখনই নহে। প্রকৃতির নিয়মই নয় যে এরূপ বিপুল পরিবর্ত্ত সমস্ত এককালে সমাধা করিবেন। আর শাখামৃগ যে আমরা এক কালে ছিলাম, অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন, তদ্বিষয়ে 'কিন্তু' হওয়া সেইরূপই অসংগত, যেরূপ পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করা অস্বীকার করা অসংগত হয়। কিন্তু সেই শাখামৃগ একটী আর পাশ্চাত্য ইয়োরোপের একটী কোট পেন্টেলুন আদি-ধারী সভ্য পুরুষ একটী পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিয়া দেখ দেখি এত প্রকাণ্ড অদ্ভুত পরিবর্ত্ত কি একলম্ফে হওয়া সম্ভব?—যদি তাহা না হয়, তবে কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে যখন 'মানুষ' বলিয়া একটী জাতি সাধারণ শাখামৃগের দল হইতে পৃথক হইয়া গেল, তখন সেই মানুষ, আর এক্ষণকার 'মানুষ' এ দুয়ের আকারগত বিস্তর বৈসাদৃশ্য থাকা কি নিতান্তই সম্ভব নহে? ইহাতেই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে অসভ্য অবস্থা অপেক্ষা সভ্য অবস্থাতে শারীরিক গঠনের বিষয়ে অনেক অন্যথা হইয়াছে? বিজ্ঞানের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমরা কেবল ন্যায়প্রয়োগ (deductive reasoning) দ্বারাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে নিতান্ত প্রাচীনতম অসভ্য অবস্থা হইতে আমরা বিস্তররূপে অবয়বগত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য কেবল ন্যায় প্রয়োগের উপর নির্ভর করিতে হয় না। এক্ষণে বিস্তর অসভ্য জাতি বিদ্যমান আছে, যাহাদিগের সহিত সভ্য জাতির তুলনা দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তই সাব্যস্ত হইয়া উঠে। ফলতঃ সভ্যতা কোন জাতির এককালে উদয় হয় নাই, ইহা ধাপে ধাপে গঠন হইয়াছে এবং সেই সমস্ত রূপ কোন কোন পণ্ডিত এইরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। প্রথম একটী রূপ মনে কর আগুন জালিবার ক্ষমতা। আমরা এক্ষণে ইয়োরোপীয়দিগের কল্যাণে দুলাখ পাঁচলাখ অগ্নি শলাকা জামার জেবে লইয়া বিচরণ করিতে পারি। কিন্তু এক সময়ে ধরাতলের এরূপ অবস্থা ছিল যে 'একটু আগুন দাও ত গা' এ কথা সম্বোধন করা যায় এমন কেহ ছিল না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা আগুন বাহির হয় এই সামান্য তত্ত্বটুকু পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যতই শীত পড়ুক, সকলই বর্দাস্ত করিয়া লইতে হইত এবং প্রত্যহ শীতকালে শত করা আশী নব্বই লোক মারা পড়িত। এই নিমিত্ত যখন অগ্নি প্রস্তুত করিবার সন্ধান বাহির হইল, তখন একটী মহীয়সী আবিষ্ক্রিয়া করা হইল বলিতে হইবেক। আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ বনমানুষগণ এ ক্ষমতা উপার্জ্জন করেন নাই। যখন খাড়া হইয়া বেড়াইবার ক্ষমতা কতকটা বৃদ্ধি হইয়াছিল যখন দুই হাত চলনক্রিয়ার সহকারিতা কার্য্য হইতে কতকটা অবসর পাইয়াছিল, তখন বোধ হয়

উহার মধ্যে একটু বেশী চালাক অসভ্য শীতকালে কোন দাবানলের নিকটে কি রূপ আরাম পাওয়া যায় তাহা অনুভব করিতে করিতে হঠাৎ এক দিন দুই ডালের ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে দেখিয়া থাকিবে। সে অবশ্যই কিছু বেশী একটু চালাক ছিল, নচেৎ তাহার ঠাহর থাকিত না। এই আবিষ্ক্রিয়া বোধ হয় মানুষের সভ্যতা আরোহণের প্রথম ধাপ। ইহার গুরুতরতা বাক্যে ব্যক্ত করা অসাধ্য। কলের গাড়ীই বল, কলের জাহাজই বল, তারের খবরই বল, এই অগ্নি আবিষ্ক্রিয়ার নিকটে কিছুই লাগে না। এই নিমিত্ত ভুবনমাননীয় কম্‌টি মহাত্মা মনুষ্যসমাজের সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সমস্ত পর্ব্বাহ কল্পনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অগ্নি-আবিষ্ক্রিয়া-সংক্রান্ত এই একটি উৎসব সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীনতম কবিতাতে অর্থাৎ ঋগ্বেদে অগ্নির উপাসনা, ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা বর্ণন এই সকল রচনার আর ইয়ত্তা নাই। ঋগ্বেদ যখন রচনা হইয়াছিল, তখন যে অগ্নি-আবিষ্ক্রিয়া অনেক দিন হইয়া গিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ ঋগ্বেদরচয়িতাদিগকে আমরা এতদূর ঘোর অসভ্যাবস্থাপন্ন জ্ঞান করি না, যেন এইমাত্র তাহারা আগুন জ্বালিতে শিখিয়াছে, যেন ঐ আবিষ্ক্রিয়ার নবতা তাহাদিগের নিকট তখনও অপনীত হয় নাই, যেন তাহারা নূতন নিধি পাইয়া সেই নিধির গুণগানে কণ্ঠস্বর ছাড়িয়া দিয়াছে। এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসংগত হইবেক। কিন্তু আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অগ্নি-আবিষ্ক্রিয়ার পরম্পরাগত কিংবদন্তীটী ব্রাহ্মণেরা অতি যত্নে লালন পালন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই 'মামুলী' কাঠে কাঠে ঘর্ষণের আগুণটী ভুলিতে পারেন নাই, যজ্ঞের অগ্নি ঘর্ষণ-জনিতই হওয়া চাই, উহা পুরাতন আগুন হইলে চলিত না। এই বিশ্বাসের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, ঘর্ষণ জন্য তাঁহারা অগ্নিকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। আর পবিত্র বলিতে যাহা প্রাচীন প্রথানুগত। ইহাতে বোধ হইতেছে যে অগ্নি-উৎপাদনের আদিম প্রথাটী ব্রাহ্মণেরা কোন মতে হাতছাড়া করিতে রাজী ছিলেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ও তাহার পরিণাম।

প্রাচীন হিন্দুগণ ত্রয়ী, দণ্ডনীতি ও বার্ত্তাশাস্ত্রে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন আন্বীক্ষিকীতেও তাহার কোন অংশে হীন ছিলেন না। আন্বীক্ষিকী বি-

জ্ঞান শাস্ত্র। কেবল আন্বীক্ষিকী কিম্বা বিজ্ঞান বলিলে হয়ত অনেকের বোধগম্য হইবে না। বিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। বিজ্ঞান বলিলে তর্কশাস্ত্র রসায়নবিদ্যা শিল্পশাস্ত্র এবং চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বুঝায়। এমন এক সময় ছিল যখন হিন্দুগণ পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা কি সভ্যতা, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রতাপ, কি জ্ঞান সকল বিষয়েই উন্নতিশালী ছিলেন। সংসারকে সুখধাম করিবার জন্য যে সকল শিক্ষা ও উপায়ের প্রয়োজন তাহা তাঁহারা সমস্তই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র একটী। সংসারে আগন্তুক ও অনাগন্তুক ব্যাধি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এমন কেহ নাই যে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। তাহার দমনের নিমিত্ত একমাত্র উপায় চিকিৎসাতত্ত্ব (শাস্ত্র)। হিন্দুদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম আয়ুর্ব্বেদ। অনেকের জ্ঞান আছে সাম ঋক্ প্রভৃতির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ বলিয়া একটী স্বতন্ত্র বেদ আছে। এ জ্ঞানটী ভ্রমমূলক। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রুগ্ন ব্যক্তির রোগ শান্তি ও সুস্থ শরীরীর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং যে শাস্ত্রে আয়ুর বিষয় বর্ণিত ও আয়ুর বর্দ্ধনোপায় প্রদর্শিত আছে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। *

এইটী আয়ুর্ব্বেদের বিশদ ও বিস্তীর্ণ লক্ষণ নহে। কি রূপ নিয়মে থাকিলে জীবন সুখময় হইবে, নিয়ম লঙ্ঘনে কতদূর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, জীবনের সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, আয়ুর পরিমাণ কত এবং আয়ু কাহাকে বলে, এই সমস্ত বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার নাম আয়ুর্ব্বেদ। †

পৌরাণিকী বার্ত্তানুসারে ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গভূত সহস্রাধ্যায়ে বিভক্ত লক্ষশ্লোকী আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিয়া তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে সেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। প্রজাপতি আবার অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইন্দ্রের নিকট হইতে ধন্বন্তরি এবং ভরদ্বাজ শিক্ষা লাভ করিয়া প্রথম শল্যতন্ত্র দ্বিতীয় কায়-চিকিৎসা মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মাই আবার মনুষ্য সকলকে অল্পায়ু ও অল্পমেধ দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে এক জনের জীবনে অপারগতা জানে আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় আট অঙ্গে বিভক্ত করেন। যথা, শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন-তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র। বিভক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে এক এক ব্যক্তি এক

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ। আয়ুরস্মিন্ বিদ্যতে অনেন বা আয়ুর্ব্বিন্দতীত্যায়ুর্ব্বেদঃ। সুশ্রুতঃ সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

† হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতং মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে। চরক সূত্রস্থান প্রথম অধ্যায়।

এক অঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে পারদর্শী হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ইন্দ্রের নিকট হইতে ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ঋষি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ধন্বন্তরি দিবোদাস নামে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া কাশীর রাজা হইলেন। তিনি বাণপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিতি কালে সুশ্রুত প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিকুমারকে অন্যান্য অঙ্গের সহিত প্রধানরূপে শল্যতন্ত্র উপদেশ দেন। তাঁহার শিষ্যেরা সকলেই এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সুশ্রুতের গ্রন্থ, সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহাই আদরণীয় হয়। সুশ্রুতের কৃত গ্রন্থের নাম সুশ্রুত। এই সুশ্রুতে শল্যাঙ্গের বিষয়ই বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে ও অন্যান্য অঙ্গ সংক্ষেপে আছে। আমরা যে সুশ্রুত এক্ষণে দেখিতে পাই তাহা আবার নাগার্জ্জুন নামে এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তৎকালের কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রী, ইহার প্রতিসংস্কার অর্থাৎ সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টরূপে সংশোধন করেন। নাগার্জ্জুন কোন সময়ের লোক তাহা অবধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। তবে এসিয়াটিক রিসার্চ্চে এক নাগার্জ্জুনের কথা আছে তাঁহার বয়স খৃঃ শাকের ১৪১ একশত একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। বোধ হয় সেই নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইবেন। কারণ এসিয়াটিক রিসার্চ্চে তাঁহাকে চিকিৎসক বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে।

ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিয়া আত্রেয় পুনর্ব্বসু প্রভৃতি ঋষিগণকে উপদেশ দেন। আত্রেয় পুনর্ব্বসু আবার অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণকে উপদেশ দেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তম্মধ্যে অগ্নিবেশের গ্রন্থই অধিকতর আদরণীয় হয়। এই গ্রন্থে (অগ্নিবেশকৃত) কায়চিকিৎসাই বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। অন্যান্য অঙ্গ অল্প পরিমাণে উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু সুশ্রুতে যেরূপ শল্যাঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য তন্ত্রের বিষয় বর্ণিত আছে অগ্নিবেশের গ্রন্থে কায়চিকিৎসা ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ সেরূপ বাহুল্য বর্ণিত নাই।

অগ্নিবেশের গ্রন্থের আবার কিছুকাল পরে চরক নামক এক ব্যক্তি প্রতিসংস্কার করেন। চরক কোন্ সময়ে কোন্ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য। পৌরাণিক বার্ত্তা অনুসারে পৃথিবী এক সময়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়াতে মানবগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছিল তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান্ বিষ্ণু মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন এবং চরের ন্যায় গুপ্ত ভাবে নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ অগ্নিবেশের গ্রন্থ উদ্ধার ও তাহার প্রতিসংস্কার করিয়া মানবগণকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন ও পৃথিবীকে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

বিষ্ণু রোগশোকার্ত্ত মানবগণের ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত চররূপে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চরক।

সেই চরক দ্বারা প্রতিসংস্কৃত, এই জন্য অগ্নিবেশের গ্রন্থের নাম চরক হইয়াছে।

চরক বিষ্ণুর হাতেও সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার সিদ্ধিস্থান আর এক ব্যক্তির কৃত; তাঁহার নাম দৃঢ়বল।

আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয় বাক্যতা ও পবিত্রতা দর্শাইবার জন্য উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল না। ইহার প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার জনাই লিখিত হইল। ইহা এক দিনের ও এক সময়ের বস্তু নহে। মুনিগণ ধ্যানস্থ হইয়া দৈববাণী দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসপটে মুহূর্ত্ত মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ অঙ্কিত দেখেন নাই। ইহা তিন প্রমাণে সংগৃহীত এবং বহুকালের বহুদর্শিতার ফল।

প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের (চরক সুশ্রুতের) পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা অতিশয় সুকঠিন, তবে উভয় গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় যে সুশ্রুত চরক অপেক্ষা প্রাচীন। যাহা হউক এস্থলে আমি সে বিষয়ের তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। সময়ান্তরে এবিষয়ের কথা উত্থাপন করিব।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এই আয়ুর্ব্বেদ শল্য প্রভৃতি আট অঙ্গে বিভক্ত। আট অঙ্গের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নাই। চরক সুশ্রুতেই সমুদায় অঙ্গ ন্যূনাধিক কল্পনায় বর্ণিত আছে। চরক সুশ্রুতই হিন্দুদিগের প্রাচীন মূল চিকিৎসা গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই—বাগভট প্রভৃতি সংগৃহীত ও বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদিও আয়ুর্ব্বেদ উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ হইয়াছে তথাপি নিদান স্থানের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। প্রাচীন চরক সুশ্রুতে যাহা আছে তাহাতে তিলমাত্রও সংযোগ হয় নাই, তবে চিকিৎসিত স্থানের ক্রমশঃ যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে উদ্ভিজ্জঘটিত ঔষধিই অধিক পরিমাণে ছিল। উদ্ভিজ্জ কষায়, উদ্ভিজ্জ বটিকা, উদ্ভিজ্জাবলেহ, উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত ঘৃত তৈল প্রভৃতিই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। ধাতু ও উপধাতু-ঘটিত ঔষধ অতি অল্প মাত্র ছিল। পারদের একেবারেই ব্যবহার ছিল না। ধাতুর মধ্যে কেবল লৌহেরই ভূরিপ্রয়োগ ছিল। স্বর্ণের ব্যবহার অতি অল্পমাত্র ছিল। তবে সকল ধাতুরই গুণ বর্ণিত আছে। ধাতু উপধাতু ও খনিজ দ্রব্য সকলের পরস্পরের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ানির্ণয়, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগ করণ, মনুষ্য-শরীরে তাহার পরীক্ষা ইত্যাদি তান্ত্রিকদিগের সময়েই পরীক্ষিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণ পারদ ও গন্ধককে শিব ও শক্তির অংশ ও এই দুই দ্রব্য ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন ও যোগাদি সাধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে বিবেচনা করিতেন। তদনুসারে তাঁহারা পারদ ও গন্ধকের সংশোধন জারণ মারণ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হন, এবং পারদ গন্ধক ঘটিত নানা প্রকার রাসায়নিক সংযুক্ত দ্রব্য সৃষ্টি করেন। "রসসিন্দূর" 'রসকর্পূর' 'রসমাণিক' এবং হিঙ্গুল সেই সময়ের ফল। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পারদ ও গন্ধকের সহিত জারণ এবং স্বর্ণ মাক্ষিক প্রভৃতি উপধাতুর

মারণও সেই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। ফলতঃ যেরূপ মধ্য সময়ের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্পর্শমণির অনুসন্ধানে রসায়ন বিদ্যার (কেমিষ্ট্রীর) মূল ভিত্তি স্থাপন করেন; সেইরূপ তান্ত্রিকগণ দীর্ঘজীবন ও যোগ সাধনার উৎসাহে পারদ ও গন্ধকের জারণ মারণের প্রসঙ্গে বিবিধ ধাতুর জারণ মারণ ও প্রাণীশরীরে তাহার প্রয়োগের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ঔষধকল্পে ধাতু বিষয়ের যাহা উন্নতি হইয়াছিল তাহা সেই তান্ত্রিকদিগের সময়েই। ধাতু বিষয়ক গ্রন্থ 'রস রত্নাকর' রসেন্দ্র চিন্তামণি, ও রসসাগর প্রভৃতি। অনেক তন্ত্রেও ধাতু ও উদ্ভিজ্জ ঘটিত ঔষধের কথা আছে। তান্ত্রিকদিগের মতে তন্ত্র সকল শিববাক্য, এজন্য সাধারণ লোকে শিবকে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে শিবের নামোল্লেখও নাই।

পুরাতন ঋষিগণ পর্ণকুটীরে বাস এবং ফল মূলাহার করিয়া বন, উপবন, মহারণ্য, পর্ব্বতগুহা, উপত্যকা প্রভৃতি পরিভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া এবং মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শবচ্ছেদ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ রূপ কীর্ত্তি স্তম্ভের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধস্তন সন্তানগণেরাও সেই ভিত্তির উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উত্থাপিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে তান্ত্রিক শাক্তবৃন্দও তাহার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। উন্নতির কথা অধিক আর কি বলিব কায় চিকিৎসার ত কথাই নাই, যাহা লইয়া এক্ষণকার অনভিজ্ঞ দেশীয় চিকিৎসকগণও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণের সহিতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। শল্যতন্ত্রেরও এত উন্নতি হইয়াছিল যে অশ্মরী চ্ছেদ এবং মূঢ় গর্ভের গর্ভবহিষ্করণের প্রণালী দেখিয়া অনেকানেক পাশ্চাত্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকও বিস্মিত হইয়াছেন।

সেই আয়ুর্ব্বেদের পরিণাম কি হইয়াছে? সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই। আয়ুর্ব্বেদ এখন সহায়হীন। যতদিন ভারতবর্ষে হিন্দু রাজাগণের আধিপত্য ছিল ততদিন ইহার আদর ছিল। ভারতবর্ষ যে সময় হইতে বিজাতীয়গণের হস্তগত হইলেন সেই সময় হইতেই ইহার উন্নতির ধ্বংশ হইল। অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্রেরও উন্নতির পথ রোধ হইল। ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। মুসলমানদের সময় তাহাদের যুনানী চিকিৎসার বহুল প্রচার ছিল। এখন ইংরাজদের সময় এলোপ্যাথি চিকিৎসার বহুল প্রচার। যে বিষয়ে রাজার আদর নাই প্রজাদেরও তাহাতে আদর হয় না। যেমন এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ও ঔষধালয় নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপিত হইতেছে, সেইরূপ রাজার আদর থাকিলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ঔষধালয়ও স্থাপিত হইত। কিন্তু রাজা বিদেশীয়; তাঁহাদের এদেশীয় চিকিৎসার উপর আদর বা আস্থা কেন হইবে? তাঁহারা এদেশীয় সমুদায় শাস্ত্রই প্রায় অমাত্মক বলিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশীয় লোকেরা

যে গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় রাজচ্ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া বহুকালের সঞ্চিত রত্নসকল পদদলিত করিয়া বিনষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদের মনে কি ক্ষোভ বা কষ্ট হইতেছে না।

শ্রী—ব

শঙ্করমণ্ডন সংবাদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর শঙ্কর বিচার করিতে হইবে বলিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক সশিষ্য মণ্ডনের গৃহে যাইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মণ্ডন পণ্ডিতও স্বীয় পত্নীকে মধ্যস্থ পদে নিয়োগ করিয়া বিচারে সমুৎসুক হইলেন। পতিদেবতা সারদা পতি-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বিদ্যার তারতম্য বিচারে মধ্যস্থপদে নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং সরস্বতীর ন্যায় শোভা পাইলেন।

যতীন্দ্রও বিচারে মণ্ডনের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া প্রথমে জীবেশ্বরের একত্ব রূপ স্বীয় মত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বলিলেন এক মাত্র সচ্চিদমল পরমবস্তু ব্রহ্মই, অজ্ঞানের আবরণে এই প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। শুক্তি যেমন রজতাত্মক না হইয়াও রজত রূপে প্রকাশ পায়, পরমাত্মাও সেইরূপ এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য-জ্ঞান লাভ হইলে নিখিল প্রপঞ্চ ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। এই ঐক্য-জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে লয়ের নামই নির্ব্বাণ।* নির্ব্বাণ লাভ হইলে আর ফিরিয়া সংসারে আসিতে হয় না, বেদান্ত তাহার প্রমাণ। যদি আমার জয় হয় ভাল, আর আমার যদি পরাজয় হয়, হে মণ্ডন, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হইব, এই পাটল বসনের পরিবর্ত্তে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিব; উভয়-ভারতী, আমাদের জয় পরাজয়ের বিচার করুন"।

যতিবর নিজ সম্বন্ধে এই রূপ উদার প্রতিজ্ঞা করিলে পর গৃহি-শ্রেষ্ঠ মণ্ডন স্বপক্ষ স্থাপনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া বলিলেন—"পরমাত্মা বিষয়ে বেদান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না অথবা যদিও করা যায়, যেহেতু পরমাত্মা নির্লিপ্ত তাহাতে শক্তিযোগ না হইলে তাহা দ্বারা কোন

---

* একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাচারম্ভণম্বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং, তরতিশোকমাত্মবিৎ। তত্র কোমোহঃ কঃশোকঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ন স পুনরাবর্ত্ততে ইত্যাদি।

কার্য্য হয় না ; বেদ অপৌরুষেয় অতএব স্বতই প্রমাণসিদ্ধ। বেদে কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানেরই কথা আছে কথার প্রয়োজন কার্য্যোতেই পর্য্যবসিত হয়। কেহ যদি বলে ঘট আন, ঘটানয়ন পর্য্যন্তই সেই কথার প্রয়োজন থাকে। ঘট আনিলে পরে সে কথা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার 'ঘট আন' এই কথার দ্বারা ঘট কি পদার্থ তাহার মীমাংসা হয় না, বেদবাক্য সম্বন্ধেও অবিকল সেই রূপ ; বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান মাত্র তাহার প্রয়োজন। ক্রিয়ানুষ্ঠানেই মুক্তিলাভ হয় ইহা বেদের অভিমত, মানুষ আজীবন তাহাই করিবে।

যদি আমি বিচারে পরাজিত হই আমিও এই শুক্ল বসন পরিত্যাগ করিয়া পাটল সাটি পরিধান করিব, গার্হস্থ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিব। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ তাহার বিপরীত আমার ঘটিবে। আমাদের উভয়ের সম্মতি ক্রমে আমার স্ত্রীই মধ্যস্থ হউন"।

পরাজিত ব্যক্তি জেতার আশ্রম গ্রহণ করিবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শঙ্কর ও বিশ্বরূপ উভয়েই জয় লাভের মানসে বিচার আরম্ভ করিলেন। উভয়-ভারতী * বিচারে মধ্যস্থ রহিলেন। নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়াই তাঁহারা বিচার আরম্ভ করেন, এইরূপ দিনের পর দিন যায়, উভয়-ভারতী গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া সকল সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত থাকিতে পারেন না, অতএব তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতদ্বয়ের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া বলিলেন যাহার কণ্ঠমালা মলিন ভাব ধারণ করিবে তাহারই পরাজয় জানিবে। এই বলিয়া তিনি মণ্ডনের আহারের এবং যোগীর ভিক্ষার আয়োজন করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করেন।

বাস্তবিক পক্ষে অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের মতন সাক্ষ্য নাই,কে জেতা কে জিত উভয়ের অন্তরাত্মা তাহার প্রধান সাক্ষী। আত্মার সাক্ষ্য মুখচ্ছবিতে প্রতিভাত হয়। কোনরূপেই মুখের উজ্জ্বল অথবা মলিন কান্তি পরিবর্ত্তন করা যায় না। শত চেষ্টার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহা বাহির হইয়া পড়ে। জড় প্রকৃতি কণ্ঠের হার পর্য্যন্ত যে সহানুভূতিসূত্রে, জয় হইলে আনন্দে উজ্জ্বল, ও পরাজয় হইলে মলিন কান্তি ধারণ করিবে ইহার বিচিত্র কি। তাপমান যন্ত্রে যেমন উত্তাপের তারতম্য স্থির হয় সেইরূপ জয় পরাজয়ে গলার মালায় তাহা প্রকাশ হইবে মণ্ডন পত্নী স্থির করিলেন।

এদিকে তাঁহারা বিবাদ চালাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদিদেবগণ আসিয়া আকাশে নিজ নিজ বাহনে বসিয়া তাঁহাদের বিচার শুনিতেছিলেন। তুমুল বিবাদ হইতে চলিল। সভাস্থ লোকেরা সাধুবাদ করিতে লাগিল। প্রত্যেকেই বেদকে নিজ পক্ষে সাক্ষী করিতে লাগিলেন,দিনে দিনে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতে চলিল, দেশদেশান্তর হইতে পণ্ডিতগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। পরস্পর জিগীষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল, তথাপি একের অন্যের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব হইল না।

* উভয়-ভারতী, উভয়-ভারতী, সারদা ইত্যাদি মণ্ডনের স্ত্রীর নাম।

উভয় ভারতী প্রতিদিন মধ্যাহ্নে যথা সময়ে আসিয়া মণ্ডনকে আহারের জন্য, যতিকে ভিক্ষার জন্য বলিয়া যাইতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন চলিয়া গেল। তাঁহারা একাসনে বসিয়া পরস্পরের উত্তর সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ঘর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মুছিবার সময় বা একবার আ-কাশ পানে তাকান্ এমন অবসর নাই। অনেক বিচারের পর যতিরাজ মণ্ডনের বিচার-নিপুণতায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "তোমার যাহা বলিবার থাকে বল"। মণ্ডন বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈত মত খণ্ডন করিয়া স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "হে যতি-রাজ আপনারা যে বলেন জীব এবং ঈশ্বর বস্তুতঃ এক আমরা তাহার কোন প্রমাণ দেখি না।"

শঙ্কর উত্তর করিলেন "এই ত প্রমাণ যে উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গুরুগণ শ্বেত-কেতু জনক প্রভৃতি শিষ্যদিগকে তুমিই ঈশ্বর, আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া জান এই রূপ বুঝাইতেছেন। *

মণ্ডন। "বেদান্তে যেমন হুম্‌ফট্ প্রভৃতি শব্দ কোন বিশেষ অর্থে বলা হয় না কিন্তু জপ্ করিলে পাপমোচন হয় তত্ত্বমসি শব্দও সেইরূপ"

শঙ্কর। "হুম্‌ফট্ প্রভৃতি শব্দের কোন অর্থ হয় না বলিয়াই বিজ্ঞেরা সে সকল জপোপযোগী স্থির করিয়াছেন। হে প্রাজ্ঞ, এই সকল বাক্যের যখন স্পষ্ট অর্থ হয় তখন কি করিয়া এ সকলের জপমাত্র প্রয়োজন হইবে।"

এ স্থলে ইহা জিজ্ঞাসা হইতে পারে অর্থ-শূন্য শব্দ জপের প্রয়োজন কি ?

যত কিছু শব্দ সার্থক তাহাদের অর্থ বাহ্য অথবা মানস বৃত্তির গোচর। পরমাত্মা বাহ্য, মানস সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তির অ-গোচর। তবে তিনি আছেন কি করিয়া জানা যায় ? যেহেতু তিনি চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ। তাঁহাকে জানিতে হইলে বাহ্য অথবা মানস কোন ইন্দ্রিয়ের চালনা করিতে হয় না। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিলেই তাঁহার স্বপ্রকাশ সত্তা উপলব্ধি হয়। যাহা মনে ধারণা করা যায় না সার্থক শব্দে তাহার নাম দেওয়া যায় না। সেই জন্য কোন শব্দে পরমাত্মার নাম হয় না। যদি হয় তবে অর্থশূন্য শব্দে কিঞ্চিৎ হয় ; এই হয় যে তিনি আছেন ; কিন্তু তাঁহাকে বর্ণনা অসাধ্য। নতুবা সন্ন্যাসীদের মতন অজপা সাধন করিতে হয়।

মণ্ডন পূর্ব্ব কথা ফিরাইয়া বলিলেন "আপাততঃ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন হয় বটে, তথাপি এ কেবল যজ্ঞকর্ত্তার প্রশংসাবোধক মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নাই।"

শঙ্কর। "ক্রিয়াকাণ্ডে যজ্ঞাঙ্গভূত যূপা-দিকে অর্থবাদ রূপে প্রশংসা করিয়াছে বটে, যথা 'যূপ্ আদিত্য স্বরূপ' 'প্রস্তর [illegible]

* "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" আবার যাজ্ঞ-বল্ক্য জনককে বলিতেছেন "অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ সর্ব্বমভবৎ তত্রকো মোহঃ কঃশোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"।

মানস্বরূপ'। সে স্থলে যদি এ সকলের বিধি শেষ করা মাত্র প্রয়োজন হয় হউক। কিন্তু জ্ঞান কাণ্ড স্থিত তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদি বাক্য কি রূপে বিধিশেষার্থ হইবে? *

মণ্ডন। হে অর্হন্, তবে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য জীব ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদক হউক।

---

* বিধিশেষ, অথবা অর্থবাদ কথা আমাদের শাস্ত্রে এক প্রকার পতিত পাবন বিশেষ বলিলে হয়। যাহা কিছু শাস্ত্রে অসত্য অথবা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় সমস্তই এই নামে পার পাইতে পারে।

মাতা যেমন সন্তানকে ঘুম পাড়াইতে হইলে বলেন 'ঘুম, না হইলে তোকে শিয়ালে লইয়া যাইবে'। দুরন্ত বালক স্থির ভাবে বসিয়া না খাইলে ভয় দেখাইয়া বলেন 'খাইতে বসিয়া যে উঠে সে বিবাহের সময় পিঁড়া হইতে পড়িয়া যায়' খাবার বস্তুতে পিপড়া পড়িলে শিশু না খাইলে প্রলোভন দেখান 'পিপড়া খাইলে সাঁতার শিখে'; ইত্যাদি এইরূপ করাতে যদি মিথ্যা কথনের দোষ হয় তবে পঞ্চতন্ত্র অথবা হিতোপদেশের কাক শৃগালাদির গল্পতেও সেই দোষ না হইবে কেন? শাস্ত্রকারগণও জন সাধারণের মাতা হইয়া এইরূপ অনেক অলীক ফলের কথা বলিয়া গিয়াছেন। শিশুকে ঘুম পাড়াইতে হইলে তাহার নিকট নিদ্রার উপকারিতা বর্ণন করিয়া নিদ্রাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন যেমন অসম্ভব, সাধারণেরও অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে যাহার উপকারিতা তাহার স্থূল বুদ্ধির অগম্য। শিয়ালে নেবার কথা যেমন শিশুর বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়াই মাতা তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারগণও সাধারণের স্থূলবুদ্ধির গোচর কোন কাল্পনিক ফলের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত অথবা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। নিষ্কাম দানের উপকারিতা সকলের বোধগম্য হয় না। দান না করিলেও আবার মন পশুবৎ সঙ্কীর্ণ হয়। স্বর্গ লাভের আশায় দান করিতে অনেকেই প্রস্তুত, এ জন্যই স্বর্গলাভের জন্য দান দক্ষিণা যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। স্বর্গকামোযজেত। বিধি অর্থাৎ অনুজ্ঞাবাক্যের নিন্দা বা স্তুতিবোধক ফল কথনের নাম বিধিশেষ। বিধি, যথা, "ওদনং পচেৎ" 'অন্ন প্রস্তুত করিবে'; বিধিশেষ যথা, "আয়ুর্ব্বর্চো বলং সুখং প্রতিভানঞ্চান্নে প্রতিষ্ঠিতং", আয়ু, বাক্য, বল, বুদ্ধি, সুখ, অন্নই সকলের মূল। অনেক স্থলে কথিত ফলসকল বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় বিরুদ্ধ। "সর্ব্বস্যাপ্ত্যৈ সর্ব্বস্য জিত্যৈ সর্ব্বমেবৈতেনাপ্নোতি।" অর্থ, সকল 'কামনা সিদ্ধ হয়, সমস্ত জয় হয়, এই যাগ করিলে সমস্ত লাভ হয়।'

কবিরাজ খুড়োর! ব্যবস্থায় গরু হারাইলেও পাওয়া যায়। একেবারে যদি সমস্তই লাভ হইল পরে সে ব্যক্তি করিবে কি? অনেক স্থলে কথিত ফল নিতান্ত ছেলে ভুলানর মতন। যেমন 'জ্যোতিষ্টোম না করিয়া যে অন্য যজ্ঞ করে সে একেবারে গর্ত্তে পড়ে', ইত্যাদি। এইরূপ শাস্ত্রে যতপ্রকার অপ্রত্যক্ষ ফলের কথা বলা হইয়াছে তাহার কোন্‌টি প্রকৃত আর কোন্‌টি বিধিশেষ মাত্র তাহা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত দুরূহ। হয়ত শাস্ত্রের অপ্রত্যক্ষ ফল মাত্রেই অলীক কল্পনা, বিধিশেষ মাত্র। এই জন্যই ভগবান্ কৃষ্ণ এই সকল অলীক বৈদিক কর্ম্মফলের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদ রতাঃ পার্থ নান্য দস্তীতি বাদিনঃ"।

এ জন্যই ভগবান্ জৈমিনি সূত্র করিতেছেন।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং।"

কিন্তু তাহা কেবল কর্ম্মের উন্নতির জন্যই ঐরূপ বলা হইয়াছে। যেমন "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অন্নমুপাস্ব, আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব সম্বর্গ বাক্য ইত্যাদি দ্বারা অব্রহ্মভূত মন অন্ন অর্ক এবং বায়ু পূজাতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য সে সমস্ত ব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ জীবোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য জীবকেই ব্রহ্ম কল্পনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর। "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" 'মন ব্রহ্ম তাহার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্থলে লিঙ্ প্রয়োগদ্বারা অথবা 'করিবে' পদদ্বারা মনের উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু 'তুমিই ব্রহ্ম' এই বাক্যে কোন উপাসনা বিধির নির্দ্দেশ করা হয় নাই; অতএব হে মনীষিন্ কি রূপে কল্পনা করা যায় যে জীবোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অন্নব্রহ্মের ন্যায় জীবব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

মণ্ডন। হে যতিরাজ, মীমাংসা শাস্ত্রে যেমন "প্রতিতিষ্ঠন্তিহবায এতা রাত্রীরূপযন্তীতি" 'যাহারা রাত্রি নামে সোমযাগ বিশেষের অনুষ্ঠান করে, তাহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে,' এস্থলে প্রতিষ্ঠা রূপ ফল লাভের উল্লেখ আছে বলিয়া রাত্রিযাগের বিধি কল্পনা করা যায়, সেইরূপ 'ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'যে ব্রহ্ম জানে সে ব্রহ্ম হয়' এস্থলে ব্রহ্মত্ব-লাভ রূপ ফলের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের বিধি কল্পনা করা যায়। যথা 'যদি ব্রহ্ম হইতে চাও তবে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ কর।'

শঙ্কর। যদি উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই 'জীব ব্রহ্ম' বলা হইয়া থাকে, এবং মোক্ষ যদি উপাসনা ক্রিয়ার ফল বিশেষ মাত্রই হয়, তবে স্বর্গাদি রূপ অপর ক্রিয়াফলের ন্যায় মোক্ষও নশ্বর হইবে, যেহেতু উপাসনা মনের কার্য্য বিশেষ, করা না করা মানুষের অধিকার। 'সন্ধ্যাং ধ্যায়েৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্যে ধ্যান করা না করা ধ্যাতার অধীনে, মোক্ষ যদি এইরূপ কোন বিধি অনুষ্ঠানের ফল মাত্র হয় তবে তাহাও অনিত্য হইবে। যদি বল তোমার মতেওত মোক্ষ অনিত্য' যেহেতু 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানও মনের ক্রিয়া বিশেষ। ইহার উত্তর এই অদ্বৈত জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া বিশেষ হইলেও বস্তু যে রূপ ঠিক তাহারই জ্ঞান বলিয়া জ্ঞান করা না করা আর জ্ঞাতার মনোবৃত্তির উপর নির্ভর করে না। যেমন যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পাইয়াছে, সে যদি একবার রজ্জু বলিয়া জানিতে পারে, তবে আর সে পুনরায় সেই রজ্জুকে সর্প জ্ঞান করিয়া ভয় পায় না।

মণ্ডন। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নাই বা হইল, কিন্তু জীবাত্মার এবং পরমাত্মার সাদৃশ্য প্রতিপাদক হউক।

ক্রমশঃ।

—:০:—

ভাউ সাহেবের বখর।

শিন্দে অটক ও কিল্লেকুশাদ এই দুই তোপ বাহির করিয়া লইলেন। অটকের যোড়া তোপ ফত্তে নস্কর মাত্র শিলিম গড়ের কিল্লায় রহিল। অটক তোপের চতুর্দ্দিকে তিন সারি করিয়া তিন শত পঞ্চাশ গরু যুড়িয়া দিল। দুই হাতি লাগাইল। তত্রাপি তোপ সেস্থান হইতে সরে না। পরে নগর হইতে একজন মানুষ আনিয়া তোপের উপর বলি দিল। ছাগ, মোরগ, নারিকেল, নেবু প্রভৃতি বলিরত সংখ্যা ছিল না। অতি কষ্টে তোপ লস্করেতে আনীত হইল। তোপ উজ্জয়িনীতে লইবার প্রস্তাব হইল। তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। শিন্দের মানস যে, "আর একবার নাগুরাতে যাইয়া এই তোপ দ্বারা বিজেসিংকে আক্রমণ করিব।" তাঁহার মনে এই আশাই অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু তোপ লইবার বিষয়ে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইল। জাট পক্ষীয় রূপরাম কটারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার কর হইতে দুই লক্ষ টাকা কমাইলে তিনি তোপ উজ্জয়িনীতে পৌঁছাইতে সম্মত হইলেন। উক্ত অঙ্গীকারে তোপ তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তিনি তোপ লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। এ তোপ কোন কালেই উজ্জয়িনীতে পৌঁছিল না। শেষে যখন ইহাঁদের বিনাশ কাল উপস্থিত হইল তখন এই তোপ চমেলীর খালে আচরী ঘাটে পড়িয়াছিল। কিল্লেকুশাদ সঙ্গে চলিল। গাজুদীখান উজীরের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি দিল্লিতেই রহিলেন। দত্তাজী শিন্দে কুচ করিয়া মজল দর মজল পানিপত হইয়া কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। সেখানে আটদিন থাকিয়া চারি তুলাদান করিলেন, পরে মজল দর মজল শতদ্রু পর্য্যন্ত গেলেন। লাহোরের সুভা সন্দীপ বেগের পুত্র ও লক্ষ্মীনারায়ন আসিয়া সাক্ষাৎ করিল। তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া পনের সহস্র সৈন্য সহ সাবাজী শিন্দে ও ত্র্যম্বক বাপুজীকে লাহোর, ‥ তান, পঞ্জাব, কাশ্মীর, অটক পর্য্যন্ত ‥ কার করিতে পাঠাইলেন। শিন্দে ‥ কুচ করিয়া কুঞ্জপুরার নিকটে শিবির করিলেন। মনে যোজনা করিলে ‥ জীবখানকে হস্তগত করত তাহ ‥ ভাগীরথীর উপর পুল বাঁধিয়া ‥ সাধন করিব।" জনকোজী শি ‥ শঙ্কর ও অন্তাজী মানকেশ্ব ‥ মনোভাব এই যে, "শ্রীমন্ত আ ‥ তদনুযায়ী কার্য্য করা হউক। ‥ শাস্তি দেওয়া যাউক।" সক ‥

গোবিন্দ পন্ত বুন্দে ‥ পরস্পরের সহিত মিত্রত ‥ খান বলিতে লাগিলেন, "‥

দাওনী, সুভেদার মলহাররাও তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ দত্তাজী শিন্দে সম্মুখে উপস্থিত। আমার গতি কি হইবে?" গোবিন্দ পন্ত অভয়দান করিয়া বলিলেন, "তুমি স্বস্থানে নিশ্চিন্ত থাক। উভয় পক্ষে মধ্যস্থতার ভার আমার।" গোবিন্দ পন্ত দত্তাজী শিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শিন্দে ভাগীরথীর পুল বাঁধা সম্বন্ধে গোবিন্দ পন্তের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, "পাটীল বাবা, নজীবখান বিনা এ কার্য্য হইবার নহে।" ইহাঁর মনে ইহাই ছিল। উনিও সেই প্রস্তাব করিলেন। এ বিষয় ইহাঁর মন সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিল। গোবিন্দ পন্ত বুন্দেলকে বলিলেন, "নজীবখানকে অসঙ্কোচে লইয়া ...সিবে। তোমার ও আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য তাহাই করা যাইবে।" গো- ... পন্ত বুন্দেলে নজীবখানের নিকটে ... পাঠাইলেন। তিনি তো পূর্ব্ব ... আকুল হইয়াছিলেন। চারি সহস্র ... নজীবখান রোহিলা সাক্ষাৎ ... আসিলেন। দুই ক্রোশ অন্তরে ...ন করিলেন। বুন্দেলে দত্তাজী ...ই সংবাদ শুনাইবামাত্র তিনি ... যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হই- ... জনকোজী, নারো শঙ্কর, ...স্বর, জানরাও বাম্বলে প্র- ... সরদার একত্রে মিলিত ... করিলেন, "শশক যেমন নজীবখান রোহিলা তদ্রূপ আসিয়াছে। আজিকার দিন কোন মতেই ইহাকে ছাড়া হইবে না।" তাঁহারা দত্তাজী শিন্দেকে এই কথা বলিতে আসিলেন। তিনি শুনিয়া তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, "স্বকার্য্য সাধনার্থে বৈরীর সহিত মিত্রতা করা আবশ্যক। ইহাতে আমি কি ক্ষতি করিতেছি?" জনকোজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, মনে করিলেন, "নাক খাট ভাল তবু বয়স ছোট ভাল না।" কাহারও চেষ্টা সফল হইল না। স্ত্রীলোকদিগের, বালক বালিকাদে... পর্য্যন্ত ইচ্ছা নহে যে এবার নজীবখানকে ছাড়া হয়। কিন্তু কাহারও কথা না শুনিয়া দত্তাজী শিন্দে অগ্রসর হইয়া নজীবখানকে লইয়া আসিলেন। নজীবখানকে বলিলেন, "আমার নিমিত্ত ভাগীরথীর পুল বাঁধিয়া দেও। তোমাকে সর্ব্বাগ্রে পাঠাইতেছি। পরে যে ধন লাভ করিব তাহার দশমাংশ দিব। আর যে দেশ হস্তগত হইবে তাহারও দশমাংশ দিব। তুমি আমি এক প্রভুর ভৃত্য, একনিষ্ঠ হইয়া সেবা করা উচিত।" নজীবখান তাহা মান্য করিলেন। দত্তাজী শিন্দে নজীবখানকে বিল্বিপত্র হরিদ্রা দিয়া বাকদত্ত হইলেন। নজীবখান তাঁহাকে সাজক্রোটী দিলেন। দুই জনে অভেদাত্মা হইলেন। দশপনের দিন একত্রে রহিলেন।

ভাগীরথীর পরপার অযোধ্যাতে সুজাউদ্দৌলা ছিলেন। নজীবখান গুপ্তরূপে চেতরাম উকীল দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "দত্তাজী শিন্দে স্থির প্রতিজ্ঞ। তোমার প্রতিই যাত্রা করিবে। আমি

একবার মন্ত্রণা করিয়া অবতুল অল্লীকে আনাইয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে তোমরা সকলে সাহায্য করিলে না। সে মন্ত্রণার ফল এইরূপ দাঁড়াইল। আমিই সকলের শত্রু হইলাম। এক্ষণে আর একবার সব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য এই কথা বলিয়া বলিয়া পাঠাইলাম। ইহার উত্তর যাহা হয় দিবে অনুপসহরের, অহমদখান নংগড়া পাঠাণ তাঁরই কেবল নামাদের উপর মমতা অ [illegible] স্থির কর বলিয়া পাঠা[illegible] নিয়া স্মজাউদ্দৌলা উত্ত[illegible] পিতার উজিরী গে[illegible] স্থানে আসিয়া কোন [illegible] কালক্ষেপ করিতেছি, এখানেও [illegible] শত্রু থাকিতে দিবে না। মরণাপেক্ষা অপমান অধম। এখন আমার অন্য উপায় নাই। নজীবখানকে বলিবে, আমি সর্ব্বতোভাবে তার আয়ত্তাধীন। পঞ্চাশ সহস্র ফৌজ ও তিন শত তোপ তাহাকে সমর্পণ করিতেছি, আর যদি পাঁচ কোটি টাকাও খরচ লাগে তাহাও যোগাইব। কিন্তু শত্রুকে নদীপার হইতে দিবে না।" উকীলকে সাজক রোটী দিয়া বিদায় করিলেন।

এ দিকে অবতুল আলির সঙ্গে বরাবর একটা মন্ত্রণা চলিয়াছে। এর মধ্যে আবার স্মজাদ্দৌলার সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত হইলে রোহিলা নজীবখাঁ দত্তাজী সিন্দের শিবিরে গিয়া বলিল—"সাহেব, তুমি গড়মুক্তেশ্বরীতে গিয়া তীর্থ বিধি কর, আমাকে আজ্ঞা দেও মীরপুরের নিকটে শুক্রতাল আছে সেখানে গিয়া ভাগীরথীর পুল বান্ধিয়া ঠিক করিয়া রাখিব। ইচ্ছা হয় ত এক মাসের পূর্ব্বে আপনি আসিবেন"।

নজীবখাঁ এক মাস ১৫ দিন থাকিয়া খোসামোদ করিয়া অকপট ভাব দেখাইয়া ছিল সিন্দে তাই তাঁহার কথা সব সত্য মনে করিলেন। হাতি ঘোড়া জহর বস্ত্র বহু মান দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। এ সময় জনকোজী সিন্দে ও আর আর সকলে বলিলেন "ইহাকে শাসন করা উচিত ছিল তাহা করিলেন না। এখন ইহাকে কাছে রাখিয়া ইহার দ্বারা কার্য্য করিয়া লওয়া হৌক্—ইহাকে হাতছাড়া না করা হয়।" ইহাতে দত্তাজী সিন্দে উত্তর দিলেন "তোমরা সবাই খুব কাজের লোক আর আমিই কেবল কিছু বুঝিনে। নজীব খাঁ একজন খাঁটী লোক আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে। সেই জন্য আমি তাঁহাকে বিদায় দিলাম।" এ উত্তরে আর কে কি বলিবে। সকলে ভাবিল—পিঁপড়ার পাখা হইলে যাহা হয় তাই হইয়াছে"—উপায় নাই সুতরাং সকলেই চুপ চাপ করিয়া রহিল।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

সঙ্গীত সংগ্রহ। (বাউলের গাঁথা)। দ্বিতীয় খণ্ড। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনা কালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সঙ্গীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতেছেন, "যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউলের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব—কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ করিবার বড় কোন উপায় নাই—তখন সুশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর সুভাবপূর্ণ সঙ্গীত কেন সংগ্রহ করিব না আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি।" এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথমতঃ গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে হয়, বাউল সম্প্রদায় রচিত গান অথবা বাউলদিগের অনুকরণে রচিত গান সংগ্রহই ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য্যরচিত "মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং" ইত্যাদি সংস্কৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুন্সী জালাল উদ্দিন রচিত "আহে বন্দে খোদা, যুবা ছুচ্চা কারো" ইত্যাদি দুর্ব্বোধ উর্দ্দু গান ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন! গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই গ্রন্থে দেখা যায়। একটাত নিয়ম রক্ষা, একটাত গণ্ডী থাকা আবশ্যক। নহিলে, বি[illegible]ত গান আছে সকলেইত এই গ্রন্থের মধ্যে [illegible] জন্য নালিশ উপস্থিত করি[illegible] কথা—আমরা কেন যে [illegible] লোকের রচিত সঙ্গীত [illegible] সহকারে দেখিতে চাই তাহার কা[illegible]। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের [illegible] পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই, মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক খরস্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন

কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, সুতরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়, এ কি আমার নিজের হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখরনিঃসৃত সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে! অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ওরে বংশীবট, অক্ষয় কোথারে তমাল
বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি
কারণ!
ওরে শ্যামকুঞ্জ, রাধা কুঞ্জ, কোথা গিরি
গোবর্দ্ধন!
ওরে বৃন্দাবনের পশু পাখীর রব শুনি না কি
কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা' যদি না হইত, আজ যদি সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাইতাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দেরে নিতাই ধন॥

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন।

—কালীকচ্ছের কোন পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্ব্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী—সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিম্নে সমস্ত গুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কি? শিখিলে উপকার কি?

২। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়।

৩। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।

৪। স্ত্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।

৫। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্ম্মণ্যা হয়।

৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরী করিবে না জমীদারী মহাজনী করিবে?

৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কি ক্ষতি আছে।

৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না,—পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা—গ্রন্থকারের নাম নাই

গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তক খানি ইংরাজি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজ কাল "A Higher English Grammar, by Bain," "Studies in English" by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Bannrajee, প্রভৃতি যে সকল পুস্তক এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পুস্তক খানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক গুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সুরুচি সঙ্গত জ্ঞান করি। আমাদিগের বিশ্বাস যে পুস্তক খানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

—:০:—

বর্ত্তমান শিক্ষা।

কিসের অন্বেষণে মানুষ অহর্নিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? মানুষ কি চায়? সুখ। সুখ পাইবার জন্যই মানুষ সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমরা লেখাপড়া করি, আমরা ধন উপার্জ্জন করি, আমরা ঈশ্বরারাধনা করি, আমরা যাহা করি তাহার শেষ লক্ষ্য সুখ। এমন কি সংসার ত্যাগ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হইতে যাইতেছেন তিনি যে সুখ তাচ্ছীল্য করিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, সংসারে তিনি সুখ পাইলেন না, নূতন ক্ষেত্রে সুখ অন্বেষণেই বহির্গত হইলেন। এই সুখের জন্যই মানুষের সুখ নাই। সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দিন নাই রাত্র নাই মানুষ হাহা করিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কয়জনের প্রতি সুখ প্রসন্ন! এই প্রাণ পণ আরাধনায় কয় জনের নিকট সুখ দেবী আবির্ভাব হইয়াছেন? এ সংসারে ভক্তের প্রতি বাম কে! কায়মনচিত্তে জড়কে আরাধনা কর তাহাকেও জাগাইতে পারিবে—দেবতার কি কথা।

সংসারের গতিই এমন নহে যে যথার্থ প্রেম যথার্থ ভক্তি উপেক্ষিত হইবে। তবে কি সুখের সম্বন্ধে পৃথিবীর গতি উজান বহিয়া চলিতেছে? নহিলে সুখদেবী ভক্তের প্রতি এতই বিমুখ কেন? না তাহা নহে, আমরা প্রকৃত পথে সুখ খুঁজিতেছি না, আমরা সুখের অন্বেষণে যে পথে চলিতেছি তাহা বিপথ। দূর হইতে সুখ দেবী আমাদের ভ্রম দেখিয়া ব্যথিত পরাণে নিশ্বাস ফেলিতেছেন, ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন তিনিও প্রকৃতির অধীন। বিপা᠁ ভ্রমণকারী ভক্তদিগকে দেখা দি᠁ ᠁ অ᠁, ᠁ বর্ষণ। ᠁ তাহার আর উপায় নাই। সুখের প্রকৃত পথ নীতি। প্রকৃতির অভিমুখী গতির নামই নীতি। প্রকৃতির গতির সঙ্গে সঙ্গে চলিলে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না—আর প্রকৃতির গতির বিমুখে চল, প্রতিপদে তোমার নিশ্চয় পতন পড়িয়া রহিয়াছে। নৈতিক পথ দিয়া চলিলে নিঃসন্দেহ আমরা সুখকে ধরিতে পারিব।

প্রকৃতির বিমুখে চলিতে প্রকৃত পক্ষে কাহারো সাধ্য নাই। মানুষ দুর্ব্বল, প্রকৃতি মহাবল, তাহার বিপক্ষে লড়িয়া কি তুমি জয়ী হইবে? এ সংগ্রামে বল প্রয়োগ মাত্রই তোমার সার। প্রকৃতির বিপক্ষে এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তোমার পতন হইবে এবং পতনের আঘাত মাত্র তোমার সেই চেষ্টার পুরস্কার। যেরূপ বলের সহিত তুমি বিমুখে যাইতে চেষ্টা

করিবে সেইরূপ সবলে প্রকৃতি তোমাকে ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিবে, সেই পরিমাণে তোমার যন্ত্রনা সহিতে হইবে। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যগণ প্রকৃতির এই অদম্য অতি সূক্ষ্ম নিয়ম দেখিয়া মানুষের পূর্ব্ব জন্মের সহিত পর জন্মের কর্ম্ম সূত্রের বন্ধন অনিবার্য্য মনে করিয়া গিয়াছেন।

পুনর্জ্জন্ম থাক আর নাই থাক, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে বর্ত্তাক্ আর নাই বর্ত্তাক, কর্ম্মফল যে অখণ্ডনীয় তাহা আমরা এই জীবনেই প্রতিপদে দেখিতে পাইতেছি। প্রকৃতির পথ লঙ্ঘন করিতে গেলে প্রকৃতি তোমাকে ক্ষমা [illegible] না—প্রকৃতি বড় [illegible] যাইবামাত্র কঠিন [illegible] প্রতিপদে তোমায় জোর [illegible] ধরিয়া সোজাপথে ফিরাইতে চেষ্টা করিবে, আর প্রকৃতির অভিমুখে চল—সুখে চলিয়া যাইতে পারিবে। এ কথা সকলেই জানে—ইহা একটি অতি সামান্য সত্য, ইহা কাহাকেও বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই। অথচ সেই জন্যই বুঝি ইহা সকলে এত ভুলিয়া যায়,এই সামান্য সত্যকে মনে করিয়া কাজ করা লোকে আবশ্যকই মনে করে না,—যেন ইহা আপনা হইতেই সাধিত হইবে। দেশের উন্নতির দিকে অর্থাৎ দেশের লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনের দিকে সকলেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে। বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার প্রতি লোকের মনোযোগ পড়িতেছে—অথচ দেশে যাহাতে এই সকল শিক্ষার প্রকৃত ফল জন্মিতে পারে—তাহার জন্য যে বিশেষ যত্ন হইতেছে এরূপ দেখা যায় না। বালক বালিকার নীতিশিক্ষা যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে সকলে যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিতেছেন না। মানুষ বিদ্যা বুদ্ধিতে সম্যক যশস্বী হইলেও যতক্ষণ তিনি নীতিসম্পন্ন না হয়েন—ততক্ষণ তিনি যথার্থ পক্ষে মানুষের পদবীতে উঠেন না, সমাজের আদর্শ হইয়া, সমাজের যথার্থ উপকার সাধন করিতে পারেন না। মানুষ হইতে গেলে এক দিকে বুদ্ধির মার্জ্জনা যেমন আবশ্যক, আর এক দিকে নীতির অনুবর্ত্তী হওয়া, তাহা হইতে যদি অধিকত না হয় ত সমান আবশ্যক; নীতিই মনুষ্য হৃদয়ে মনুষ্যত্ব স্থাপন করে, নীতিই মানুষকে সংসারের দুরূহ পথ দিয়াও সহজে গম্যদিকে লইয়া যায়। যদি বাঙ্গালী জাতিকে মানুষ করিতে হয় তবে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদিগকে প্রকৃতরূপে নীতি শিক্ষা দেওয়া অতি বিশেষ আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে যে শিক্ষা দাও সেই শিক্ষা মনে অতি দৃঢ় হইয়া বসে, বালক বালিকাদের কোমলমন যেরূপ ছাঁচে ঢাল—সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। বাল্যকাল হইতে যতদিন পর্য্যন্ত আজকাল বিদ্যাশিক্ষা চলে, সেই সমস্ত সময় যদি বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা দ্বারা মনোরাজ্যে বিবেক শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তি সাধন করা যায়—তবে পরে সে

ভাব কখনোই হৃদয় হইতে সহজে চলিয়া যাইবার নয়।

পুরাতন আর্য্যগণ নীতিই সভ্যতার মূল বলিয়া জানিতেন। তখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া সকলেরই যে শিক্ষাতে সময় অতিবাহিত করিতে হইত—সে শিক্ষা কেবল বিদ্যা শিক্ষা নহে। আর্য্যদিগের বিদ্যা, জ্ঞান সমস্তই নীতির সহিত এমন দৃঢ় রূপে জড়িত ছিল যে একটি ছাড়িয়া আর একটি লাভ করা যাইত না। সেই জন্যই আর্য্যগণ অসাধারণ জাতি হইয়াছিলেন।

আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে পূর্ব্ব নামের যোগ্য করিতে যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে এখনকার অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর নূতন সংস্কার অবশ্যই করিতে হইবে। এখন সাধারণতঃ কিরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে? বালকদিগকে স্কুলে দিতে পারিলেই সাধারণতঃ পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন হইল। (আমরা এস্থলে সকল পিতার কথা বলিতেছি না।) তাহার পর মাঝে মাঝে যদি পিতা, পুত্রকে পাঠ্য পুস্তক হইতে একবার পরীক্ষা করিলেন—একবার পড়া বলিয়া দিলেন, পড়া না পারিলে গাড়ী ঘোড়া চড়িতে পারিবে না বলিয়া দুটা উপদেশ দিলেন ত যথেষ্ট। পুত্রের স্বভাব গঠনের দিকে বাল্যকাল হইতে দৃষ্টি রাখা, স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টান্তে উপদেশে পুত্রের যথার্থ সুশিক্ষা বিধান করা—এ কয় জন পিতা করিয়া থাকেন? মাতার নিকটেই বা এরূপ শিক্ষা বালকে কি পায়? মাতা, মাতামহী, পিতামহী প্রভৃতির নিকট হইতে বংশাবলীর গল্প, উপকথা, বিবাহ ইত্যাদি সাংসারিক কথা যাহা শোনে তাহার মধ্যে যদিও বালকদের উপযুক্ত চরিত্র গঠনোপযোগী অনেক উপকরণ থাকে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই গল্পের ছলে মহিলাগণ যে উপদেশের কথা কহেন—সে উপদেশ তাঁহাদের নিকট হইতে দুই পা না সরিতেই বালকেরা ভুলিয়া যায়। বালক হৃদয়েও উপদেশ বদ্ধমূল করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, ইহাতেও প্রচুর নিপুণতা ও অধ্যবসায় চাই।

উপদেশ দাতার জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে তাহার উপদেশ বালক বালিকাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারিবে কেন? কিন্তু এখনকার কয়জন মহিলা সেইরূপ সুশিক্ষিত হইতে পারিয়াছেন যাহাতে সে কথা তাঁহাদের সন্তানগণ অবশ্য পালনীয় বলিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিবে।

প্রকৃত পক্ষে ইহার বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। বালকগণ কিছুদিন স্কুলে পড়িয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করে তাহার আত্মীয় মহিলাদের ভিতর তত্টুকু জ্ঞানেরও অভাব দেখিতে পায়—এবং ক্রমে স্ত্রীলোকদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার যতই তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইতে থাকে ততই তাঁহাদের উপদেশের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। কেবল সাংসারিক বিষয়ে মাত্র স্ত্রীলোকদের কথা শোভনীয় রূপে

তাহাদের এই বিবেচনা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় স্কুলের ও তাহার চারি পাশের জল বায়ু হইতেই উপযোগী উপাদান টানিয়া লইয়া বালকগণ মানুষ হইতে থাকে। প্রকৃত যুবা না হইতে হইতে কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতে খ্যাতনামা ইয়োরপীয় পণ্ডিতদিগের মতগুলি ইহাদিগের কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে। (ইহার মধ্যে মিল,স্পেনসারই এখনকার নব্য সম্প্রদায়ের বিশেষরূপ পূজ্য দেবতা। কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিত বঙ্গসমাজে ফরাসীস্ দার্শনিক কমটি একরূপ একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতাপ এখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—আজকালি মিল, স্পেনসারেরই প্রাদুর্ভাব কাল।) কিন্তু এরূপ অপরিপক্ব বয়সে ওরূপ পণ্ডিতদিগের কথার গভীর মর্ম্ম তলাইয়া বুঝা বড় সহজ নহে। তাহা কণ্ঠস্থ হওয়া মাত্র অনেকের সার হয়, গলাধঃকরণ হইতে পায় না। তাঁহাদের কোন একটি কথার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে তাঁহাদের প্রণীত সমুদয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডুবিয়া তবে তাহা বুঝিতে হয়। এক জন হয়ত তাহার এক পুস্তকে এক বিষয় সম্বন্ধে এক কথা বলিলেন অন্য পুস্তকে সে বিষয়েরি আর এক কথা বলিলেন, এই দুইটি কথা না মিলাইয়া দেখিলে সে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার যথার্থ মত কি তাহা জানিতে পারা গেল না—কিন্তু এরূপ তলাইয়া পড়িতে কয় জন বৃদ্ধ লোক অবকাশ পাইয়া আসিয়াছেন যে যুবা বালকেরা তাহার রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে, তাহা করিতে সমর্থ হইবে? দুই এক খান পুস্তকের মাঝে মাঝে চোখ বুলাইয়া পণ্ডিত মাষ্টার এবং আলাপী বড় লোকের নিকট তাহাদের পুস্তক সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা শুনিয়াই সাধারণতঃ যুবকগণ ইয়োরপীয় পণ্ডিতদিগের মতামত মারিয়া লইয়া থাকেন। এ অবস্থায় যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়া থাকে। সেই পণ্ডিতেরা যাহা বলেন নাই, অনেক সময় তাহা বলিয়াছেন বলিয়া তাহাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয়। হয়ত বা যাহার বিপরীত বলিয়াছেন তাহাই তাহাদের মত বলিয়া গৃহীত হয় এবং তাহাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া সেই মত অবলম্বনে জীবনের গতি নির্ণীত হইয়া থাকে। এইরূপে কেহ নাস্তিক হইয়া নির্ব্বোধ আস্তিকদিগের কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করিয়া থাকেন কেহ বা ইউটিলিটেরিয়ন অর্থাৎ ফলবাদী হইয়া তাহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া সমস্ত নীতির ভিত্তি উলটাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন।

দুষ্কর্ম্মের জন্যই দুষ্কর্ম্মকে তাঁহারা ঘৃনা করেন না—তাঁহাদের কাছে দুষ্কর্ম্মের অন্যরূপ আদর্শ হইয়া পড়ে, এবং ইহাতে ক্রমে ভারতবর্ষীয় জাতিগত নৈতিক বাঁধুনি তাঁহাদের হৃদয় হইতে শিথীল মূল হইতে থাকে। যুবা বয়সে যখন মনের স্ফূর্ত্তি, উদ্যম, উৎসাহ সতেজ থাকে, তখন মানুষ তাহার জীবনের প্রকৃত পথে চলিতে পারিলে কেবল আপনার কাজ নয় দেশেরও যথার্থ কাজ করিতে পারে। কিন্তু সেই যুবা বয়সে যদি মন বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তাহা হইলে

সেই যৌবন সুলভ উদ্যমের আশানুরূপ ফল কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে যখন বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, নানা প্রকারে বহুদর্শীতা লাভ হইয়া মনের সুস্থ অবস্থা ফিরিয়া আসে, তখন নিজের পূর্ব্বকৃত ভ্রম নিজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তখন সময় চলিয়া গিয়াছে—আর সে উদ্যম নাই, আর সে উৎসাহ নাই, চারিদিকের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নূতন জ্ঞান অনুসারে কাঁচিয়া নূতন ক্ষেত্রে কাজ করিতে তখন আর পারিয়া উঠা যায় না, হয়ত বা পারিলেও তখন আর অবসর পাওয়া যায় না—হয়ত বা অবসর পাইলেও তাহাতে তেমন কাজ হয় না।

নব্য সম্প্রদায়দিগের এই মানসিক বিকার অবস্থা দেখিয়া অনেকে দুঃখ করেন—অথচ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করেন না। তাঁহাদিগের ইহাতে দোষী করিয়া থাকেন অথচ দোষের মূল উৎপাটন করেন না। বাস্তবিক পক্ষে দোষ তাঁহাদের নহে, দোষশিক্ষার। মানুষ অবস্থার দাস, বালককাল হইতে সমাজ বালকদিগকে যে অবস্থায় ফেলিয়া যে ছাঁচে গঠিত হইতে পাঠাইতেছে সেইরূপই তাহারা হইয়া আসিতেছে, ইহাতে সমাজ আবার কোন বিবেচনায় তাহাদিগকেই দোষী করিতে চায়।

এইত গেল পুরুষদিগের কথা। বঙ্গ মহিলাদিগের অবস্থা ইহা হইতে ভিন্ন। বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে সাধারণতঃ বঙ্গবালারা বিবাহিত হইল, শ্বশুরালয়ে গিয়া গৃহাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, অনেকগুলি পুরাতন ভাল ভাব প্রাচীনা মহিলাদিগের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিল। পতিই রমণীর গতি, পিতা মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, গুরুজন, ইহাঁরা দেবতুল্য, ইত্যাদি রমণী প্রতিপাল্য অবশ্য কর্ত্তব্য কতকগুলি উচ্চ কার্য্যের ভাব তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইল—অল্প বাঙ্গালা যাহা শিখিয়াছে তাহাতে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া এই সকল শিক্ষা আরো মনে দৃঢ় হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু বিপরীত শিক্ষা (পাশ্চাত্য) হইল না যাহাতে তাহাদের এ সকল ভাব মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায়। এইরূপে এক হিসাবে ধরিতে গেলে বিদ্যা শিক্ষা না করিয়াও পুরুষ অপেক্ষা কুলকামিনীগণ যথার্থ কতকটা সুশিক্ষা পাইয়া থাকেন—কিন্তু এইখানে একটি কথা, রীতিমত পাশ্চাত্য শিক্ষা না পাইলেও কালের গতিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ভাব কতকটা যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণে তাহারও ততটা কুফল হইতেছে না, পুরাতন নীতিভাবের আদর্শ তাঁহারা একেবারে হারাইয়া ফেলিতেছেন না। কিন্তু এই নীতি শিক্ষা হইতে যত দূর সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির অনুশীলনা না থাকায় তাহা দেখা যাইতেছে না।

কোমলতা নম্রতা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা দয়া মায়া ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা এই সকল হৃদয়ের গুণ বঙ্গবালার জাতীয় সম্পত্তি। এই

সকল গুণ লইয়াই বঙ্গবালা জন্মগ্রহণ করে। কোন রূপ শিক্ষার (যাহাকে সচরাচর শিক্ষা বলে) আবরণ ইহার উপর নাই। স্বাভাবিক খাঁটি সরল সৌন্দর্য্য যদি দেখিতে চাও ত বঙ্গবালার হৃদয়ে দেখিতে পাইবে। ইহাতে শিক্ষার (কুশিক্ষার) কৃত্রিমতা নাই, সভ্যতার (পাশ্চাত্য) মৌখিকতা নাই। ইহার বাহিরে এক ভিতরে এক নাই। বঙ্গবালার হৃদয়ের অশিক্ষিত সৌন্দর্য্য অতি সরল মধুময়। যাহারা কৃত্রিম চাকচিক্য দেখিয়া মোহিত হন এ সৌন্দর্য্য তাঁহার জন্য নহে, যাঁহারা প্রকৃতির সরল সৌন্দর্য্য চাহেন—ইহার রমণীয়তা তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্গ মহিলাদিগের এই স্বাভাবিক গুণসকল যদি সুশিক্ষার দ্বারা মার্জ্জিত করা যায় তবে ইহাদের সৌন্দর্য্য আরো কত ফুটিয়া উঠিবে—রূপ আরো কত খুলিয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ছাড়া বঙ্গ মহিলাদের সবই কি গুণ দোষ কি কিছুই নাই? আছে। মানব মাত্রেই অসম্পূর্ণ। সুশিক্ষার দ্বারা ইঁহাদের স্বাভাবিক গুণ সকল যেমন ফুটিতেছে না তেমনি দোষ সকলও নির্ম্মূল হইতেছে না। ইঁহাদের দোষ গুলিও শিক্ষার অভাবে তেমনি বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। তবে গুণের তুলনায় দোষের ভাগ ইঁহাদের অল্প। গুরুতর দোষ, ঘৃণা প্রবৃত্তি বঙ্গ বালার স্বভাবে সাধারণতঃ বিরল, বুদ্ধি বিবেচনার অভাবই ইঁহাদের সাধারণ দোষ—বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন নাই বলিয়াই এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গ পরিবারের মধ্যে সচরাচর এইরূপ দোষ দেখা যায়—একজন দাসী আসিয়া বড় বৌকে বলিল "দেখ মা ছোট বৌএর ছেলে আর আমাদের খোকা বাবুতে মারামারি করেছে, আহা ছেলেকে ত এমন মারেনি—ছোট বৌ সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছে—বলব কি মা—ছেলেকে ছাড়িয়ে নেবে তা না—আমি ছাড়িয়ে দিয়ে বল্লুম—যে ছোটগিন্নি দাঁড়িয়ে দেখছ তা ছেলেকে কিছু কি বলতে নেই—তাতে বল্লে কি ছেলেয় ছেলেয় মারামারি করবে তা আমি আর কি বলব" বড়বৌ শুনিয়া পর্য্যন্ত ছোটবৌএর সহিত কথা বন্ধ করিলেন, বাস্তবিক কি হইয়াছে একবার যাচাই করিলেন না, দাসীর কথা কত দূর সত্য মিথ্যা একবার বিবেচনা করিলেন না—হয়ত সেই দিন হইতে ছোটবৌতে তাতে মুখ দেখা দেখি রহিল না—এবং শেষে এই এক ক্ষুদ্র কারণ হইতে হয়ত অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াইল। জ্ঞান বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা যদি বিবেচনা শক্তির স্ফূর্ত্তি লাভ করা যায়—তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারে না। সেই জন্য বলিতেছি অতুলনীয় হৃদয় লাভ করিয়াও বুদ্ধি বিবেচনার চর্চ্চার অভাব হেতু বঙ্গ রমণী এখনো অবোধ অবলা নামের বাচ্য। সুতরাং ইঁহারা স্বামী পুত্র পরিবারকে হৃদয় দিয়া সুখী করিতে পারেন কিন্তু জ্ঞান দিয়া সন্তানদিগের মনের যথার্থ শিক্ষা বিধান করিতে অপারক—বাহিরের হানিজনক আকর্ষণ হইতে নিজ বুদ্ধি বলে সন্তানদিগকে স্বপথে টানিয়া রাখিতে অপারক।

আজ কাল এই অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় অনেকে নিজ নিজ স্ত্রী কন্যাদিগকে শিক্ষিত করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ শিক্ষিত মহিলাদিগের মধ্যে অনেক সময় যেরূপ শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহা যথার্থ শিক্ষা নহে শিক্ষার ভাণ মাত্র। একটু ইংরাজি ভাষা শিখিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিমতা, বাহিরের চাকচিক্য অসার ভাব গ্রহণ করাইত অনেক সময় এ শিক্ষার পরিণাম হইয়া দাঁড়ায়। আর বাস্তবিক পক্ষে যদি ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে সে শিক্ষা শিক্ষা বলা যাইতে পারে না তাহা কুশিক্ষা। এ শিক্ষায় দেশীয় মহিলাদের কোমলতা নম্রতা প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাব গিয়া অনেক সময় কেমন বিদেশীয় খট খটে ভাব আসিয়া স্ত্রীলোকের বিশেষ সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। বঙ্গ রমণীগণ তাঁহাদের সুন্দর হৃদয় বিকৃত শিক্ষার ফলে যে হারাইয়া ফেলিবেন—কৃত্রিম সভ্যতা আসিয়া তাঁহাদের সরল প্রাণ যে কৃত্রিম করিয়া ফেলিবে, ইহা কখনোই বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের দেশের একজন অশিক্ষিত রমণীর (পাশ্চত্য শিক্ষানুরাগীগণ—যাহাকে অশিক্ষিত বলিবেন) সহিত কথা কহিয়া তাঁহার প্রাণ খোলা কথায় বার্ত্তায় প্রাণে কতখানি আহ্লাদ ঢালিয়া দিবে আর সভ্যতার সেই মৌখিক দু এক কথা কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? সেরূপ কথা সেরূপ আলাপ পাশ্চাত্য সভ্য সমাজেই আদরণীয়, পাশ্চাত্য সমাজেরই উপযোগী—কেন না সেখানে স্ত্রীপুরুষে মিশিতে হয়। এখানে স্ত্রীপুরুষে মিশিবার স্থলে হয়ত সেইরূপ সভ্যতার আলাপ আবশ্যক হইয়া পড়িবে—কিন্তু স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ওরূপ ভাব এখনো আমাদের কাছে বড়ই কেমন কেমন ঠেকে।

একজন বাঙ্গালীর মেয়ের আর একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর মেয়ের সহিত দেখা হউক সে তাহার সহিত বহুদিনের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিবে—সে তাহাকে ভগিনী ভাবিয়া কথা বার্ত্তা কহিবে, তাহার সহিত খোলা প্রাণে খোলা ভাবে গল্প করিবে, তাহার দুঃখ সুখ বাস্তবিকই তাহার হৃদয় স্পর্শ করিবে—সে তাহাকে আপনার করিয়া লইবে। বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালির মেয়েকে পর ভাবিতে জানেনা, ভগিনী ভাব তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত—এ ভাব তাহাদের শিক্ষা দিতে হয় না। এই ভাবের আধিক্য হেতু এবং বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাব চালিত না হওয়ায়, অনেক সময় বরঞ্চ হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। বড় ভয় হয় পাছে শিক্ষায় ইঁহারা প্রাণের এই সরলতা টুকু হারাইয়া ফেলেন, আর তেমন উদার ভাবে অন্য ভগিনীদের আলিঙ্গন করিতে না পারেন, শিক্ষায় তাঁহাদের প্রাণ পাছে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। আর যদি শিক্ষার ইহাই ফল হয় তবে সে শিক্ষা হইতে অশিক্ষাই ভাল।

যে শিক্ষায় গুণ সকল ফুটিয়া উঠিবে, দোষ নির্মূল হইয়া যাইবে, প্রাণকে উদার করিবে, হৃদয়কে মহান করিবে—তাহাই যথার্থ শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষা হইলে আপ-

নার ক্ষুদ্রত্ব প্রতিপদে বুঝা যায়, আর অল্প শিক্ষাতেই হৃদয় গর্ব্বিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে অহঙ্কার হৃদয়ে থাকিতে পারে না—জ্ঞান দেখাইয়া দেয়—দেখ তুমি কিছুই জান না, কিছুই বোঝ না, কেন না যাহা জান তাহা কি সামান্য, যাহা জান না তাহা অসীম। আমাদের দেশের বহু শাস্ত্র বিশারদ একজন মাননীয় পণ্ডিত সেদিন একজন বালককে বলিয়াছিলেন—আমি তোমার চেয়ে জ্ঞানী কিসে? দুচার খানা বেশী বই পড়িয়াছি বলিয়াই কি আমি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হইলাম?

একথা কত মহান শিক্ষার ফল—কত উদার হৃদয়ের কথা? যথার্থ জ্ঞানী লোকেই ইহা বুঝিতে পারেন ইহা বলিতে পারেন।

অগভীর অল্প শিক্ষার অপকারিতা স্ত্রী পুরুষ উভয়েতেই বর্ত্তায়। তবে পুরুষগণের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ, নানা লোকের সহিত মিশিয়া কথা কহিয়া ঠেকিয়া তাঁহাদের প্রথম শিক্ষার কুফল কালে অনেক ঘুচিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মন একে কোমল যাহা তাহাদের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহাই মনে বিশেষ করিয়া আঁটিয়া বসে তাহার পর তেমন অবস্থাতে পড়িতে হয় না যাহাতে পরে সেই শিক্ষার দোষ বুঝিয়া নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। যদি সুন্দরীগণ গর্ব্বিত হইয়া না উঠেন—ত আরো একটি কথা এই যে, যে দ্রব্য যত অধিক সুন্দর তাহাতে অল্প মাত্র কলঙ্কই অধিক অশোভনীয়। সুতরাং পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে দোষহীন দেখিতে সকলেরই বেশী ইচ্ছা হয়। এই জন্য যদি মহিলাদের শিক্ষা দিতে হয় ত যথার্থ এমন সুশিক্ষা দাও যাহাতে হৃদয়ের গুণের সহিত জ্ঞান বুদ্ধি সকলেরই মার্জ্জনা হইতে পারে। নহিলে কুশিক্ষার ফলে ইঁহারা দুনিয়ার বার হইতে পারেন। যে উৎকৃষ্ট হৃদয়ের জন্য তাঁহারা সকলের ভক্তিভাজন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে সে হৃদয় হারাইবার সম্ভাবনা—আর ওরূপ শিক্ষায় জ্ঞান বুদ্ধির যে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইবে সে আশাও নাই। এ অবস্থায় না হৃদয় দিয়া—না বুদ্ধি বিবেচনায় তাঁহারা পরিবারের ও নিজের উপকারে আসিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার প্রতি দেশের যে একেবারে লক্ষ্য দেখা যায় না তাহা নহে। এক্ষণ মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা দেশের কম সৌভাগ্যের কম গৌরবের বিষয় নহে। অতি অল্প দিনমাত্র সুসভ্য ইয়োরপীয় মহিলাগণ এই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হইয়াছেন।

কিন্তু এই আহ্লাদে মত্ত হইয়া আমরা যেন ইহার আর একদিক দেখিতে না ভুলি। ইহা উচ্চ শিক্ষা হইলেও ইহাকে যে সম্পূর্ণ সুশিক্ষা বলাযায় না তাহা আগেই বলা হইয়াছে। পুরুষ দিগের শিক্ষা প্রণালী ও ইহাঁদের শিক্ষা প্রণালী একই, সুতরাং সে শিক্ষার যে অভা[illegible] রহিয়াছে [illegible]তেও সেই অভাব রহিয়াছে। সেই জ[illegible] সম্পূর্ণ শিক্ষার গুণে যুবাদের মনে [illegible]। [illegible]

অবস্থা ঘটে—যুবতীদেরও তাহা ঘটিতে পারে। আর তাহা হইলে কত অধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা ভাবিয়া দেখিলে নীতি শিক্ষার বিশেষ উপায় করা যে কত প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিব।

যদি আমাদের ভবিষ্যৎ বংশকে মানুষ করিতে হয়—তবে বালক বালিকাদিগের শিক্ষারদিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহারা এখন বালক বালিকা তাহারাই ভাবীবংশের পিতা মাতা।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া বালক বালিকাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এক সঙ্গে যখন ফুটিয়া উঠিবে, আমাদের বংশ এক সঙ্গে যখন বুদ্ধিশীল ও নীতিশীল হইতে পারিবে—তখনই দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে—ভারতবর্ষ প্রকৃত সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবে।

—:০:—

জনষ্টুয়ার্টমিল।

মিল পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে একজন সৎকুলোদ্ভবা, রূপলাবণ্যসম্পন্না ত্রয়োবিংশবর্ষীয়া মহীয়সী গুণবতী রমণীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। এই বন্ধুত্বই ইহাঁর জীবনের ও হৃদয়ের উন্নতির মূলীভূত কারণ স্বরূপ হ[illegible]াছিল। এই [illegible]অসীমগুণ সম্পন্না রমণী মিষ্ট[illegible]র টেলরের ভার্য্যা ছিলেন। যিনিই এই রমণ[illegible]াকে দেখিতেন, তিনিই ইহাঁর বুদ্ধি বৃত্তির [illegible] প্রাচুর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতেন ও ইহাঁর মধু[illegible]র আলাপে প্রীতি লাভ করিতেন। ইহাঁর [illegible] স্বামী মিষ্টর টেলর একজন উদার স্বভা[illegible]ব বিশিষ্ট, মাননীয় ও সৎপ্রকৃতিপ[illegible] লোক ছিলেন, ও নিজ সহধর্ম্মিণ[illegible]াকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ইহাঁর প[illegible] f [illegible] স্ত্রীও ইহাঁর প্র[illegible]থেষ্ট অনুরাগিণী ছিলেন। মিল এই বালিকার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অবধি ইহাঁর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, ইহাঁর সম্পর্কে মিলের দু[illegible]একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম।

"Her fiery and tender soul and her vigorous eloquence would certainly have made her a great orator, and her profound knowledge of human [illegible]ature and discernment and saga[illegible]ty in practical life, would, in the time when such a career was open *to* women, have made her eminent among the rulers of mankind. &."

মিল বলিতেছেন যতদিন এই রমণী স্বামীর অধীনে ছিলেন, ততদিন ইনি ইহাঁর প্রখর ও উদার ধীশক্তির সম্যকরূপ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই, কারণ, যদি তাঁহার স্বামী উদার প্রকৃতির লোক ছিলে

অত্রাচ বিদ্যার উন্নতি ও রচনা বিষয়ে যে রূপ উৎসাহ দেওয়া উচিত ছিল, সেরূপ উৎসাহ ও স্বাধীনতা দেন নাই। মিল কর্ত্তৃক এই রমণীর ধীশক্তির ক্ষমতা সম্যক রূপে অনুভূত হইয়াছিল, এবং পরস্পরে সততই অবকাশক্রমে আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির চালনাদ্বারা উভয়েই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই মহতী বালিকার হৃদয় কোন প্রকার কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না, ইহাঁর হৃদয় স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতাগুণে সততই অলঙ্কৃত, ও ইহাঁর হৃদয়ের ঔদার্য্য সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সমভাবে প্রকাশ পাইত।

উপরি উক্ত গুণসম্পন্না রমণীর সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিল যে কত সু· ·ী ও উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল ·, মিল বলিতেছেন, "What I owe, even intellectually, to her, is in its detail, almost infinite." সে যাহা হউক এখন আমরা মিলের কার্য্য বিষয়ে মনো·যোগী হইব, পশ্চাৎ ইঁহার বিবাহ সম্বন্ধে যথা সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি "Considerations on Representative Government," "Essays on unsettled Questions in political Economy," "Papers on corporation and church property and the currency Juggle," "Thoughts on poetry," "Analysis of Platonic Dialogues" ·মক এই কয়টি ও অপরাপর বহুসংখ্যক ·া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিল "টকেভিলের "Democracy in America" নামক গ্রন্থখানি পাঠ ও তাহার একটি উপযুক্ত সমালোচনা করেন।

কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাঁহার পিতার "Fragment on Mackintosh" নামক পুস্তকখানি বাহির হয়, মিল গ্রন্থখানির কিয়দংশের যথেষ্ট প্রশংসা করেন বটে কিন্তু সমস্ত পুস্তকখানি তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই, মিল বলিতেছেন "Although I greatly admired some parts of it, I read as a whole with more pain than pleasure"। মিল এই সময়ে "Civilisation" নামক একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহার পিতা এই প্রবন্ধটি পাঠে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন ও ·পত্রকে যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করেন। কিন্ত · হায় মিলকে আর অধিকদিবস পিতার সহিত অ· ·লাপ করিতে হয় নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ·ে·্সমিলের ·াস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয় ও ১৮৩৬ খৃষ্ট ·াব্দের জুনমাসে তেইশে তারিখে এই মহাত্ম ·া মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার সেই উদার ধীশক্তির কিছু মাত্র · হ্রাস হয় নাই। তিনি আপনাকে জগতের উ· ·কারক জ্ঞান করিয়া পূর্ণ শান্তিতে অনন্ত নি· ·্রায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার আক্ষেপ এই যে আরে · কিছু কাল জীবিত থাকিলে জগতের অ·ি ·কতর উপকার সাধনে স· ·ইতেন, তাহা আ· ·· পারিলেন না।

এতদিন পরে মিলের প্রাণে একটি ·ক-

তর আঘাত লাগিল, আজ তিনি এই পৃথিবী হইতে তাঁহার একমাত্র বন্ধুকে হারাইলেন, স্বার্থভরা, হিংসক মানববেষ্টিত এই পৃথিবী খণ্ডে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে আর্ কেহই রহিল না, এখন তিনি এই সুদীর্ঘ জীবনপথ অতিক্রম করিতে একেলাই রহিলেন, এজগতে যাঁহাকে হারাইলেন আর্ তাঁহাকে কোথাও পাইবেন না।

এই সময়ে মিল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ইটালি যাত্রা করিলেন, পরে ইহাঁর একত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুনর্ব্বার তিনি তাঁহার "লজিক" নামক গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করেন ও অবকাশ ক্রমে তৎকালীন বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়েই তিনি ফরাশিশ দার্শনিক "কম্টির" "কুর্ ডে ফিলসফি পসিটিভ্" নামক গ্রন্থখানি বিশেষ যত্ন সহকারে পাঠ করেন। এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ অংশ যদিও তাঁহার মতের সহিত ঐক্য হয় নাই, তথাচ ইহা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন, ও গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। এখন হইতে তিনি "কম্টির" অতিশয় ভক্ত হইলেন ও তাঁহার সহিত পত্রাদি লেখা আরম্ভ করিলেন। যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদিগের পরস্পরের মতের বিশেষ অনৈক্য উপস্থিত হয় সে পর্য্যন্ত এইরূপ পত্রলেখালেখি চলে, তৎপরে আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়, মিল [illegible]ছেন "I was the first to slacken correspondence; he was the first to drop it" এই সময়েই তিনি "কারলাইলের" ফরাশিশ বিদ্রোহ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির সমালোচনা করেন ও কোলরিজের রচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মিল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "লজিক" গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড সমাধা করেন, ও ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের "এপ্রিল" মাস হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত "লজিক" খানির আদ্যোপান্ত যথোপযুক্ত শোধন ও পরিবর্ত্তন করেন। এই ধারা অবলম্বনে মিল গ্রন্থরচনা করিতেন। কোন একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইলে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিবেন তাহা ভাবিয়া লইতেন ও তৎপরে সেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিতেন। দ্বিতীয়বার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া যে কথাটি যেখানে বসানো উচিত ছিল সে কথাটি সেইখানে বসাইতেন, কতকগুলি কথা বা উঠাইয়া দিতেন ও তৎপরিবর্ত্তে আর কতকগুলি পরিষ্কাররূপে ভাবব্যক্ত কারী কথা সন্নিবেশিত করিতেন, এইরূপে একটি প্রবন্ধ লইয়া অনেকবার না দেখিয়া সহসাই মুদ্রিত করিতে দিতেন না, ইহা দ্বারা রচনা সম্পর্কে ইহাঁর যথেষ্টই উপকার হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষে "লজিক" নামক গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে সমাধা করিয়া মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত "মিষ্টর জন মরেকে" পাঠাইয়া দেন, "মরে" পুস্তকখানি মুদ্রিত না করিয়া কিছু দিন পরে মিলের নিকট ফিরাইয়া পাঠাইলেন, ইহাতে মিল কিছুমাত্র দুঃখিত হয়েন নাই, পরে তিনি মিষ্টর "পার্কারের" নিকট পুস্তকখানি পাঠাইলেন, ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ খানি প্রকাশ করেন।

কিয়দ্দিবস গত হইলে মিল গুটিকতক বিশেষ পরিচিত, বিদ্বান, ও বুদ্ধিমান মিত্রকে লইয়া একটি ছোটখাট সমিতি স্থাপনা করিলেন, ইহা দ্বারা সকলেই বিশেষ উপ-কৃত হয়।

এক্ষণে মিলের জীবনের তৃতীয় অঙ্ক আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, প্রথম অঙ্কে আমরা মিলকে পিতার অধীনে অতি-শয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে শাস্ত্র অধ্যয়নে সতত নিবিষ্টমনা দেখিয়া আসিয়াছি, সে সময়ে পিতাই তাঁহার বন্ধ, হিতকারী, ও শৈশবজীবনের একমাত্র উন্নতিকর্ত্তা ছিলেন, তৎপরে আমাদিগের সম্মুখে আর এক অঙ্ক উদ্ঘাটিত হয়, যখন মিসেস টেলরের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, এবং তাঁ-হার উদার বুদ্ধিবৃত্তির জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে "লজিক" গ্রন্থে বিভাসিত হয়, অবশেষে তাঁহার প্রধান মিত্র, শিক্ষক ও গুরুদেব পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সে যাহা হউক এখন আমরা বর্ত্তমান সময়ের কথা বলিতে আরম্ভ করি এই সময়ে মিসেস টেলর আপনার শিশুকন্যাটিকে লইয়া একেলা গ্রামে বাস করিতেন, কখন কখন স্বামীসন্নিধানে নগর বাসও হইত, যেখানেই বাস হউক না কেন, মিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও উভয়ে মিলিয়া শাস্ত্রা-লোচনা দ্বারা বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেন, মিলের হৃদয়ের ধ্রুবতারা স্বরূপিনী, আনন্দ-দায়িনী, প্রিয়বন্ধু মিসেস টেলর মিলের সহিত বিজন ভ্রমণে বা আলাপনে কখনও কুণ্ঠিতা হয়েন নাই, কারণ এই বুদ্ধিমতী নারী পবিত্রহৃদয়াবশিষ্টা ছিলেন এবং মিলও তদনুযায়ী তেজস্বী ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। এমন কি ইঁহাদিগের চরিত্র বিষয়ে পরদোষানুসন্ধায়ী কূটবুদ্ধি কাপুরুষ মনুষ্যদিগেরও মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।

আজন্মকাল হইতে উভয়ের হৃদয়ই যেন জগতের উপকার সাধন ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিল, মিল জগতে একেলা যাহা করিতেন, এখন তাঁহার এমন একটি বন্ধু হওয়াতে, তিনি দ্বিগুণতর কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পৃথিবীতে নিঃস্বার্থপর বন্ধু পাওয়া বড়ই কঠিন, প্রথ-মতঃ সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সচ-রাচর জন্মগ্রহণ করেন না, যদিও আমরা কখন কখন এমন সহৃদয় দুএকটী লোক দেখিতেও পাই, কিন্তু হায় তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে এজগৎ তাহাদের উপযুক্ত বাস-স্থান নহে, ও শীঘ্রই এ স্থান হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বন্ধুভ্রমে বিষ-কুম্ভ পয়োমুখী ছদ্মবেশী নীচাশয়দিগের মিত্রতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের মনের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা দর্শনে আমা-দিগের হৃদয়ে অনুতাপের ও ঘৃণার উদয় হয়, ও জগৎ সংসার হইতে মন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। মিল যে একজন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ বন্ধু লাভ করা বহু তপস্যার ফল। মিলের পিতা শৈশব কালে মিলের হৃদয়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আজ মিসেস টেলর সেই স্থান অধিকার করিয়া

আছেন, ও বিশুদ্ধ জ্যোতি দ্বারা মিলের পবিত্র হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত এই কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকালের মধ্যে মিল তাঁহার বিখ্যাত "political Economy" নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানিতে মিলের একেলার অধিকার ছিল না, কারণ মিসেস টেলর এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করেন, বলিতে গেলে মিলের অধিকাংশ লেখাই এই দুজনকার প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির একীভূত সমষ্টি। এই গ্রন্থখানি প্রকাশের পর বহুদিবসাবধি যদিও তিনি এবম্প্রকার কোন বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই তথাচ তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লেখেন ও সংবাদপত্র সমূহের তদীয় রচনাগুলি একত্রিত করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয় সে বিষয় আর সন্দেহ নাই।

মিল একালই সমাজস্থিত সমস্ত ব্যক্তির মানসিক গতির পরিবর্ত্তন করিতে যত্নবান হয়েন, এবং ইহাও নিশ্চিৎ, তৎকালীন অনেকানেক সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মনের উপর তিনি নিজ রাজ্য স্থাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন অনেকেই পুরাতন ধর্ম্মোপদেশ বা পুরাতন মত সমূহকে অন্ধ হইয়া পূজা করিতেন না, বিশেষ বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ মত সকলের সারত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। ৮৪৯১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিষ্টর টেলরের মৃত্যু হয়, এই মৃত্যুতে তাঁহার ভার্য্যা অত্যন্তকাতর হইয়া পড়িলেন, মিলও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি প্রাণপণে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবান হইলেন। জগতের খেলা কে বুঝিতে পারে, কিছুদিন পরে মিশেষ টেলরের শোক কিছু শমিত হইলে মিল তাঁহার হস্ত-প্রার্থনা করিলেন। সচরাচর প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় এপর্য্যন্ত সেরূপ ভালবাসা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, তিনি স্বপ্নেও কখনো মুহূর্ত্তের জন্য এরূপ আশা, এরূপ বাসনাকে মনে ঠাঁই দেন নাই, এরূপ প্রণয়ের ভাব অতিদূর কল্পনাতেও মনে আনিয়া তাঁহার বিশুদ্ধ বন্ধুত্বভাব কলঙ্কিত করেন নাই—কেবল মাত্র একটি উদার বন্ধুত্বভাবে তাঁহার হৃদয় এতদিন পূর্ণ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই জন্য ঘোর নীচমনা ব্যক্তিও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কখনো কানাকানি পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। এত দিন পরে সেই বন্ধুতা প্রেমের আকার ধারণ করিল। তাঁহার যৌবনের সখীর সহিত চির জীবন একত্রে কাটাইবার একটি ইচ্ছা প্রাণের মধ্যে আসিয়া পড়িল। বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সুখে সুখী হইয়া সেই যৌবনের চির সঙ্গিনীর সহিত এখন মিল বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন, ও স্ত্রী সুখে সুখী হইয়া বিমল আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটী সুখের নব-রাজ্য উদ্ঘাটিত হইল, আপনি যাহা লিখিতেন স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহার অদ্বিতীয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীও নিজ মতগুলি স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিতেন ও

মিল সেই গুলিকে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া সুখী হইতেন। মিল বলিতেন পুস্তকখানি যিনিই লিখুন না কেন, গ্রন্থস্থিত মত সমূহের যিনি অধিকারী গ্রন্থখানি তাঁহারই বলিতে হইবে। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মিলের অনেকগুলি গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর সমান অধিকার আছে। মিলের হৃদয়ে এতদিন যে সমস্ত ভাব ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, এই সময় হইতে তাঁহার পত্নী দ্বারা সেই সব ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। দুইটি হৃদয় এক হইয়া একই ব্রত সমাধা করিতে কৃতযত্ন ও সক্ষম হইয়াছিল। এরূপ সুখ সচরাচর সকলের ভাগ্যে ঘটে না, মিল যেরূপ স্বামী তিনি তদনুরূপই পত্নী পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিককাল বিবাহ সুখে সুখী হইতে হয় নাই, সবে মাত্র সার্দ্ধ-সাতবৎসর কাল বিবাহের পরেই তাঁহার প্রিয়তমা অসীম গুণবতী ভার্য্যার মৃত্যু হয়। মিল অতিশয় কাতর হইয়াই বলিয়াছেন, "For Seven and a half years that blessing was Mine, for seven and a half only! I can say nothing which could describe even in the faintest manner, what that loss was and is. Her memory is to me a religion, and her approbation the standard by which, summing up as it does all worthiness, I endeavour to regulate my life."

এ কথাগুলি আমরা কতবারই পড়িয়াছি, তথাচ এখনও যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি "For seven and a half years that blessing was mine, for seven and a half only!' জীবনের মধ্যে মিলের হৃদয়ে দুইবার আঘাত লাগিল, প্রথম পিতৃবিয়োগে, দ্বিতীয় প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে। এখন তিনি যাহা লিখিতেন তাহা নিজেই পড়িতেন ও নিজেই সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিতেন, কেহ নাই যে সে গুলিকে স্নেহের চক্ষে দেখে, প্রাণের সহিত মমতা করে।

শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে দমন করিতে মিলের মত অদ্বিতীয় লোক আর দেখা যায় না, ইনিই পুরাতন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মত সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, চিরকালই ইঁহাকে খৃষ্টীয় মুক্তিদাতাগণ কৃতান্তের ন্যায় ভয় করিয়া থাকেন। মিলের বিবাহ হইতে স্ত্রীর মৃত্যু পর্য্যন্ত একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়া হাউসেরকরেস্পণ্ডেন্স" বিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মিল পনের বৎসর বয়ঃক্রম কালে উক্ত কোম্পানীর অধীনে একটি কেরাণিগিরি কর্ম্ম পান, এখন তিনি সেই কর্ম্ম স্থলেই সর্ব্বোচ্চ আসন গ্রহণে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক কাল এ কর্ম্ম করিতে হয় নাই, কারণ উক্ত কোম্পানি দুই বৎসরের মধ্যেই উঠিয়া যায় ও রাণী "ভিক্টোরিয়া" স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মিল ও তাঁহার পত্নী উভয়ে মিলিয়া বিখ্যাত "লিবার্টি" নামক

গ্রন্থখানি রচনা করেন, এই গ্রন্থখানি তুজনেই উপর্য্যুপরি পাঠ ও যথোপযুক্ত সংশোধনাদি করেন, অবশেষে তাঁহাদিগের মনে এই আশা ছিল যে যখন তাঁহারা ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিতি করিবেন তৎকালে আরেকবার এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিবেন, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার স্ত্রীর বিয়োগের সহিত সে আশারও অবসান হইয়াছিল। মিল বলেন যে তিনি ভারতবর্ষের হিতকামনায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থায়িত্ব বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। উক্ত কোম্পানি উঠিয়া যাইলে পর লর্ড ষ্টান্লে ভারতবর্ষীয় সভার আসন গ্রহণে তাঁহাকে অনুরোধ করাতে তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি 'Thoughts on Parliamentary Reform" নামক একখানি ক্ষুদ্রাবয়ব গ্রন্থ প্রকাশ করেন, ইঁহার স্ত্রী পূর্ব্বে একবার এ গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

বিজন চিন্তা।

ওই হোথা আকাশের অনন্ত সীমায়
প্রাণ মোর দেহ ছেড়ে বিরাম লভিতে চায়,
জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায়!

২

জগৎ আমার নয়, আমি জগতের নয়,
জগতের কোন কথা পশেনা শ্রবণে;
জগতের হাহাকার, জগতের ব্যভিচার,
চিরকাল এ জগতে থাক্ সংগোপনে।

৩

জীবনের নাহি মূল, সব হ'য়ে গেছে ভুল,
এ জগতে কেহ কারো নহেরে আপন;
প্রেম-মোহে ভুলে ভুলে, চলিয়াছ কুতূহলে,
জাননারে একদিন ভাঙিবে স্বপন!

৪

এসেছি দুদিন তরে, আবার দুদিন পরে,
জীবনের সব কথা হবে অবসান;
কেন এত হাহাকার, আসিতেছে অনিবার,
পারিনা সহিতে আর কাতর পরাণ!

৫

ওই আকাশের কোলে যেথায় তারাটি দোলে,
ওই খানে প্রাণ মোর প্রতিদিন যায়!
জগতের কোলাহল বহেনাক অবিরল,
কি প্রশান্ত চারিধার কি মধুর বহে বায়!

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সন্ন্যাসীর জীবন।

কনক নেপালি ভাষায় সংগীত আরম্ভ করিলেন, "আমার গুফামে নিরঞ্জন যোগী বনমে বালা কাঁহা ঢুঁরো হাঁ হাঁহা জী।" ক্রমান্বয়ে ৩৪ টী ভক্তিরস যুক্ত মোক্ষ তত্ব-বিষয়ক গান গাহিলেন। আমি ঐ সংগীতের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে না পারায় তিনি আমাকে সরল হিন্দি ভাষাতে উহার অর্থ অতি উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি লিখিতেছি। "আমার দুই ভ্রুর মধ্য স্থলে গহ্বর দেশে যে নিরঞ্জন পর ব্রহ্ম সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া প্রজ্জলিত দীপ শিখার ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ করিতেছেন, হে মূঢ় মন তুমি ভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বশরীরে তাঁহাকে দৃষ্টি না করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় তিনি কোথায় তিনি কোথায় বলিয়া ভ্রমণ করিতেছ। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিলে ও গঙ্গাদি স্নান করিলে তাঁহাকে পাইবে না, দেহরূপ ঘটেই গঙ্গা, দেহরূপ ঘটেই যমুনা, দেহরূপ ঘটেই কাশী, প্রয়াগ। ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে অতি সূক্ষ্মতর সুষুম্না নাড়ী আছে তাহাতেই সমুদায় তীর্থ অবস্থিতি করিতেছে, ইহা জানিয়া তীর্থ যাত্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে স্থির চিত্তে বসিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হও। এই পঞ্চ ভৌতিক অনিত্য দেহ নিশ্চয় পঞ্চভূতে মিলিয়া যাইবে, কামক্রোধ আদি রিপু সকল দেহের সহিত বিলীন হইবে, বন্ধু বান্ধবেরা স্পন্দহীন শরীর দৃষ্টে বিলাপ করিয়া অবশেষে মৃত্তিকাতে প্রোথিত কিম্বা অগ্নিতে ভস্মীভুত করিবে। হে ভ্রান্ত চিত্ত-মল মূত্র যুক্ত দেহ ভাণ্ডকে নশ্বর জানিয়া ধন জন যৌবনাদির গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, অহিংসা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি যাবতীয় গুণ যুক্তহইয়া বিশ্বপতি মহেশ্বরকে আত্মস্থ কর। সুখ দুঃখ মানাপমান নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি সমভাবজ্ঞান করিয়া ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। হে মন তোমাকে বিশেষ মিনতি করিতেছি তুমি পদ্ম পত্রের জলের ন্যায় চঞ্চল না হইয়া মন্দরের ন্যায় স্থির হইয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মনামামৃত সুধাপান কর, পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইও না।" এই সকল বাক্যে তিনি সংগীতের অর্থ শেষ করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি "কি নিমিত্ত ঐ সকল উচ্চ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইয়াছ?" তিনি আমার বাক্যের উত্তরে বলিলেন "যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ তত্ব জ্ঞান [illegible] তাবৎকাল চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাস্নান ও তীর্থ দর্শন ও মূর্ত্তি পূজাদি করিবার বিধি আছে। বলিয়া

উহাতে চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই, তত্রাচ অন্তঃকরণ বিধুয় না করিতে পারিলে কোন কার্য্যই ফলবতী হয় না। বিশেষ ঐ সকল কর্ম্মে স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তির কথাও কোন কোন শাস্ত্রে আছে, যদি ঐ সকল মিথ্যাও হয় তাহা হইলে ভ্রমণ ও সৎসঙ্গ জনিত যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয়ই উপার্জ্জিত হয়। একথও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন রাশি রাশি তৃণকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি নিখিল কর্ম্ম রাশিকে ভস্মীভূত করে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। তত্রাচ চঞ্চল চিত্ত বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত নানাবিষয়ে প্রধাবিত হইয়া চিত্তক্ষেত্রে, মহাসমুদ্রের ভীষণতরঙ্গের ন্যায় তরঙ্গ উত্থিত করিয়া বিশ্বপতির অচিন্তানির্ব্বচনীয় জ্ঞান শক্তির ধ্যান হইতে অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা অন্য পথে লইয়া যায়। এজন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা হয় কোন ব্রহ্মনিষ্টগুরুর শরণাপন্ন হইয়া শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্ম বিদ্যালাভ করত এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের চরিতার্থতা সম্পাদন করি। কিন্তু আমার পক্ষে উহা আকাশ কুসুম স্বরূপ হইয়াছে। এই কালে বিত্তাপহারক অসদ্‌গুণযুক্ত গুরুই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তাপহারক সদ্‌গুরু পাওয়া অতি দুরূহ। অথচ গুরু বিনা কোন কার্য্যই সাধিত হয় না।” ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম তুমিতো পড়িতে জান, যোগশাস্ত্র দেখিয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করিতে পার।” তিনি বলিলেন, “যেমন তরণী বর্ত্তমান সত্বেও কর্ণধার বিনা নদী পার হওয়া যায় না, তদ্রূপ অনন্ত শাস্ত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলেও যোগসিদ্ধি লাভ কিম্বা এই ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। সুবিস্তীর্ণ সংসারে বহুশাস্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে যাহা সহস্র বর্ষ অধ্যয়ন করিলেও শেষ করা যায় না; তাহা এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে কিরূপে শেষ হইবে। পূর্ব্বে পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম গোপ যেরূপ দুগ্ধ হইতে তাহার সার ভাগ নবনীত গ্রহণ করিয়া ঘোল ভাগ পরিত্যাগ করে তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা অসীম ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে তাহার সারভাগরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রাদিকে পশ্চাৎ পরিত্যাগ করেন। মুক্তির নিমিত্ত এক ব্রহ্মজ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর বাহ্য পূজা যে অধমসাধন তাহা কেবল মাত্র শ্রবণাধারেই শ্রবণ করিয়াছি, এ পর্য্যন্ত উক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলাম না, এই খেদে অন্তঃকরণ সময় সময় অত্যন্ত খেদান্বিত হয়।” তাঁহার ঐ সকল বাক্য অন্ত হইলে অপরদিকে তদ্দেশবাসী থাকালি জাতির গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল তখন আমি তাহাদিগের নিকটে যাইলাম। তথায় গিয়া দেখি তাহারা (সরলকাষ্ঠ) জ্বালানিকাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিয়া সকলে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সংগীত আরম্ভ করিয়া ক্রমে তথা হইতে স্থানান্তরে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাঁহাদের ঐ সংগীতের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এক ব্যক্তিকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কহিলেন উহারা ভগবান বুদ্ধদেবের ভজনা করিতেছে। উহা শ্রবণান্তে ঐ জাতির পুরাবৃত্ত শুনিবার

নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি ঐ জাতি সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। থাকালি, মগর প্রভৃতি কয়েকটী জাতি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এক্ষণ থাকালি জাতি সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। ইহারা ব্রাহ্মণ,সন্ন্যাসী, যোগী, বৈরাগী প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে গুরু করিয়া দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে সুরু করিয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণ ও মহাত্মা দিগের প্রমুখাৎ ভগবান বুদ্ধদেব বিষ্ণু অবতার শ্রুত হইয়া পিতৃ পিতামহের সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ অন্যায় বোধে অদ্যাবধি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে নারায়ণের মূর্ত্তি বোধে পূজা ও মহাত্মা লামা গুরুদিগকে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাদিগের ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। অবশেষে তদ্দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে কিছু শুনিলাম। উক্ত দেশে ক্ষৌর কার্য্য ও বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত কোন জাতি কিম্বা কোন লোক নিয়মিত নাই। তাহারা স্ব স্ব কার্য্য স্বীয় হস্তে কিম্বা চাকরের দ্বারায় করাইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল দেশে ঘর ঘর রজক ঘর ঘর নাপিত বলিয়া কথিত হয়। পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে একটী গ্রামে এক জন থাকালি জাতির বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক বিশ্রাম স্থান ও আহারীয় দ্রব্য দিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি, গৃহ কর্ত্তার নিকট আমার জন্ম স্থানের পরিচয় দিলে, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাকে কহিলেন "এক্ষণে আপনাকে দেখিলে আর বাঙ্গালি বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর হইল আমি জগন্নাথ ধাম দর্শন ও কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা ভারী সহর, অমন সহর বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, বাঙ্গালি জাতি বড় সুখী, সকলেই ধনী, অতিশয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান, দয়া, শ্রদ্ধা ভক্তিতে অদ্বিতীয়। আজ আমার বড় ভাগ্য গৃহে বসিয়া মহাশয়ের দর্শন পাইলাম, মহাশয়ের পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইল, আমিও কৃতার্থ হইলাম। আমি অতি অধম আপনার যথাবিধি সম্মানরক্ষা করিতে পারি ঈশ্বর আমাকে এমত ধন দেন নাই, নিজ গুণে আশ্রিতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ পত্র পুষ্প (সুখাদ্য দ্রব্য) গ্রহণ করুন।" তাঁহার ঐ মিনতি যুক্ত বাক্যের উত্তরে কহিলাম, আমি তোমার বাক্যে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমার মঙ্গল করুন। "পর দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে কালী নদীর তীরবর্ত্তী (কালীর অপর নাম সরযু নদী) একটী বৃহদাকার বাটী দৃষ্টে তথায় যামিনী যাপনের ইচ্ছুক হইয়া প্রাসাদাভ্যান্তরে গমনোন্মুখ হইলাম। পুর প্রবেশ মাত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ যুগল মৃগেন্দ্রের ন্যায় দুই দ্বার রক্ষক প্রভু ভক্ত কুকুর দৃষ্ট হইল। আমাদিগের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ হইবা মাত্রই তাহারা অশনিপাতের ন্যায় গগণভেদী রব করিতে করিতে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল। তৎশ্রবণে গৃহ স্বামিনী

বহির্গত হইয়া হিন্দি ভাষায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি চান ?" তদুত্তরে সঙ্গী একজন নেপালিভাষায় কহিলেন "আমরা অদ্য রাত্রি এই স্থানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করি।" গৃহকর্ত্রী আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া কুকুরদিগকে নিরস্ত হইবার সঙ্কেত করিলেন, তাহারা প্রতিপালনকারী প্রভুপত্নীর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করিল। আমরা যে বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম উহা একজন ভূটীয়া জাতির গৃহ, তিব্বত নেপাল প্রভৃতি স্থানবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সচরাচর ভূটীয়া কহে, কিন্তু মান্যার্থে গৃহস্থদিগকেও লামা 'মহাশয় বা মাহাত্মা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, ভূটীয়া বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহারা দুঃখিত ও রাগান্বিত হয়। সন্ধ্যার পর লামাপত্নী, কন্যা ও পুত্রবধূাদি পরিবৃতা হইয়া আমাদিগের বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করত অভিবাদনান্তে উপবেশন করিল। পরে তাহাদিগের মুখে শ্রুত হইলাম গৃহাধ্যক্ষ পুত্র সকলের সহিত স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন এজন্য বাটীতে সামান্য ২।১ জন ভৃত্য ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ নাই। প্রমদাগণ আমাদিগের গান শুনিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইলে কনক মোক্ষ তত্ত্ববিষয়ের একটী গান গাহিলেন, কিন্তু তৎশ্রবণে তাহাদের মনোরঞ্জন হইল না। তখন তাহারা তাঁহাকে প্রেমগীত গাহিতে অনুরোধ করিল, তিনি তাহাদিগের বহু স্তুতিতে সম্মত হইয়া করতালি প্রদান পূর্ব্বক গাহিতে লাগিলেন "বেণুবাজে সখি মধুবন মে।" ইহা শ্রবণে তাহারা অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তালে তালে তালি দিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গী ও বঙ্কিমনেত্রে দৃষ্টিপাত করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কস্মিনকালে স্নান কিম্বা গাত্রবস্ত্র পরিষ্কার করে না এজন্য সতত উহাদিগের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, পরন্তু উহারা সুন্দরী, সতীত্বাদি গুণসম্পন্না। কিছুক্ষণ পরে কনক তাহাদিগকে কহিলেন আমি তো তোমাদিগকে ৪।৫ টা গান শুনাইলাম এক্ষণ তোমরা ২।৪টা আমাদিগকে শুনাও, তৎবাক্য শ্রবণে উহারা ২টী সঙ্গীত করিল। আমি উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক রসিকা রমণী চতুরতা পূর্ব্বক অর্থ শুনাইল। হে মহারাজ আজ আমাদের ধন্য ভাগ্য, যোগী ঋষিগণ যাঁহার সাক্ষাত দুর্লভ বিবেচনা করেন, আমরা গৃহে তাঁহার দর্শন পাইলাম। আপনার অনুপম মোহন মূর্ত্তি ও চন্দ্রাপেক্ষা উজ্জলতর মুখকান্তি সুবিস্তৃল বক্ষস্থল দৃষ্টে আমাদের মন প্রাণ সুশীতল হইল। আপনার কমল আঁখিতে আঁখি পতিত হইলে আর উহাকে অন্তর করিবার ইচ্ছা হয় না, মনে হয় চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন হইলেই ভাল হইত। হে নাগরীরঞ্জন, ভক্তবৎসল তোমাকে আমরা বার বার নমস্কার করি।"

সেই ছলনা বাক্যে প্রথমতঃ নির্ব্বাক হইলাম পরে তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। যখন ভগবান হিমালয়রাজের

গৃহে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তৎসময় বাসর গৃহে নারী বৃন্দ মহাদেবকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন এইরূপ কল্পনা করিয়া ঐজাতিরা স্বীয় ভাষায় ঐরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে। আমি ঐ চাতুর্য্য জালের অর্থ বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলাম।

রাত্রি অধিক হওয়া প্রযুক্ত কিছুক্ষণ পরেই তাহারা নিরস্ত হইয়া আমাদিগকে বহুবিধ স্তুতি ও অভিবাদন করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে স্ব স্ব শয়ন কক্ষে চলিয়াগেল। ক্ষণকাল পরে সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, বিশ্বপতি বিধাতা এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ পুরুষ জাতিকে গৃহস্থাশ্রমরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার নিমিত্তই স্ত্রী জাতির সৃজন করিয়াছেন। বিশেষ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকরগণ স্ত্রীকে গৃহের লক্ষ্মী, জীবনের শক্তি, ভার্য্যাহীন ব্যক্তিই শ্রীহীন, শক্তিহীন ইত্যাদি লিখিয়া গৃহস্থাশ্রমের পরম পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। যে মহাবীর ভীষণ সম্মুখ সমরে শত সহস্র যোদ্ধাকে নিহত করিয়া স্বীয় বাহুবলে জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন তিনিও দুর্ব্বলা অবলার কর কমলের নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণের দাস হইয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভারতবাসী সমস্ত হিন্দু জাতি নারায়ণ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন তিনিও কুঞ্জবনে শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের নিমিত্ত তাহার পদ ধারণ করিয়াছিলেন। হে লোকনাথ, তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব-সংসার চলিতেছে পুরুষ-প্রকৃতিরূপা নরনারী-তোমার উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, আমি তোমাকে নমস্কার করি। ইত্যাদি প্রকার বহু চিন্তা করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম।

ক্রমশঃ।

উদাসীন।

ঘাটের কথা।

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত, তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পড়িতে পাইতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাক, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আরেকদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বাকী আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে। ভরা গঙ্গা। আমার চারটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের

সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গার বাব্‌লাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল্‌ছল্‌ আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে। ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মত রং, চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোন সময়েত দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝীরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখীরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে ছোট ছোট নৌকাগুলি তেম্‌নি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখী বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সে দিনের কথা! আমার দিনগুলি না কি গঙ্গার স্রোতের উপরে খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেই জন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালের ভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্য্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতা গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাহারা পুরাতনকে শ্যামল ও মধুর করিয়া রাখিয়াছে; তাহারা পুরাতনকে চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক এক পা সরিয়া যাইতেছেন, আমিও তেতই এক এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির ঐ যে বৃদ্ধা স্নান

করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে, তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মত ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিত, সে মেয়েও আবার বড় হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসান মনে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মত পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন্ ডোবে কখন্ ডোবে। পাতাটুকুরই মত সে অতি ছোট, তাহাতে বেশী কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র। এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড় গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র, কচি কচি পাতা গুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল, রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌বিল্ করিত মাত্র। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত। যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া অষ্টাবক্রের মত বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মত সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে

দুইখানি ইটের অভাব ছিল, সেই গর্ত্তটির মধ্যে একটা ফিঙ্গে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্খুস্ করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার যোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিষ দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি। সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপরে পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবাল গুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশী খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাসা করিত, তাহা নহে, তথাপি, আশ্চর্য্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারো নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে নহিলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুসি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুস্‌মি। যখন্ তখন্ দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছিল। সে জল ভারি ভাল বাসিত।

কিছুদিন পরে আর কুসুমকে দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম নাকি তাহাদের কুসী-খুসীরাক্কুসীকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে না কি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কা'রা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙ্গায় রোপন করিতে লইয়া গেছে।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড় করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের আর সে সঙ্গীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্রে অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া বাতাস কেমন হাহা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিত দুই একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাতই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিন্দুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুর ঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ন মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউ গুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসীখুসীরাক্কুসী বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্য্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চখে পড়িত না। কুসুম যে বড় হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি ত পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড় কখন দেখি নাই। তাহার মল ছিলনা বটে, কিন্তু সে যখনি চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন্ কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেও পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমনি এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা যে দিন সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচু-নিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্য সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মত তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মত টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারাহীন, তাঁহাদের সুখ দুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেই দিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়া ছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যউজ্জ্বলমুখচ্ছবি, দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিব মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা গ্রামে রাষ্ট হইয়া

পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না; ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারী সমাজে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোন দিন ভাগবত পাঠ করিতেন কোন দিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত,—আহা, কি রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া আবক্ষ গঙ্গার জলে নিমগ্ন করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলের শিয়রের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মত ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত, ও আকাশ সরোবরে উষা-কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইতে থাকিত। ক্রমে গাছের প্রান্তগুলি আকাশে ফুটিতে থাকিত, বাতাস জাগিত, আকাশের বর্ণ শুভ্র হইয়া আসিত, অবশেষে নেপথ্য হইতে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে প্রাতঃস্নাত বিমল সূর্য্য ধীরে ধীরে সোপানে সোপানে আকাশে উত্থান করিতে থাকিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক একটি করিয়া শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, চন্দ্র তারা পশ্চিমে নামিয়া যায়, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী! স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজুট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্য্যকিরণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমনি আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্য্য গ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোক সমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল। সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আরেক জনের গা টিপিয়া

বলিয়া উঠিল—"ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী!" আরেকজন দুই আঙুলে ঘোম্‌টা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা, তাইত গা, এ যে আমাদের চাটুয্যেদের বাড়ির ছোট দাদাবাবু!" আরেক জন ঘোম্‌টার বড় ঘটা করিত না, সে কহিল—"আহা, তেম্‌নি কপাল, তেম্‌নি নাক, তেম্‌নি চোক্‌!" আর একজন সন্যাসীরদিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসীদিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা, সে কি আর আছে! সে কি আর আস্‌বে! কুসুমের কি তেমনি কপাল!" তখন কেহ কহিল "তার এত দাড়ি ছিল না।" কেহ বলিল "সে এমন একহারা ছিল না।" কেহ কহিল—"সে যেন এতটা লম্বা ছিল না।" এইরূপে এ কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল। তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল—তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মত মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড় ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশেপাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙ্গাঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিমগাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্দ্ধচীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল। সন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন,—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্দ্ধমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপরে তেম্‌নি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ছিল। মনে হইল যেন বহুদিন পরে পূর্ব্ব পরিচিত কোন্‌ দুই জন ক্ষীণালোকে বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়া পরস্পরকে দেখিতে পাইল—দুজনে দুজনকে চিনিতে পারিল, তবু চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চিত্রার্পিতের মত ভাব দেখিয়া, আমার উপরে

জ্যোৎস্নালোকে উভয়ের যে ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়ায় ছায়ায় ক্ষণেকের জন্য স্থিরভাবে একত্রে মিলন দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল—ইহা আমার কল্পনাও হইতে পারে। আমার মনে হইল—প্রথম দৃষ্টিতেই যদি ইহাদের চেনাশোনা না হয়, ইহাদের পূর্ব্বজন্মের সম্পর্ক সহসা মনে না পড়ে তবে আর চেনাশোনা হইবে না, আর মনে পড়িবে না। মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বৎসে, তোমার নাম কি।' কুসুম কহিল—"আমার নাম কুসুম।" সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল. কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধুলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্ম্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত! কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—সে বুঝিতে চেষ্টা করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন, সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। শিশির-ধৌত পূজার ফুলের মত তাহাকে পবিত্র দেখাইতে লাগিল--এমন কি, সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত ফুলের মতই দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্ব্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। আকাশে হিমের ভার একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া

শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখীরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে। বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নব যৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছু দিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছু কাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল "প্রভু, আমাকে কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন!" "হাঁ, বৎসে; তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? আজ কাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন!" কুসুম চুপ করিয়া রহিল। "বৎসে আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল।" কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল—"প্রভু, আমি পাপীয়সী সেই জন্যই এ অবহেলা!" সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।" কুসুম একটু যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়ত মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন! তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "বৎসে, তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বল, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।" কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন ত অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি এক জনকে, আমার গুরুজনকে, দেবতার মত ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুল বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম, আর পূর্ব্বের মত দেখিলাম না। পাপ মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম—কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয়

না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে!" যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথা গুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসীর সর্ব্ব শরীর যেন কাঁপিতেছিল, সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন। কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ, সে কে বলিতে হইবে!" কুসুম যোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বল!" কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটী পীড়ন করিয়া হাত যোড় করিয়া বলিল, "সে কি না বলিলেই নয়! সে কি নিতান্ত বলিতেই হইবে।" সন্ন্যাসী কহিলেন "হাঁ বলিতেই হইবে!" কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি!" যেমনি তাহার নিজের কথা তাহার নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন—"বৎসে, তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বল, এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল "প্রভু তাহাই হইবে!" সন্যাসী কহিলেন—"তবে আমি চলিলাম।" কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্যাসী চলিয়া গেলেন। কুসুম কহিল "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল। এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে শ্রান্তির সময়ে এ জল যদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে! চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়! আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না।

কেঁচো।

১। মুখবন্ধ।

কেঁচো সংস্কৃত 'কিঞ্চিলিক' বা 'কিঞ্চুলুক' কথার অপভ্রংশ; যে কিং অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চলে। ইহার অপর নাম 'মহীলতা'। এই তিনটির কোন একটি নাম

দিলে অনেকের কাছে কেঁচো সম্ভবতঃ মান সম্ভ্রম পাইত, অন্ততঃ তত হেয় বলিয়া বোধ হইত না। 'কিঞ্চিলিক,' 'কিঞ্চুলুক,' বা 'মহী-লতা' অনেকের কাণে শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কানে চির পরিচিত কেঁচো নামটাই ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রুচির দোষ। বলেন, বলুন। বাল্যকালাবধি যে নামটী শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া হয়। কেঁচোকে যে একটী বড় নাম দিয়া ডাকিলেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। তাহার কার্য্য মহত্বই তাহার গৌরব। নামে কি করে?

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কেঁচো খুঁড়িয়া তুলি, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বঁড়শীতে বিঁধি। কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গর্ব্বিত মানুষ মনে করে, "পরমেশ্বর আমাদের আহারের জন্য জলে মাছ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাকে ধরিবার জন্য ভূমিতে কেঁচো দিয়াছেন; আহা কি অপূর্ব্ব কৌশল।" মাছ ধরা ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে কেঁচোর অন্য কোন কাজ আছে কি না, ক জন তাহার অনুসন্ধান করে? তাহার প্রাণ আছে সে টুক বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, নখ দিয়া কাটিবার সময়, হিল্‌বিল্ করিয়া নড়ে। কিন্তু কেঁচো নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেকে তাহাকে ছুঁইতে ঘৃণাবোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব? তাহার ইতিহাসে আমরা কি শিখিব?

কেঁচো প্রকৃতির কৃষক—যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চসিয়া দিত; আর এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মানুষের লাঙ্গল চলে না, সেখানকার জমি চসিয়া দেয়। কেবল তা নয়; এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কীট জমির একজন প্রধান সৃষ্টি কারক, এবং উর্ব্বরতা সাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপকার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয়া থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয়া যাইতে দেখা যায়; অনভীর ভিত্তি কমজোর হইয়া কালে নিম্নগামী হয়; প্রাচীন, পতিত গৃহের মেজে তাহার পরিত্যক্ত মৃত্তিকাবৃত হয়। কেঁচোর এসব কাজ কিরূপে সাধিত হয় বুঝিবার আগে, তাহার শরীরতত্ত্ব অনুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক, তুমি তাহা দিতে কি কুণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্য্যালোচনায় আমরা কত মহৎ সত্য শিখি! মানুষাদি উচ্চ জীবকে বুঝিবার একমাত্র উপায় কীটাদি নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে ছোট বড় যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটী দৃঢ় মূলীভূত সত্য। ইহা কি চমৎকার!

২। বাসস্থান।

কেঁচো ভিজে স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতে ভাল বাসে। বর্ষাকালে ইহাকে জমির অল্পনীচেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার

বিবর কখনও কখনও ২।৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কেঁচো কতক মাটি ঠেলিয়া ফেলে, কতক উদরস্থ করে, এবং ইহার পায়ু দ্বারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া গুটীকত কেঁচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই তাহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নীচে চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত করিয়া একটীকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, এদিক ওদিক নরম মাটি খুজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ...র একটীকে তাহার সাহায্যার্থে দিলাম ... গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, এ... বাড়াইয়া খুদিতে লাগিল ... আর একজন আর একটু, এইরূপ ... একটু করিয়া পন ঘন্টার মধ্যে তাহারা অন্তর্হিত হইল। কেঁচোর বিবর সোজা নয়, বক্রাকৃতি; কখনও কখনও তাহার মুখ পাতা ইট পাট্‌কেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্মীক পায়ু পরিত্যক্ত মল মাত্র। একজাতীয় কেঁচোর (যাহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া যায়) বল্মীক, স্তম্ভের ন্যায়। এই স্তম্ভ এক ইঞ্চ দুই ইঞ্চ, বা ততোধিক উচ্চ হইতে পারে। আর একজাতীয় কেঁচো আছে তাহার ঢিবি ছোট ছোট, পৃথক পৃথক, গুটীর রাশিমাত্র। জলের মধ্যে কেঁচো অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না, আমি কতকগুলিকে বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহারা মৃতবৎ; পরে ২।৩ ঘন্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জনাই বোধ হয় বর্ষার পর অনেক মরা কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। খাদ্য, পাক-প্রণালী।

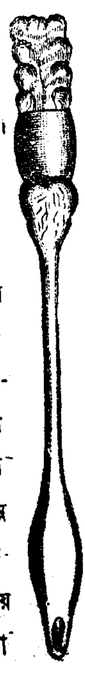
কেঁচো রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়। দিনের বেলা অনেক শত্রু পাখী, পিঁপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া থাকে। কেবল নিষেক (fertilisation) কার্য্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কেঁচোর প্রধান ...দ্য মৃত্তিকা এবং পাতা, কিন্তু অন্যান্য বহুতর জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চর্ব্বি, মাংস পর্য্যন্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ এবং তাহার নিম্নস্থিত স্ফীত গলদেশ [১] (phary...., বাহির করে। কেঁচোর দাঁত

[১] ইহা দেখিবার জন্য একটী মোটাগোছের কেঁচো লইয়া তাহাকে ক্লোরাফর্ম দ্বারা বা মদের ভিতর ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্ঠভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কাল) মাঝামাঝি মুখ হইতে গাত্রের চর্ম্ম খুব ছোট ধারাল কাঁচির দ্বারা সতর্কতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে pie dish এর ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাষ্ঠ খণ্ডে ব্যবছিন্ন চর্ম্ম দুই পাশে আলপিন্ দ্বারা বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী, এবং তাহার নীচে শাদা সূতার ন্যায় স্নায়ু প্রণালী দেখিতে পাইবে। কর্ককে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে সিসা কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পতর মারিতে কিম্বা কর্কের নিম্নভাগ ও পার্শ্বচতুষ্টয় গ্লাং দ্বারা মোড়াইতে হয়।

নাই ; তাহার খাওয়া চিবান নয় এক রকম চোষা। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি শুষ্ক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম ; তাহার শিরগুলি ছাড়িয়া ছাল চুসিয়া লইয়াছে, এবং পাতা কয়টি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মাটি কিম্বা তাহার অন্ত্রাণি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অনেক অতি ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড দৃষ্ট হইবে। এ সব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কি কিন্তু জন্য ? মাটি বা পাতাতে শরীর পুষ্টিকারক জীবন পদার্থ (organic substance) বেশ আছে, কিন্তু ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন ?

এস্থলে কেঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে দু চ. কথা বলা আবশ্যক। ইহার গঠন কৌশল অতি চমৎকার।

'গল' শব্দ গল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্' ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গল দেশের নিম্নে গলনালী। প্রচলিত ভাষায় 'গলা' দ্বারা আ



মরা যাহা বুঝি 'গল ...া এবং কণ্ঠ হইতে ভিন্ন বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ মুখ, মুখের পর পূর্ব্বোল্লেখিত অত্যন্ত স্ফীত গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী। গল নালীর নিম্নভাগ স্ফীত। এই স্ফীতাংশের আবরণ অত্যন্ত স্থূল ও কঠিন, ইহাকে ইংরাজীতে ক্রপ বলে। ইহার নীচে জঠর, পরে অত্যন্ত লম্বা অন্ত্রাণি। ক্রপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় সাতিশয় বলবান্ মাংশপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংশপেশী সজোরে চালিত হয়, এবং ক্রপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে পত্রাদি খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কেঁচোর দাঁত নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইটের টুকরা দাঁতের কায করে।

৩। স্নায়ুপ্রণালী, ইন্দ্রিয়, মানসিক বৃত্তি ইতাদি :

...ায়ুপ্রণালী সূত্রের ন্যায়, মধ্যে ...শ, আমাদের মত পাকপ্রণালীর ...নিম্নভাগে। কিন্তু ইহার ...ত সংযুক্ত, গলদেশের উপর, একটী বিশেষ স্থূলাংশ (ganglion) দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর চোখ নাই। গাত্র দ্বারা আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্থূলাংশতে লাগে, তাহাতেই সে আলোক অন্ধকার বুঝিতে পারে, রাত্রি দিন চিনিতে পারে, দিনের বেলায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত করা যায় তাহা হইলে আলোকরশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়বাংশে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই সকল অবস্থায় কেঁচোরও আলোক বোধ জন্মে না। তাহার কাণ নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে

ভয় পায়, এবং দ্রুতগতি বিবরে প্রবেশ করে। এস্থলেও শব্দ হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে স্নায়ুর কথা এই মাত্র বলা হইল তাহা দ্বারা কাজ করে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রবল। বিবর হইতে বাহির হইবার সময় মুখ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর লয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে আমার টবস্থিত একটী কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া কিরূপে নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আস্বাদনেন্দ্রিয় বেশ আছে, খাদ্য দ্রব্যের ভাল মন্দের তারতম্য বোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রাণীতত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব ভাল বাসে, কোন কোন গাছের পাতা আদৌ স্পর্শ করে না। তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তত প্রবল নয়; চোনা, হুকার জল প্রভৃতি দুর্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর ঢালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয়; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুন কি তন্মিশ্রিত হানিজনক পদার্থের দরুণ এরূপ ব্যবহার করে তাহার মীমাংসা আবশ্যক। কিঞ্চিলিকের বংশ বর্দ্ধন স্পৃহা এত বলবতী যে দিনের বেলাও যখন ভয়ে বিবরের বাহির হয় না—দুই জনে সংযুক্ত হইয়া কখনও কখনও বাহিরে পড়িয়া থাকে।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিরূপে দুইটী কেঁচো গায় গায় জড়াজড়ি করিয়া একত্রে কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। এই কাজে কি তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে, "কেঁচো আবার জন্তু তার আবার বুদ্ধি!" বাসস্থান নির্ম্মাণ করা, রাত্রিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যস্ত কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকার জমি খুব নরম, দুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খনন করিতে পারিবে, তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না, তবু যে তাহারা একত্রে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নয় ত আর কি বলিব? প্রাণীতত্ববিৎ মহা পণ্ডিত মৃত ডারউইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিবরের মুখ উৎকৃষ্টরূপে বন্ধ হইবে, ঠিক সেই দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমরা যখন বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হই। কেঁচোরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে তখন আলোক-রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় না; অতএব কেঁচোরও মন আছে এরূপ সাব্যস্ত করা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কেঁচোর শরীর বহু সংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত

সুচারুরূপে দেখা যায় না, কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে, তাহাতে বাধে, খর্‌খর্ করে। চলিবার সময় কেঁচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সঙ্কোচশীল একটী লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু কেঁচোকে কাটিলে যাহা নির্গত হয়, তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কেঁচোর বাস্তবিক রক্তের কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কেঁচোর নিকট সম্বন্ধীয় জলবাসী অনেক কীটের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কানকা (Gills) আছে; তাহার নিজের সেরূপ কোন যন্ত্র নাই। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ছিদ্রবহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়।

কেঁচোর পুরুষ—এবং নারী অঙ্গ দুই একত্রে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কেঁচোর দেহাভ্যন্তরস্থিত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কেঁচোর নারী ও পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী কেঁচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

৫। কৃষি কার্য্য।

কেঁচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা অনেক থাকে সেখানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরের দরুণ জমি নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং কৃষি কার্য্যের সুবিধা হয়। কেঁচো ইট পাট্‌কেলের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ বীজ পরিত্যক্ত মলের সহিত বহির্গত হয়; তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখনও কখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বজায় থাকে, কালে উহা অঙ্কুরিত হয়।

কেঁচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং তাহাকে সারবান্ করিতে বড় পটু। কোন স্থলে ইটপাট্‌কেল কাকরাদি ছড়াইয়া রাখিলে, সে নিম্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রমশঃ উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলিত মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কালে ইহা দ্বারা উর্ব্বর শস্যোৎপাদক জমি তৈয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেঁচো কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডাদি উদরস্থ করে। গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে এই সকল হানিজনক জিনিস এক একটী করিয়া বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদের বৃদ্ধির বিশেষ আনুকূল্য করে। বিবরের মুখ বুজাইবার জন্য যে সকল পাতা জমির নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কেঁচোর একটী প্রধান খাদ্য। উদরস্থ পাতার টুকরা সকল হইতে শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্টাংশ মলের সহিত নির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্ব্বরতার বৃদ্ধি

করে। একটী টবে একজন কেঁচোতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত বালি পূরিয়া তাহাতে পাতা ও কতকগুলি কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিনকতকের মধ্যেই ঐ বালি উত্তম সারজমি হইয়া দাঁড়াইল।

৬। রক্ষাকার্য্য।

ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিস কেঁচোর মাটিতে আবৃত হইতে পারে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ যাহা এককালে জমির উপর পড়িয়াছিল, কেঁচোর দৌলতে জমির নীচে সুচারুরূপে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে হইতে মাটি তোলার জন্য দমিয়া যায়, এবং ঐ স্তূপীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

৭। ক্ষয়কার্য্য।

পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরষা তাপ প্রভৃতির কার্য্যে বৎসরের পর বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্য্যের সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমির উপকার করে তাহা নয়, অপকারও করিয়া থাকে—জমি কমজোর হইয়া ধসিতে পারে, ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্করাদি অনেকটা তাহার বিবরের মুখে জমির উপর পরিত্যক্ত হয়। উহা, বিশেষতঃ, বেলে জমির কীটের গুটির ন্যায় মল। বর্ষাকালে সহজে ধৌত হইয়া যায়, বৃষ্টির জল মিশ্রিত বালির বৃদ্ধি সাধন করে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, যে ঐ বালি নালা, খাল দ্বারা নদীতে গৃহীত হয়, এবং নদী দ্বারা সমুদ্রে বাহিত হয়।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।

ভক্ষ্যদ্রব্য কয় প্রকার।

আমাদের দেশে আহারীয় দ্রব্য সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক বা বৰ্দ্ধক। অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা চারি শ্রেণীতে সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যকে বিভক্ত করিয়া থাকেন যথা ১। সত্ত্বকারী (Proteids)। ২। তৈল বা চর্ব্বিজাতীয়। ৩। শ্বেতসার। (amyloids)। ৪। ধাতব।

১। সত্ত্বকারী অর্থাৎ প্রাণকারী পদার্থে সচরাচর চারিটি মৌলিক বা ভৌতিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—ক্ষারজান, অম্লজান, জলজান ও অঙ্গারজান। কখন কখন গন্ধক ও ফস্‌ফোরস্‌ও পাওয়া যায়। ময়দার, ডিম্বের, মাংসের ও দুগ্ধের সারাংশ এই জাতীয় পদার্থ।

২। চর্ব্বি। ইহাতে তিনটি ভৌতিক

পদার্থ পাওয়া যায় যথা ;—অঙ্গারজান জলজান ও অম্লজান। সকল প্রকার চর্ব্বি- ও তৈল এই জাতীয় পদার্থ।

৩। শ্বেতসার (starch) ইহাতেও তিনটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় যথা ; অঙ্গার- জান, জলজান ও অম্লজান; কিন্তু চর্ব্বি- জাতীয় পদার্থে জলজানের ভাগ অধিক। গঁদ, শর্করা, আরারুট ইত্যাদি এই জাতীয় পদার্থ। আমাদিগের প্রায় সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শ্বেতসার অধিক পরি- মাণে পাওয়া যায়। তণ্ডুল, ময়দা, আলু ইত্যাদিতে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার আছে।

৪। ধাতব পদার্থ ও জল। এই দুই পদার্থ সকল ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেই নূন্যাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত চারি বিভাগের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য অধিক কাল পর্য্যন্ত আহার করিয়া প্রাণধারণ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত জীবন ধারণোপযোগী আহারে এই চারি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন সত্বকারী পদার্থ যদি সহজে জীর্ণ হয় তাহা হইলে অন্য জাতীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতীত ইহা জীবন ধারণোপযোগী হইতে পারে। মনুষ্য দেহে সত্বকারী পদার্থ অত্যধিক পরি- মাণে পাওয়া যায়, এই জন্য এই জাতীয় পদার্থ ব্যতীত কখনই প্রাণ ধারণ হইতে পারে না, সত্বকারী পদার্থের সহিত ধাতব- পদার্থও নিতান্ত আবশ্যকীয়। কিন্তু শ্বেতসার ও চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ প্রাণ ধারণ জন্য নিতান্ত আবশ্যক নহে। সত্বকারী পদার্থ যে আমাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এবং ঐ ক্ষতি পূরণের জন্য নূতন মাল মশলার প্রয়োজন হইতেছে। প্রস্রাব, ঘর্ম্ম ও অ- ন্যান্য নিস্রবণ দ্বারা অহর্নিশি এক প্রকার ক্ষারজাতীয় (urea) পদার্থ নির্গত হইতেছে। আহার কর আর না কর ইহা (urea) নির্গ- মনের বিরাম নাই। এই নিস্রবণ শরীরাভ্য- ন্তরিক সত্বকারী পদার্থের রূপান্তর মাত্র। এই কারণে সত্বকারী পদার্থ প্রধান ভক্ষ্য- দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

সত্বকারী পদার্থে চারিটি মৌলিক পদার্থ দেখা যায়। ঐ চারিটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা মনুষ্য দেহও গঠিত হইয়াছে—(এত- দ্ব্যতীত ধাতব পদার্থ ও জল পাওয়া যায়।) সত্বকারী পদার্থ রাসায়নিক বিচ্ছেদ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে জলজান, অম্লজান, ক্ষার জান ও অঙ্গারজান এই চারিটি মৌলিক পদার্থে গঠিত। এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীত হই- তেছে যে মনুষ্যদেহ ও সত্বকারী পদা- র্থের রাসয়নিক ঘটন একই। এই কারণে সত্বকারী ও ধাতব পদার্থ জীবন ধারণোপ- যোগী হইয়া থাকে। অঙ্গারাম্ল carbonic acid ও জল যাহা সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর- জাত দ্রব্য মধ্যে পাওয়া যায় তাহাও সত্ব- কারী পদার্থের অম্লজান ও অঙ্গারজান হইতে উদ্ভূত হইতে পারে।

যদিও সত্বকারী পদার্থ চারি শ্রেণী ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং কোন কোন

অবস্থায় অন্য শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত প্রাণ-ধারণোপযোগী হইতে পারে কিন্তু ইহা অসুবিধা জনক ও অপরিমিত খাদ্য। আমি ইহা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ডিম্বসার (albumen) এক প্রকার প্রধান সত্বকারী পদার্থ। ইহার শতভাগের মধ্যে ৫৩ ভাগ অঙ্গারজন ও ১৫ ভাগ ক্ষারজান পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তিকে কেবল ডিম্বের শ্বেতভাগ আহার দেওয়া যায় তাহা হইলে মোটামুটী ধরিতে গেলে সে ব্যক্তি প্রত্যেক ক্ষারজান ভাগের সহিত সার্দ্ধ তিন ভাগ অঙ্গারজান আহার করিবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে একজন সুস্থকায় পুষ্ট মনুষ্য যে নিজ ভার ও স্বাভাবিক উত্তাপ রক্ষণের উপযুক্ত ও মধ্যবিৎ রকম ব্যায়াম করিয়া থাকে, তাহার দেহ হইতে চারি সহস্র গ্রেন অঙ্গার ও তিন শত গ্রেন ক্ষারজান নির্গত হয় অর্থাৎ ক্ষারজানের তেরগুণ অঙ্গার নির্গত হয়। অতএব যদি কোন ডিম্বসার ... ত তাহাকে ৪০০০ সহস্র গ্রেন অঙ্গার লইতে ... য় তাহা হইলে ঐ পদার্থ ৭৫৪৭ গ্রেন আহার করিতে হয়। কিন্তু ৭৫৪৭ গ্রেন ডিম্বসারে ১১৩২ গ্রেন ক্ষারজান আছে অর্থাৎ যত ক্ষারজানের আবশ্যক তাহার প্রায় চারিগুণ অনর্থক আ-হার করিতে হয়। যে ৩০০ গ্রেন ক্ষারজন আমাদিগের শরীর রক্ষার্থ আবশ্যক তাহা আমরা অর্দ্ধসের মাংস হইতে পাইতে পারি, কিন্তু যদি কেবল সত্বকারী পদার্থই আহার করা যায় তাহা হইলে ৪০০০ গ্রেন অঙ্গার জান জন্য ২ সের চর্ব্বিবিশিষ্ট মাংস আহার করা আবশ্যক। অতএব যদি কেবল সত্ব-কারী পদার্থই আহার করা যায় তাহা হইলে শরীর রক্ষার্থে ইহা অনর্থক অধিক পরিমাণে আহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্য রক্ষার একটি প্রধান নিয়ম এই যে আহার বলবর্দ্ধক ও শরীর রক্ষার্থ উপযোগী হইবে অথচ পরিমাণে অধিক হইবে না। কিন্তু সত্বকারী পদার্থ দ্বারা যদি জীবন সাধন করিতে হয় তাহা হইলে এই নিয়ম রক্ষা হয় না এবং তজ্জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই বিশেষ কারণে মিশ্র আহার অর্থাৎ সত্বকারী ও তৈল বা শ্বেতসার জা-তীয় পদার্থ মিশ্রিত আহার মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও স্বাস্থ্যকর। প্রথম তিন শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ সত্বকারী, চর্ব্বি ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রধান, অর্থাৎ প্রাণ-ধারক খাদ্যমধ্যে পরিগণিত। উক্ত তিন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেই জল ও ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক তাহা কেবল মিশ্র আহারেই পাওয়া যায়।

শরীর তত্ত্ববিদেরা খাদ্যদ্রব্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা; ১। উত্তাপ উৎপাদক খাদ্য, (fuel food) এবং ২। গ্রন্থি উৎপাদক বা শরীর নির্ম্মাণক খাদ্য (tissue-food)।

১। উত্তাপ উৎপাদক খাদ্য। শ্বেতসার ও তৈল জাতীয় খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যদিও চর্ব্বি ব্যতীত এই দুই জাতীয় খাদ্য অন্য কোন পদার্থের গঠনের সাহায্য করে

না, কিন্তু উত্তাপ উৎপাদন করিয়া শরীরাভ্যন্তরিক চর্ব্বিকে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে দেয় না। এই কারণে উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যও প্রাণধারক খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত। যেমন কলের গাড়ির এঞ্জিন্ চালিত হইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা বা জ্বালানি কাষ্ঠের আবশ্যক সেইরূপ উত্তাপ উৎপাদক খাদ্যও আমাদের দেহের উত্তাপ কার্য্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়।

২। গ্রন্থি উৎপাদক বা শরীর নির্ম্মাণক খাদ্য। এই শ্রেণীর খাদ্য দুই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অহর্নিশি প্রতি মুহূর্ত্তেই শরীরের ক্ষয় হইতেছে এবং এই ক্ষতিপূরণের জন্য এই শ্রেণীর খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই কার্য্য ব্যতীত নূতন গ্রন্থি নির্ম্মাণের জন্যও এই শ্রেণীর খাদ্য নিতান্ত আবশ্যকীয়। অতএব শরীর গঠন ও ক্ষতিপূরণ এই উভয় কার্য্যের জন্যই এই খাদ্যের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই খাদ্য উত্তাপও উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যদি উত্তাপ উৎপাদন ও শরীর নির্ম্মাণ উভয় কার্য্যের জন্য এ খাদ্য আহার করিতে হয় তাহা হইলে অযথা অধিক পরিমাণে আহার আবশ্যক। স্বভাবের রীতি এই যে যখন মনুষ্যদেহে কোন শ্রেণীর আহার অধিক পরিমাণে প্রবিষ্ট করান যায়, তখন যতটুকু আবশ্যক ততটুকু ব্যবহৃত হইয়া বাকিটুকু শরীর নির্গমের পথ দ্বারা নির্গত হইয়া যাইবে। এই স্বাভাবিক নিয়ম জন্য অধিক জল পান করিলে প্রস্রাব হইয়া নির্গত হয় ও অন্যান্য খাদ্যও প্রস্রাব ও মলদ্বারা নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু অধিককাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে স্বভাব আপন রীত্যনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, সুতরাং অনাবশ্যকীয় দ্রব্য শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া দেহকে পীড়িত ও দূষিত করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিয়া দেয়। এই কারণে মিশ্র আহারই কেবল যথা নিয়মে পুষ্টিসাধন ও উত্তাপ রক্ষণ করিয়া শরীরকে সুস্থ [illegible] বর্দ্ধন করিতে পারে।

শ্রীব্র [illegible]নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শঙ্কর মণ্ডন।

মণ্ডন। তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য নাই বা হইল—কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাদৃশ্য প্রতিপাদক হউক।

শঙ্কর। যদি সাদৃশ্য বোধক হয় তবে কি কেবল চৈতন্য সম্বন্ধে সাদৃশ্য বলা হইল অথবা সার্ব্বজ্ঞ্য, সার্ব্বাত্ম্য, সর্ব্ব শক্তিত্ব প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে? চৈতন্য সাম্য সকলেরই বিদিত তাহার উপদেশের কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সাম্য হয় তবে তোমার নিজের সিদ্ধান্তেরই বিরুদ্ধ হয়, কারণ অভেদ ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না।

মণ্ডন। পরমাত্মার ন্যায় জীবও নিত্য

চিদানন্দময়, কিন্তু অবিদ্যাবৃত। "তত্ত্বমস্যাদি" বাক্য নিত্য চিদানন্দ স্বরূপের সাম্যবোধক হইলেইত পূর্ব্বোক্ত কোন দোষ ঘটিবে না।

শঙ্কর। হে বিদ্বন্ যদি জীবকে অবিদ্যাবৃত নিত্য চিদানন্দ স্বরূপই বলিতে হইল তবে তত্ত্বমস্যাদিবাক্য জীবব্রহ্মের ঐক্য বোধক হইতে কোন আপত্তি দেখা যায় না, যেহেতু অজ্ঞান দশায় নিত্য চিদানন্দ স্বরূপের ন্যায় জীবব্রহ্মের ঐক্যেরও প্রকাশ না হইতে পারে।

মণ্ডন। হে যতিবর জীবব্রহ্মের চৈতন্য বিষয়ে সাম্যই বলা যাউক, যেহেতু জগৎ চিৎস্বরূপ হইতে উৎপন্ন। তদ্দ্বারা চার্ব্বাকের পরমাণুবাদ এবং সাংখ্যমতের প্রধানবাদ নিরস্ত করা হইয়াছে।

শঙ্কর। হে মণ্ডন, তাহা হইলে "তৎ ত্বৎসদৃশ মস্তি" 'তাহা তোমারই ন্যায়' এই রূপ প্রয়োগ হইত, "তত্ত্বমসি" 'তুমিই তাহা' এইরূপ হইত না। আর "তদৈক্ষত" তিনি দেখিলেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জড়বাদ পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে, পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন নাই।

মণ্ডন। তত্ত্বমস্যাদি বাক্য যদিও সাদৃশ্য বোধক না হউক তথাপি তাহাদের প্রতিপাদ্য অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষরূপ জ্যেষ্ঠ প্রমাণের বিরোধী, অতএব অসঙ্গত। তবে 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিবে' এই বিধি অবলম্বন করিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ও জপ করিতে হয় মাত্র।

শঙ্কর। অক্ষি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যদি ভেদ জ্ঞান লাভ হইত তবে শ্রুত্যুক্ত অভেদ বাক্যের বাধা হইত। কিন্তু ভেদ জ্ঞান অভাবাত্মক, অক্ষির সহিত তাহার সন্নিকর্ষ অসম্ভব। *

---

* কাগজ হইতে কলম ভিন্ন, কারণ কাগজের মধ্যে কলমের অভাব এবং কলমের মধ্যে কাগজের অভাব। কিন্তু এস্থলে যে কাগজ ও কলমের অন্যোন্যাভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বিষয় তাহা নয়। এই মাত্র বলা যায় যে কাগজ যাহা কলমও যে তাহা এই ভাব পদার্থই প্রত্যক্ষ হইতেছে না। কাগজের মধ্যে যেমন তাহার শুক্ল বর্ণ আছে যদি তাহার মধ্যে কলম ও থাকিত তবে প্রত্যক্ষ হইত। ইহা হইতে অনুমান করা হয় কাগজ কলম হইতে ভিন্ন। কিন্তু অনেক বিষয় সত্য হইতে পারে অথচ অতি দূরাৎসামীপ্যাদিন্দ্রিয় ইত্যাদি কারণে প্রত্যক্ষ না হইতে পারে। তোমার হয়ত দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দূরে একটি বৃক্ষ আছে তুমি দেখিতে পাও কিন্তু আমি পাই না, তাহা বলিয়া আমার অপ্রত্যক্ষ হওয়াতে ইহা প্রমাণ হইল না যে বৃক্ষ নাই, ঠিক এইরূপ অভেদ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া ইহা প্রমাণ হয় না যে অভেদ নাই, ইহা বলা ঠিক হয় না যে প্রত্যক্ষ দ্বারা ভেদ জানা যায়। জীব ব্রহ্মের অভেদ সম্বন্ধেও এই মাত্র বলা যায় অজ্ঞান দশায় প্রত্যক্ষদ্বারা অভেদ জানা যায় না। কিন্তু এরূপ বলিলে জ্ঞান দশার প্রত্যক্ষ শ্রুত্যুক্ত অভেদ বাদের সহিত বিরোধ হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অদ্বৈতবাদের বিরোধী এইরূপ ভ্রমে অনেকেই পড়িয়া থাকেন; কিন্তু অভাব অথবা নিষেধ বাক্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব। প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজনিত, অতএব ভাব পদার্থ সম্বন্ধেই তাহা সম্ভব। যেখানে প্রত্যক্ষ দ্রব্য নাই বলা

মণ্ডন। আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যখন জীবাত্মার এই ভেদ বোধক বিশেষণত্ব আছে তখন ভেদের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হইলেও সেই বিশেষণত্বের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ আছে।

শঙ্কর। গুণী ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে না, অতএব কেবল বিশেষণত্বের ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অনুমান করা যাইতে পারে না। অবশ্য সেই বিশেষণত্বের আশ্রয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় বলিতে হইবে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মা সেই আশ্রয়, যাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্টত্ব নাই।

মণ্ডন। সেই বিশেষণত্বের আশ্রয় আত্মার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ নাই বলিয়াছ, তাহা ভাল বলা হয় নাই, কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না থাকিলেও চিত্তরূপ মানসেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে, যেহেতু চিত্ত এবং আত্মা উভয়ই দ্রব্য, পদার্থ।

শঙ্কর। আত্মা হয় বিভু (সর্ব্বগত) না হয় অণু, উভয়থা সন্নিকর্ষ হইতে পারে না, যেহেতু সাবয়বের সহিতই সাবয়বের সন্নিকর্ষ দৃষ্ট হয়। আবার পূর্ব্বে যখন ভেদ ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলা হইয়াছে, তখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই চিত্তকেও ধরা হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে চিত্ত কোন পৃথকইন্দ্রিয় নয়, প্রদীপের ন্যায় লোচনাদি ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যকারী মাত্র।

মণ্ডন। ইন্দ্রিয় লব্ধজ্ঞান যদিও ভেদের প্রমাণ না হউক তথাপি ভেদের সাক্ষিস্বরূপ হউক, কেহই নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া বোধ করে না। সেই সাক্ষ্যের সহিত যখন বিরোধ হয় তখন তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে জীবেশ্বরের একত্ব বুঝাইতে পারে না।

শঙ্কর। অবিদ্যা মায়াযোগে জীব এবং ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা স্বীকার করিয়াই কিন্তু শ্রুতি বলিতেছে কৈবল্যাবস্থায় তাহাদের অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ হয়। শ্রুতির কথা এক অবস্থার, ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য আর এক অবস্থায়, প্রকৃতপক্ষে চক্ষুই অবস্থাভেদে ভিন্ন; অতএব বিরোধ হইতে পারে না। অথবা প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধ হইলই না, যেহেতু প্রত্যক্ষ জাত ভেদ জ্ঞান পূর্ব্ব প্রবৃত্ত অতএব দুর্ব্বল, তাহা চরম প্রবৃত্ত শ্রুতি প্রতিপন্ন কৈবল্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ অভেদ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে।"

("পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্ব দৌর্ব্বল্যং" পূর্ব্ব এবং পরজ্ঞানের যদি বিরোধ হয় তবে পূর্ব্বজ্ঞানই দুর্ব্বল। ইহার কারণ এই পূর্ব্বজ্ঞান পরজ্ঞানের পরে জন্মে নাই অতএব ইহা পরজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্মে নাই। কিন্তু পরজ্ঞান পূর্ব্বজ্ঞানের পরে জন্মিয়াছে, অতএব পূর্ব্বজ্ঞানকে বাধিত করিয়া জন্মিয়াছে। যেমন শুক্তিকে যখন রজত ভ্রম

হয় সেখানে সেই দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই মাত্র সত্তা অস্বীকার করা হয়; কিন্তু অনেক স্থানে দ্রব্য থাকিয়াও প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয় না। এমন কি কেহ যদি বলে যে সে এই গৃহে একটি ভূত দেখিতেছে, আমি তখন সেই গৃহের ভূত দেখিতেছি না বলিয়া তাহার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইল না।

হয় তখন প্রথমে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, কিন্তু পরে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান হইলে পর রজত জ্ঞান ভ্রম বলিয়া জানা যায়। শুক্তি যতক্ষণ, শুক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ না হয় ততক্ষণই রজত বলিয়াই বলা যায়, কিন্তু যখন শুক্তি বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় কে আর তখন তাহাকে রজত বলিয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞানের অবস্থাতেই জীব ব্রহ্মের ভেদ, জ্ঞান লাভ হইলে সে ভেদ থাকে না।)

মণ্ডন। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা অভেদ শ্রুতির বাধা না হইলেও অনুমানদ্বারা অভেদ শ্রুতির বাধা হয়,যেহেতু জীব অসর্ব্বজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, অচিৎ ঘটাদি যেমন চিন্ময়, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীবও সেইরূপ।

শঙ্কর। এই যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভিন্নত্ব অনুমান করিতেছ তাহা কি বস্তুগত না কাল্পনিক। যদি বস্তুগত হয় তবে দৃষ্টান্ত হানি হইল, কারণ ঘটাদির অভিন্নত্ব সম্বন্ধে যখন কোন প্রতিযোগী প্রমাণ নাই, এবং জীবের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে আছে তখন ঘটাদির দৃষ্টান্ত এস্থলে সঙ্গত হয় না। আর যদি ভেদ কাল্পনিক হয় আমরাও তাহা স্বীকার করি অতএব সাধনা নিষ্প্রয়োজন।

মণ্ডন। "স্বজ্ঞানাবাধ্য ভেদবত্ব" অর্থাৎ স্বজ্ঞানদ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না এই আমার সাধ্য—ঘটাদি স্থলে স্বজ্ঞানদ্বারা ঘট হইতে আমি পৃথক এই জ্ঞান বাধিত হয় না। তুমি বল স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদজ্ঞান বাধিত হয়। অতএব দৃষ্টান্তহানিও হয় নাই, সাধনাও নিষ্প্রয়োজন নয়।

শঙ্কর। স্ব শব্দদ্বারা কি তুমি সুখ দুঃখাদিমান্ অথবা তদ্বিধুর আত্মা বলিতে চাও। যদি প্রথমার্থ হয়, আমরাও তাহা স্বীকার করি, তাহা সাধ্য বিষয় নয়। যদি শেষোক্ত অর্থ হয় তবে আবার তোমার দৃষ্টান্ত হানি হইল। কারণ যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় না আর যে অবস্থায় স্বজ্ঞান দ্বারা ভেদ জ্ঞান বাধিত হয় এই দুই সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্রমশঃ।

যোগিয়া।

বহু দিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন
প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।

জুঁই সরোবর তীরে
নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার;
বরষার বৃষ্টি ধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে
না জানি বা কোন্ থানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে!

ধীরে ধীরে সুর তার
মিলাইছে চারি ধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছ পালা চারি ভিতে
সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্ন ছবি।
এ প্রভাত মনে হয়
আরেক প্রভাত ময়,
রবি যেন আর কোন রবি।
ভাবিতেছি মনে মনে
কোথা কোন উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রুরেখা,
একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি!
তার কি পায়ের কাছে
বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে!
মলিন মালাটি তুলি
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে!
বিষাদ কাহিনী তার
সাধ হয় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন।
তাহার আঁখির কাছে
যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।
একিরে আকুল ভাষা!
প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো!

না-জানি কাহারে চায়
তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে
চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে
তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা
কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা
তাদের মরণ গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে
ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়!
কাছে আসে বসে পাশে,
তবুও কথা না ভাষে
অশ্রু জলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায়
অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া
বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতরঙ্গিনী।

ভূষাভোগী ফণারত্নরোচিঃ সিচয়চারবে।
নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকল্পমহীরুহে ॥ ১
ভালং বহ্নিশিখাঙ্কিতং দধদধি শ্রোত্রং বহন্ সম্ভৃত—
ক্রীড়ৎকুণ্ডলজৃম্ভিতং জলধিজচ্ছায়াচ্ছকণ্ঠ-চ্ছবিঃ।
বক্ষো বিভ্রদহীনকঞ্চুকচিতং বদ্ধাঙ্গনার্দ্ধস্য বো
ভাগঃ পুঙ্গবলক্ষণোঽস্তু যশসে বামোঽথবা দক্ষিণঃ ॥২

পণ্ডিত প্রবর কহ্লন যাঁহার মঙ্গলাচরণ করিয়া কাশ্মীরের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অদ্য আমরা সেই দেবাধিদেব কৈলাসনাথের স্তুতিগান প্রবন্ধের শীর্ষ মুকুট স্বরূপ সংযুক্ত করিয়া সেই ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর্য্যগণের অমৃত প্রসবিনী লেখনী প্রসূত যে কয়েকখানি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিনী" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুর্জ্জরের "রাসমালা" ত্রিপুরার "রাজমালা" উৎকল দেশের "মাদলাপাঞ্জী" ও রাজস্থানের চারণদিগের গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ভারতীয় ইতিহাস সমস্তই রাজতরঙ্গিনী অপেক্ষা আধুনিক। রাজতরঙ্গিনী ভারতের একটী ক্ষুদ্র অংশের ইতিহাস হইলেও ইহাতে ভারতীয় প্রধান প্রধান ধর্ম্ম কিম্বা সমাজ বিপ্লবের সুন্দর ছায়া লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের সাহায্যে আমরা সেই লোম হর্ষণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং তাহার নায়ক যুধিষ্ঠিরাদির সময় নির্ণয় করিতে সক্ষম হই। এই গ্রন্থে ৬৫৩ কলিগতাব্দ হইতে খ্যাতনামা মোগল সম্রাট জালালোদ্দিন আকবর কর্ত্তৃক কাশ্মীরবিজয় অর্থাৎ ১৪৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

রাজতরঙ্গিনী চারিখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ভাগের রচয়িতার নাম কহ্লণ পণ্ডিত। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম রাজাবলী, জোনরাজ ইহার লেখক। শ্রীবর পণ্ডিত তৃতীয় ও প্রাজ্যভট্ট চতুর্থ ভাগের রচনা করিয়া "রাজতরঙ্গিনী" সমাপ্ত করিয়াছেন।

কহ্লণ পণ্ডিত কাশ্মীর দেশীয় মহামাত্য চম্পক প্রভুরপুত্র। তিনি ১১৪৮ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপ্রণীত গ্রন্থ ৮ তরঙ্গে বিভক্ত। ইহাতে ৭৮৫০ শ্লোক আছে। ২৫২৬ পূর্ব্বশকাব্দ হইতে ১০৭০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ৩৫৯৬ বৎসরের ইতিহাস কহ্লন লিখিয়া গিয়াছেন।

জোনরাজার রাজাবলীতে দুইটী তরঙ্গ আছে। তাহার শ্লোকসংখ্যা ৯৮০। জোনরাজ ১৩৩৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

---

* রাজতরঙ্গিনী। শ্রীলোকনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জোনরাজের পরবর্ত্তী শ্রীবর পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনীর তৃতীয় ভাগ "জৈন রাজতরঙ্গিনী" প্রণেতা। ইহাতে চারিটী তরঙ্গ ও ২২২৫ কবিতা আছে। শ্রীবর পণ্ডিত ১৩৯৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন।

প্রাজ্য বা প্রাজ্ঞভট্টকৃত চতুর্থ ভাগ রাজতরঙ্গিনীতে কোন তরঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৩৫ কবিতা আছে। ইহার নাম "রাজাবলী পতাকা"

সমগ্র রাজতরঙ্গিনীতে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশটী তরঙ্গ ও ১২০২০ কবিতা আছে।

এই অমূল্য ইতিহাসগ্রন্থ গুণগ্রাহী আকবরের হস্তগত হইলে তিনি ইহা অনুবাদ করিতে অনুমতি দেন। তাহার অনুমত্যানুসারে খ্যাত নামা আবুল ফাজেল পারস্য ভাষায় রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গিরের আদেশানুসারে মহম্মদ আলি ও অন্য এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ফরাসী ভ্রমণকারী ডাক্তর 'বর্ণিয়ার, সম্রাট ঔরংজীবের সহিত কাশ্মীরে গমন করিয়া কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের দ্বিতীয় খণ্ডেই এই দেশের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিয়ার ভারতের প্রায় সকল প্রদেশই দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর ও আমাদের জন্মভূমি বাঙ্গালারই সমধিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে "মোগলেরা যে কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করেন ইহা আমার নিকট কোন মতেই অসঙ্গত বোধ হইল না। তিনি ভুবনমোহিনী কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। † তাহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তৎপর আরও ২১৩ জন মুসলমান রাজতরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর দেশের ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ১১৪০ হিঃ অব্দে নারায়ণকুল নামক জনৈক কাশ্মীর দেশীয় ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "তওয়ারিখে কাশ্মীর" প্রণয়ন করেন।

এসিয়াটীক সোসাইটীর স্থাপন কর্ত্তা সার উইলিয়ম জোন্স এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮০৫খৃঃ অব্দে খ্যাতনামা কোলব্রুক সাহেব কলিকাতা নগরীতে জনৈক মৃত ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকারী হইতে একখণ্ড রাজতরঙ্গিনী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে স্পিক সাহেব লক্ষ্ণৌনগরে আরও একখণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে পণ্ডিত প্রবর হোরেস হেমন উইলসন সাহেব কলিকাতায় আরও একখণ্ড রাজতরঙ্গিণী ক্রয় করিতে সক্ষম হন।

পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই তিন খণ্ড হস্ত লিখিত রাজতরঙ্গিণী ও কতকগুলি অনুবাদ অবলম্বন করিয়া "কাশ্মীরের হিন্দু

---

† Berniers Travels in the Mogul Empire. Vol 11 p 131.

ইতিহাস" শীর্ষক একটী সুদীর্ঘ ও উপাদেয় সন্দর্ভ লিখিয়া গিয়াছেন। *

এসিয়াটীক সোসাইটীর যত্নে রাজতরঙ্গিণী দেবনাগর অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। সোসাইটী সাধারণের সুবিধার জন্য সমগ্র গ্রন্থ তিন ও চারি টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তক সোসাইটীতে আর সুপ্রাপ্য নহে। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে "দেশীয় রাজা ও জমিদারদিগের ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ ঘোষ রাজতরঙ্গিণীর মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা লোকনাথ বাবুর সাধু সঙ্কল্পের জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ঈশ্বর লোকনাথ বাবুর অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন। রাজতরঙ্গিণীর এক এক খণ্ড বঙ্গবাসীদিগের গৃহে গৃহে রক্ষিত হউক ইহাই আমাদের অভিলাষ। কিন্তু আমাদের এই অভিলাস পূর্ণ হইবে কি? যে দেশে "লণ্ডন রহস্যের" সহস্র সহস্র গ্রাহক, সেই দেশে রাজতরঙ্গিণীর আদর হইবে কি? বঙ্গবাসী অধঃপাতে যাইও না। একবার তোমরা মূল্য হীন কাচ পরিত্যাগ করিয়া মরকত মণির আদর কর। একবার তোমরা বিলাতি তামা মিশান সোনা পরিত্যাগ করিয়া দেশী স্বর্ণকারের খাটী সোনা গ্রহণ কর।

এক্ষণে আমরা কহ্লণকৃত রাজতরঙ্গিণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কহ্লণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিক বৃন্দ ও স্বীয় গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

* * * *
* * * *

পণ্ডিত প্রবর কহ্লণ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহ দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগ্রহ করেন নাই। তাহার পূর্ব্বেও কাশ্মীরে কয়েক জন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কহ্লণ সেই সকল ঐতিহাসিকদিগের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-গ্রন্থ ও প্রাচীন শাসন পত্রাদি অবলম্বন করিয়া কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

কাশ্মীরের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে "কাশ্মীর উপত্যকা রূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে একটী হ্রদ ছিল। তাহার নাম সতী সরোবর। বর্ত্তমান কল্পারম্ভে মরীচি পুত্র, প্রজাস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের "সাহায্যে ঐ সতী সরের অভ্যন্তরস্থিত জলোদ্ভব প্রদেশ আঘাত করিয়া ঐ হ্রদ হইতে প্রথমে কাশ্মীর প্রদেশ সৃজন করেন।"

মহাভারতে হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জলোদ্ভব প্রদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। খ্যাত নামা ভৌগোলিক পণ্ডিত মেজর রেনেল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন।

So far am I from doubting the tradition respecting the existence of the Lake that covered Cashmere; that appearances alone would serve to convince me, without either the tradition or the history." †

ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত কাশ্মীরের ন্যায় ভারতের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে ও পর্ব্বত মধ্যস্থিত হ্রদ হইতে এইরূপ একটী মনোহর উপত্যকা প্রদেশ গঠিত হইয়াছে। সেই সরোবরের নাম "লগতাক" ও তদুদ্ভূত প্রদেশ 'মিতাইলেইপাক"; মানচিত্রে এই

* A. R. Vol. XV.

† Memior of a map of Hindoostan or the mogal Empire, by Rennell. page 107.

উপত্যকা "মণিপুর" আখ্যা দ্বারা চিত্রিত। কিন্তু আমরা ইহাকে "জাল মণিপুর" বলিয়া থাকি।

মহর্ষি কশ্যপ কাশ্মীরের প্রথম নিবাসী। পৌরাণিক মতে কশ্যপ হইতে দেব, দানব, মানব ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর উৎপত্তি। এমতাবস্থায় কাশ্মীরকে আর্য্যজাতির সূতিকা গৃহ বলিতে পারা যায় কি?

নাগরাজ নীল কাশ্মীরের প্রথম শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু কাশ্মীর রাজশ্রেণীর শীর্ষদেশে আমরা গোনার্দ্দের নাম দেখিতে পাই। ‡ ইনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু জরাসন্ধের প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। জরাসন্ধ যৎকালে মথুরা অবরোধ করেন, সেই সময় গোনার্দ্দ সসৈন্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে কৃষ্ণের হস্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বলা বাহুল্য যে এই সময়ে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই সময় সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের মতে সপ্তর্ষি মণ্ডল এক হইতে অন্য নক্ষত্রে গমন করিতে এক শতাব্দী অতীত হয়। সুতরাং তদনুসারে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ২৫২৬ পূর্ব্ব শকাব্দে বা বর্ত্তমান সময় হইতে (২৫২৬+১৮০৫=) ৪৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৬৫৩ কলি গতাব্দে যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সমসাময়িক গোনর্দ্দ জীবিত ছিলেন।

গোনার্দ্দের পর তাঁহার পুত্র দামোদর সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য শাসন কালে একটী স্বয়ম্বর উপলক্ষে যদুবংশীয়গণ গান্ধার রাজ্যে গমন করিতেছিলেন। দামোদর পিতৃ শত্রুকে নিকটে পাইয়া আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমেই স্বয়ম্বর প্রার্থী কন্যার প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের চক্র দামোদরের রুধির পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। দামোদরের মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্ঞী যশোবতী অন্তঃসত্বা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজপত্নীকে কাশ্মীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার গর্ভে দ্বিতীয় গোনার্দ্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজার শৈশবাবস্থায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল। কহ্লণ বলেন শিশু বলিয়া কোন পক্ষই এই বিষমসমরে কাশ্মীর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

দ্বিতীয় গোনার্দ্দের পর ৩৫ জন রাজার নাম বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। কোন হিন্দু ঐতিহাসিক তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারেন নাই। †

তৎপর লব, তৎপর তাঁহার পুত্র কুশেশয়, তাহার পর তৎপুত্র খগেন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন। খগেন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার শাসনকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি সর্ব্ব প্রথম কাশ্মীরে প্রতিভাসিত হইয়াছিল।

মহারাজ সুরেন্দ্র, শাক্যসিংহের বহুকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শাসনকালে কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, পণ্ডিত প্রবর উইলসন এই অংশটী গোপন করিয়াছেন। কিন্তু কহ্লণ স্পষ্টাক্ষরে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা গোপন করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে ভারতে প্রচা-

‡ গোনার্দ্দের পূর্ব্বে ৫২ জন নরপতি কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের নাম সুপ্রাপ্য নহে।

† মুসলমান ইতিহাস এস্থলে ২৫ জন রাজার নাম প্রকাশ করিয়াছে।

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

আজি কালি কোন কোন পত্রিকায় ও লোকের কথাবার্ত্তায় সময় সময় আমাদি[illegible]র দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলাফলে আলোচনা হইতে দেখা যায়, আর সেই [illegible]য় কেহ কেহ বলেন যে আমাদিগের পুরাতন যে সভ্যতা এতদিন ধরিয়া আমাদিগের সমাজে অধিষ্ঠিত ছিল ও এখনও আছে সেই সভ্যতাই আমাদিগের জীবনের পথ প্রদর্শক হওয়া শ্রেয়ঃ, সেই সভ্যতা অনুসারেই আমাদিগের চলা উচিত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদিগের বিশেষ কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ বলা কত দূর যুক্তি সঙ্গত, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদিগের প[illegible] তাহা[illegible]

দিয়া বিদেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিব, এইরূপে তর্ক করিবার সময় [illegible]ক্ত বৃত্তি আসিয়া আমাদিগের জ্ঞান বৃত্তিকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাইতে পারে, আমাদিগের স্থির ও প্রশান্তচিত্তে হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিতে পারে। অতএব স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির প্রকৃতি কি, কি কি প্রকারে উহার উন্নতি আর কি কি প্রকারে উহার অবনতি হইতে পারে তাহাই মাত্র এখানে আলো[illegible] কা[illegible]তেছি। আমার বিশ্বাস এ বিষ[illegible] [illegible]য় [illegible]

পণে চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপ অনুরাগকে প্রকৃত পক্ষে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বলা যাইতে পারে।

এইরূপ অনুরাগের উৎপত্তি কোথা হইতে? যে কারণে আমরা পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসি, আমাদিগের স্বজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকেও আমরা প্রথমতঃ অনেকাংশে সেই কারণে ভাল বাসি। যাহা কিছু আমাদিগের সদৃশ তাহা আমরা ভাল বাসি; আর যাহা কিছু আমরা অনেক দিন ধরিয়া দেখিয়া আসি, যাহা কিছুর সহিত আমরা অনেক দিন ধরিয়া পরিচিত, তাহা যদি আমাদিগের কষ্টকর না হয়, তাহা যদি আমাদিগের পক্ষে অব্যবহিত ভাবে সুখকর না হইয়াও শুদ্ধ কেবল ক[illegible] কর [illegible] য়, তাহা হইলেও [illegible] [illegible] [illegible]সার পাত্র হইয়া [illegible]

একসঙ্গে আহার, ভ্রমণ, এক সঙ্গে উপবেশন ইত্যাদি কার্য্য করিয়া, অনেক দিন ধরিয়া একরূপ সুখ দুঃখ, একরূপ আশা নিরাশা একরূপ উৎসাহ নিরুৎসাহ ইত্যাদি ভাব অনুভব করিয়া, উহাঁদিগকে ভালবাসিয়া ফেলি। তাঁহাদের উদ্দেশে আমাদিগের ম[illegible] এক একটী বন্ধনী, এক একটী অনুভূতি[illegible]র গঠিত হইতে থাকে, পরে ঐ সকল বন্ধ[illegible]য় শক্তিতে আমরা উহাঁদিগের দিকে আকৃষ্ট হই. ঐ সকল তারের সংযোগে উহাঁদিগের হৃদয়ের সহিত আমাদিগের হৃদয় এক তানে বাজিয়া উঠে। এই ত গেল আমাদিগের বিবিধপ্রকার পারিবারিক অনুরাগের সাধারণ উৎপত্তি; স্বজাতির প্রতি অনুরাগের প্রথম উৎপত্তিও ঐরূপ। কয়েক পরিবার মিলিত হইয়া একটী সমাজ স্থাপন করে; তাহাদিগের জন সংখ্যা প্রথমতঃ এত অল্প যে তাহারা স্বকীয় পরিবারের অন্ত-[illegible]ল বাসে [illegible]র্গত

প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একবার মানুষের মনে কতকগুলি ঘটনার দ্বারা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তি গঠিত হইতে দেও, পরে ঐ বৃত্তি মানুষের মধ্যে এক পুরুষ হইতে তাহার পর-পুরুষে আবার তাহা হইতে তাহার পরপুরুষে এইরূপ ক্রমনিয়মে নীত হইবে। বিশেষ বিশেষ প্রকার খাদ্য দ্রব্য ভোজন করা আমাদিগের পক্ষে যেমন অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হইয়া পড়ে, স্বজাতির প্রতি অনুরাগও তেমনই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হইয়া পরে আমাদিগের সমাজের আচার ব্যবহার অনেক প্রকারে এই অনুরাগের স্ফূর্তি সাধন করে। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুরাগ আর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ এই উভয়ে (উৎপত্তি বিষয়ে) অনেক সাদৃশ্য আছে; এখন দেখা যাউক এই উভয়ে কোন বিভেদ আছে কি না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সংখ্যা কম আর স্বজাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা [illegible] সর্ব্বপক্ষে বলিয়া উহা সহজেই কার্য্যকর হয় আর স্বজাতির প্রতি অনুরাগ মাত্রায় অল্প বলিয়া উহা কার্য্যে পরিণত হইতে সময় লাগে। আমার ভ্রাতার কষ্ট দূর করিতে আমি যত শীঘ্র যত্নবান্ হই, যাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই এরূপ কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির কষ্ট দূর করিতে আমি তত শীঘ্র যত্নবান্ হই না। কিন্তু স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইতে যেরূপ সময় চাই, সেইরূপ আবার ঐ বৃত্তি একবার উত্তেজিত হইলে পারিবারিকাদি অন্যান্য সমুদয় অনুরাগ বৃত্তিই উহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে; যে কার্য্যের নিমিত্ত উক্ত বৃত্তি উত্তেজিত হয় সে কার্য্যের পরিণাম না দেখিতে পাইলে আর উহার নিরাত্ত হয় না।

কোন জাতি যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগও তেমনই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য

সে ব্যক্তি এখন আসিয়া হঠাৎ উহাকে দেখিয়া হয়ত চিনিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বৃক্ষটীকে ঐ পনর বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে সে ব্যক্তির নিকট উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে বিভেদ প্রতীত হইলেও ব্যবধান প্রতীত না হইতে পারে, উক্ত দুই অবস্থার মধ্যে একটী এ পারে আর অপরটী ওপারে এরূপ প্রতীত না হইতে পারে। ঐ ব্যক্তির সম্মুখে বৃক্ষটী নিঃশব্দে এক অবস্থা হইতে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় আর তাহা হইতে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় ক্রমে ক্রমে অবস্থান্তরে প্রবেশ করিয়াছে; অবস্থাগুলির শ্রেণী জলের স্রোতের ন্যায়, মুক্তার হারের ন্যায় নহে—অর্থাৎ তাহাদিগের একটী ও তাহার ঠিক পরবর্ত্তী বা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তীটীর মধ্যে কোন ব্যবধান লক্ষিত হয় না। জাতির বৃদ্ধিও এইরূপে ক্রমে ক্রমে অলক্ষিত ভাবে ঘটিয়া থাকে, কোন জাতি অনেক সময় নূতন কোন অবস্থায় প্রবেশ ... ... ধমধাম, মহা গোলা থাপি উহাদিগের মধ্যে অনেক বিভেদ আছে; জাতির এই তিন অবস্থার উপযোগী স্বজাতির প্রতি অনুরাগেরও তিনটী অবস্থা আছে। জাতির উক্ত তিন অবস্থারই বা কি কি প্রকৃতি আর স্বজাতির প্রতি অনুরাগেরই বা উক্ত তিন অবস্থার কি কি প্রকৃতি তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

অসভ্য অবস্থায় লোকে জীবনের গতি- ...ধিকাংশে স্ব স্ব বুদ্ধি ও ইচ্ছা দ্বারাই নির্ণয় করিয়া থাকে, সামাজিক নিয়ম গুলি তখনও লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই—তাহাদিগের সংখ্যা অল্প ও প্রকৃতি সরল। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাহার অধীনস্থ জাতির বাহিক ঘটনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আভ্যন্তরিক ঘটনাগুলির প্রতি তত মনোযোগ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার অধীনস্থ জাতিকে যাহাতে অন্যান্য জাতি আসিয়া পরাভূত করিতে না পারে, তাহার ... জাতি যাহাতে অন্যান্য

থাকে, অর্থাৎ জাতির মধ্য হইতে কোন এক জন প্রধান ব্যক্তি তাহার নিজের ইচ্ছানুসারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; স্বেচ্ছাচারী শব্দে এস্থলে এমন বুঝাইবে না যে ঐ ব্যক্তি অবশ্যই তাহার জাতির উপর অত্যাচার করিবে। কোন কোন সময় ঐ ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অতিভয়ানক অত্যাচার করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া সে কখনও সমুদয় জাতির প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না। অসভ্য অবস্থায় লোকের মনে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ জাগরূক দেখা যায়, কিন্তু সে অনুরাগ লোকের তখন-কার অন্যান্য মানসিক বৃত্তির ন্যায় বিকাশ সোপানের অতি নিম্ন ধাপে অবস্থিত, সে অনুরাগ তখনও বহুদর্শী হয় নাই, সে অনুরাগ তখনও দূরবর্ত্তী অতীত ও দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বর্ত্তমানে পদবিক্ষেপ করিতে শিখে নাই, সে অনুরাগ তখনও সা°

এখন ক ত

...ইয়া প্রকাশ্য ভাবেই হউক আর অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক তাঁহাদিগের শ্রোতা বা পাঠকগণের হৃদয় নিহিত এই অনুরাগ বৃত্তিতে আঘাত করিয়া তাহা হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে এইরূপ আচার ব্যবহার এত দিন চলিয়া আসিয়াছে, আমরা কেন আপনাদিগের আচার ব্যবহার ছাড়িয়া

সে জলাশয়ের নিমিত্ত তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের অধিপতি যদি তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রদান করেন, কিম্বা তাহাদিগের মধ্যে সবল পুরুষদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে তাহারা তন্নিমিত্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারে, তথাপি তাহারা সকলে মিলিয়া ঐরূপ স্বেচ্ছাচারের নিরাকরণে সচেষ্ট হইবে না। অসভ্য অবস্থার প্রকৃতি সংক্ষেপে সূচিত হইল এখন সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থায় সমাজ অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট নি[illegible] দ্বারা চালিত হয়; যে জলে সোরা ভি[illegible]ন আছে সে জল জ্বাল দিলে যেমন সে[illegible]ার বিন্দুগুলি জলের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়া[illegible] অবশেষে ক্রমে ক্রমে পরস্পরের পাশে [illegible]সিয়া অবস্থিতি করে ও একটী বিশেষ আ[illegible] অবলম্বন

[illegible] অন্তর্গত, সে জা[illegible] ত আমার কিছু না কিছু অনুরাগ আছে, সে জাতির দুঃখে আমার দুঃখ হয়, সে জাতির সুখে আমি সুখী হই; সে জাতির উন্নতি দেখিলে আমিও আপনাকে উন্নত মনে করি, সে জাতির অবনতি দেখিলে আমিও আপনাকে অধোপ্রাপ্ত মনে করিয়া মস্তক অবনত করি। সাধ্যাতীত না হইলে আমি সে জাতির উন্নতি-সাধন করিতে যথা সাধ্য আয়াস স্বীকার করিতে পারি, সে জাতিকে অবনতি জনিত দারুণ মনোবেদনা হইতে উদ্ধার করিতে প্রাণ-

ভিন্ন বিষয়গুলি পরস্পরের পার্শ্বে সাম্য-ভাবে সজ্জিত হইয়া সমাজকে একটী বহু-অঙ্গবিশিষ্ট দেহাকারে পরিণত করে। সমা-জের গতিবিধি এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সমাজের অন্ত-র্গত লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনেক হ্রাস হয়, এক্ষণে আর সমাজের লোকে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে না, অর্থাৎ এমন কোন কার্য্য করিতে পারে না যাহাতে সমাজের কোন প্রধান নিয়মভঙ্গ করা হয়, যাহাতে সমাজে সাধারণের কোন অপকার হয়। লোকে এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছে, এক্ষণে সংসারের ঘটনাগুলিকে প্রশস্ত দৃষ্টিতে দেখিতে শি[illegible]ছে, বিশেষ বস্তু হইতে সামান্য বস্তু বি[illegible] করিতে শিখি-য়াছে। এরূপ অবস্থায় স্বজাতির প্রতি অনুরাগবৃত্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য [illegible]ক সুখদুঃখের সহিত আর তত অব্য[illegible]ত ভাবে সম্বদ্ধ [illegible] সুখ[illegible]এর প্রতিমূর্ত্তিবৎ [illegible]র সহি[illegible] আমাদিগের [illegible] ধান প্রধান সাদৃশ্য রহিয়াছে, [illegible] বস্তু আমাদিগের পক্ষে কষ্টকর না হইলে আমা-দিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে; আবার যদি সে বস্তু হইতে আমরা অনেক সময় অনেক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, তবে তাহা আমাদিগের আরও অধিক প্রিয়পাত্র হয়। এইরূপে সাধারণতঃ আমরা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে ভালবাসি, তাঁহাদের সহিত আমাদিগের শ-রীর ও মনোগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাঁহাদের সহিত আমরা অনেক দিন ধরিয়া

রাজকার্য্যে বিপ্লব ঘটিবার চিহ্ন। আবার ইংলণ্ডের কোন গবর্ণমেন্ট যদি সে দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি হস্তনিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সে গবর্ণমেন্টের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে; সমুদায় ইংরেজজাতি সে গবর্ণমে-ন্টের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে, ইহার কারণ এই যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার হ্রাস গবর্ণমেন্টের স্বেচ্ছাচারিত্বের চিহ্ন। সম্পূর্ণ সভ্য অব-স্থায় লোকে তাহাদিগের রাজকীয় কার্য্য নিজে নিজেই সমাধা করিতে পারে, কোন বিশেষ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না; সাধারণ তন্ত্রই সম্পূর্ণ সভ্য অবস্থার গবর্ণ-মেন্ট। অসভ্য ও সম্পূর্ণ সভ্য এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী (অর্দ্ধসভ্য) অবস্থায় অসভ্য অবস্থার ন্যায় গবর্ণমেন্ট একজন নৃপতির হস্তে থাকে, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছায় সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না, মন্ত্রীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূ-পণ করেন। অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় স্বজাতি[illegible] [illegible] ভা[illegible] [illegible]।

স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত হয়। সমাজের আয়তন ক্রমে ক্রমে যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কয়েকটী পরিবারের অন্ত-র্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি উল্লিখিত ভালবাসাও তেমনই স্বজাতির প্রতি অনুরাগে পরিণত হইতে থাকে। মানুষের মন সমুদয়ই কিম্বা কোন কোন অংশেই হউক ঘটনা দ্বারা গঠিত হয়, ঘট-নার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষের মন বিকাশ

রাগ এই দুয়ে আর একটী প্রধান বিভেদ এই দেখা যায়; পূর্ব্ব দুই অবস্থায় কোন জাতির মধ্যে যাহারা স্বজাতি হিতৈষী তাঁহারা সকলেই প্রায় স্বজাতির সুখকামনায় ও দুঃখ নিরাকরণেরউদ্দেশ্যে অব্যবহিত কার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা দুর্ব্বল পক্ষের প্রতি প্রবল পক্ষের অত্যাচার নিবারণ, কেহ কেহ বা কুপ্রথা দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুপ্রথা প্রবর্ত্তন, কেহ কেহ বা বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্যে স্বদেশের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করণ, ইত্যাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন; কিন্তু সভ্য অবস্থায় স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলেরই স্বজাতির অবস্থা উন্নত করিবার ইচ্ছা থাকিয়াও কেহ কেহ বা তাঁহাদিগের জাতির অন্তর্গত লোকদিগের সুখ সংঘটন ও দুঃখ নিরাকরণের নিমিত্ত অব্যবহিত ভাবে কার্য্য করেন আর কেহ কেহবা সে রূপ না করিয়া যে সকল কার্য্য অব্যবহিত ভাবে নহে কিন্তু পরিণামে দেশের সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাসকর সেই সকল কার্য্য করেন—যেমন কেহ কেহ বা মানব প্রকৃতির—কেহ কেহ বা সামাজিক ঘটনা সমূহের কার্য্য কারণ অনুসন্ধানে ও নিয়মাবলী নিরূপণে ব্যাপৃত থাকেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
(বি এস্ সি, লণ্ডন)

জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

সাবিক

as mine, to draw another prize in the lottery of life: Whoever, either now or here after, may think of me and of the work I have done, must never forget that it is the product not of one intellect and conscience, but of three:"

মিল তাঁহার জীবনে তিনটি বিশেষ বন্ধু পান, প্রথম তাঁহার অদ্বিতীয় পিতা, দ্বিতীয় তাঁহার প্রাণাধিক স্ত্রী, তৃতীয় তাঁহার স্নেহের ধন এই কন্যাটি। এই সময়ে মিল গুটিকত রচনা করেন তন্মধ্যে দার্শনিক বেনের "Treatise on the mind" নামক প্রবন্ধের সমালোচনাটি প্রসিদ্ধ। ১৮৬০ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মিলের দুই খানি খ্যাত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানির নাম "Considerations of Representative Government" ও অপরখানির নাম "The subjection of women" প্রথম ...র বিষয় পিতৃবন্ধু "বেন্থাম" ব্য-... বিত থাকিতেন ও মিল তাঁহার সমস্ত মতগুলিই সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই পুস্তক খানি অধিকতর মূল্যবান হইত সন্দেহ নাই। কিয়দ্দিবস পরেই মিলের অপর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, গ্রন্থ খানির নাম "Utilitarianism." বলা বাহুল্য যে এ গ্রন্থ খানিতেও তাঁহার স্ত্রীর অধিকার ছিল।

ইতি মধ্যে দাস ব্যবসার লইয়া আমেরিকা খণ্ডে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, দাস ব্যবসায় যে একটি অতি দূষনীয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহা আর কাহারো নিকট অবিদিত নাই, মনুষ্য স্বজাতিকে ধরিয়া বিক্রয় করিবে ইহাপেক্ষা নীচতর কার্য্য আর কি হইতে পারে? এমন কি এ দুষ্ট প্রথা এখন পর্য্যন্তও জগতে অনেক স্থলে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাস ব্যবসায় যাহাতে একেবারে নির্ম্মূল হয় সে বিষয়ে অনেকানেক মহদন্তঃকরণ বিশিষ্ট প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

শ্চিৎ দোষী ছিলেন তাহা ইংলণ্ডের সক‍
একবাক্যে বলিয়াছিলেন, মিলও তাঁহাদের সহিত সমমতাবলম্বী হন। অনন্তর আমেরিকগণ নিজ দোষ স্বীকার ও তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সমস্ত বিরোধের নিবৃত্তি হইল। তৎপরে মিল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "ফ্রেসার্স ম্যাগেজিনে "The Contest in America" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকা করেন। এই সময়েই মিল "সার্ উইলিয় হ্যামিল্টন্" প্রণীত "দর্শন" পাঠ করে তিনি এই গ্রন্থখানি মারাত্মক দোষে বলিয়া বিবেচনা করেন ও তাহার

ভ্র
হ
৯

মনের অনু .. ংখ্যক ব্যক্তি দিগের মধ্যে বিভক্ত হয় সেইরূপ আবার প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অনুরাগের মাত্রাও অধিক হয়, পরপক্ষে মনের অনুরাগ যেমন অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিভক্ত হয় সেইরূপ আবার প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে যে অনুরাগ পড়ে তাহা মাত্রাতে অল্প হয়। আমি আমার ভ্রাতা কি ভগিনীকে যত ভাল বাসি, আমি আমার স্বজাতীয় ব্যক্তিমাত্রকেই তত ভালবাসি না; পারিবারিক অনুরাগ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মাত্রায় অধিক

দ্ধিও যেমন এক ক্রমগামী অবিভক্ত স্রোতাকারে ঘটিয়া থকে, জাতি ও তাহার সহিত স্বজাতির প্রতি অনুরাগের বৃদ্ধিও সেই রূপে ঘটে। কোন বৃক্ষ এখন যেরূপ ফল পুষ্প বিশিষ্ট আছে, পনর বৎসর পূর্ব্বে যখন উহা ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া আকাশের দিকে উহার ক্ষুদ্র মস্তক উত্তোলন করিতেছিল তখন উহার আর এক ভিন্ন অবস্থা ছিল; এই দুই অবস্থার মধ্যে বিভেদ এত অধিক, ব্যবধান এত প্রশস্ত যে, যে ব্যক্তি পনর বৎসর পূর্ব্বে ঐ বৃক্ষ দেখিয়া গিয়াছে

যেন তারে জন্মান্তরে
দেখিছি স্বপন ঘোরে
সে মাধুরী আজো তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা রয়েছে

*　　*　　*　　*　　*

তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি
ওই বটে সেই জন
সেই মোর স্বপ্ন ধন
জন্ম জন্ম যারে আমি প্রাণে ভাল বেসেছি

"কোন পরিচিতের মৃত্যু ঘটনাতে"

"জানি আমি এ জীবন অনিত্য, হরিষ !—
জানিয়াও জানিত না এ পোড়া হৃদয় ;
নিরাশা-যন্ত্রণানলে জ্বলিয়া আবার
ভাসিতাম কুতূহলে সুখসিন্ধু নীরে ;
দেখিতাম কত ফুল—কত পত্রদল—
অবিরত ধীরে ধীরে ঝরিত কাননে,
ভাবিতাম পুনরায় ফুটিবে কুসুম—
পুনরায় নবপত্র সাজাবে তরুরে ;
কিন্তু না হইত মনে ভ্রমেও কখন—
একবার যে কুসুম—যেই পত্রদল—[illegible]
ভূতলে ঝরিয়া পড়ে, সে না[illegible] সুধাকর,
শোভে তরুপরে, কোথা যে শুকায়ে যায়
পড়িয়া ভূতলে, হায়, কে বলিতে পারে ?"
ইত্যাদি।

"সুখচর"।

"মধুর বসন্ত-নিশি—প্রভাত মধুর—
মধুর ঘুমের ঘোরে পশিত শ্রবণে
অস্ফুট বিহঙ্গ-কুল-কাকলি লহরী
বাতায়ন সন্নিহিত শাখাদল হ'তে,
মাঝে মাঝে সকরুণ "বউ কথা কও" !—
"বউ কথা কও" রবে ব্যথিত হৃদয় ;
ভাবিতাম এতকি রে বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা—
এত যদি বাজে প্রাণে, তবে কি কারণ—
মিছা দোষে মিছা ভ্রমে মানেতে মজিয়ে,
প্রিয় জনে প্রিয়জন দেয় এ যাতনা !
শুনিতাম সুখে শুয়ে এ সকল রব
নীরব সময়ে সেই ;—প্রভাত সমীর—
গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গ নির্জ্জন পুলিনে—
অনিবার সেই ধ্বনি স্বপনের মত—
ধীরে ধীরে প্রবেশিত শ্রবণ কুহরে ॥"

ঐ

"কাননের পাখী ও যে থাকিত কাননে—
কাননে যাহার বাস,
কাননে যাহার আশ,—
কানন-সুষমা যার সতত নয়নে
ভাসিতেছে নানা বর্ণে—
ফুলে ফুলে শ্যাম পর্ণে—
কানন-সঙ্গীত যার সতত শ্রবণে।
এ হেন বনের পাখী
পিঞ্জরে বাঁধিয়ে রাখি
কেন এ যাতনা তারে দিবে অকারণে ;—
দাও পাখী ছেড়ে দাও থাকুক কাননে।
[illegible]র কাননে গিয়া
নিরখিবে প্রাণ প্রিয়া—
নরখিবে আর যত বিহঙ্গ সুন্দর ;—
চিত্ত পুলকিত হ'লে,
সঙ্গীত বর্ষিবে সবে,
সবে মিলি বনমাঝে গা'বে নিরন্তর ;
ছেড়ে দাও বিহঙ্গেরে—বড় সে কাতর !"

কালবৃক্ষ।

"থাকিয়া থাকিয়া ঝরিতেছে পাতা,
শ্বসিয়া শ্বসিয়া বহিছে বায়ু ;
কাল হ'তে পল পড়িছে খসিয়া,
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু।

২

সকলি যেতেছে—[illegible]র—
এ জগত মাঝে [illegible]
আশার আ[illegible] বেদনা—
ধূলাতে [illegible]শার দেহ।

এই যে তখন [illegible] প্রভাতে,
রঞ্জিয়া গগন অপূর্ব্ব রাগে,

উঠিল তপন—সোনার বরণ,—
সে চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে।

৪

কোথা গেল উষার সুষমা এখন,
কোথা সে ললিত লোহিত আভা,
দেখনা ভুবন ভরিছে আঁধারে—
নিশিতে বিলীন হ'তেছে দিবা।

৫

এই যে সে দিন হৃদয় মাঝারে
রোপিলে যতনে আশার তরু,
না ফলিতে ফল শুকাল পাদপ,
সে হৃদি এখন হইল মরু।

৬

এই ... সে দিন খোদিলে কাননে
সুন্দর সরসী ... সলিলে ভরা,
নিদাঘ আইল—শুষ্ক ... সলিল—
নীরস হইল সরস ধরা।

৭

ভালবেসে তারে প্রাণেরো অধিক
সুখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ,
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে—
এ হৃদি করিয়ে চির শ্মশান।"

জনসমাজে গোপাল বাবুর পুস্তক খানির সমুচিত আদর হইলে সুখী হইব।

ভগ্ন-আশা। শ্রীতপাহ দোল হোসেন প্রণীত। এখানি পদ্য। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দেখিলেই জ্ঞাত হওয়া যায় যে ইনি মুসলমান ... মুসলমান হইয়া বঙ্গ ভাষার প্র... ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে ... গ্রন্থখানি পাঠে কোন স্থল বিদেশ... ... লিয়া বোধ হয় না, ও স্থানে ... ...ার আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে ... ... উদ্ধৃত করিলাম।

পরিবর্ত্তনীয় প্রিয়ে এই ভূমণ্ডল
ভেবেছিনু, তুমি আমি নহিগো কেবল;
এখন দেখিতে পাই, মম সে সিদ্ধান্ত নাই,
নিত্য নবরূপী তব হৃদয় আগার,
নহে স্থির ক্ষণস্থায়ী প্রণয় তোমার।
মনে কি পড়েগো প্রিয়ে সেই একদিন!
সেই সরোবর আর সেই যে পুলিন!
বসি সেই তরুতলে, সাজিয়ে কুসুমদলে,
উল্লাসে দেখিতে ছিলে প্রফুল্লিত মনে,
বিমল সে মুখ-চাঁদ সলিল-দর্পনে!

ইত্যাদি।

কবিতাপাঠ,—প্রথমভাগ, মূল্য ৵০ আনা মাত্র. শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও সংগৃহিত। এ পুস্তকখানি বালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত রচিত হইয়াছে; ইহাতে 'করিমউদ্দিন, ডুগ্‌ডুগে খেলা' ভারতেশ্বরী, প্রভৃতি গুটি কতক ছন্দে গ্রথিত ...ক্তি আছে। এরূপ কবিতা বালক-বা... ...দিগের উপযোগী কি না তাহা শিক্ষা... ...র্ত্তৃপক্ষগণই বিচার করিতে পারেন—হবা আমাদের অসাধ্য।

বঙ্গ গৃহ। শ্রীসীতানাথ নন্দী প্রণীত। এই উপন্যাস খানি সত্যই যদি আধুনিক বঙ্গ গৃহের ছবি হয় তবে বঙ্গের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল! বঙ্গ রসাতলে ডুবিয়াছে! সুখের বিষয় এই ইহা সাধারণ বঙ্গ গৃহের ছবি নহে, বঙ্গের একটি অতি সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়কে লইয়া এই পুস্তক খানি রচিত।

যাহাই হউক, বাঙ্গালার একটি সম্প্রদায়ের একটি ঘরেও এরূপ অস্বাভাবিক, ঘোর কলঙ্কময় বিদেশী ভাবের বিদেশী প্রাণের কারবার দেখিলে আমাদের আশা ভরসা লোপ পায়।

সেন রাজগণ।

(বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায়।)

সেন রাজগণ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহা স্থিররূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। বরেন্দ্র প্রদেশে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপির মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশটী পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে বাস করিতেন। তথা হইতে আসিয়া বিজয়সেন সর্ব্বপ্রথম গৌড় জয় করেন।

উক্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—মহাদেবের সুবর্ণসদৃশ জটামণ্ডল যাঁহার সিংহাসন, গঙ্গাজলকণা দ্বারা যাঁহার চামর ব্যজন কার্য্য সম্পাদিত হয়, শিবশিরোভূষণ ফণীরাজের ফণা যাঁহার শ্বেতছত্র, যিনি সুধাকর, যাঁহার সন্দর্শনে সমুদ্র ও চকোর আনন্দে উল্লসিত হয়, যিনি কামদেবের যশের পুনঃপ্রকাশকারী, সেই চন্দ্রই সেন রাজবংশের আদি পিতা।

সুন্দরবন ও তর্পণদীঘির তাম্রফলকে এই চন্দ্রের গুণানুবাদ এবং "ওষধিনাথ" চন্দ্র হইতেই সেন বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, "পৃথিবীকে স্ফটিক পর্ব্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, সমুদ্রকে মুক্তাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, নভস্থলকে স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্‌কামিনীদিগকে চিরপরিচিতার ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত করিয়া কামদেবের যশের পুনঃপ্রকাশকারী চন্দ্র প্রকাশিত হউন।"

এই চন্দ্র হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীর ভারগ্রহণ করিয়া বাসুকীকে বিশ্রাম-সুখ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। তাঁহারা অদ্বিতীয়পরাক্রমশালী ছিলেন। এই বংশ হইতেই সেনবংশের উৎপত্তি।

প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। ১ পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারগ্রন্থে সেনরাজগণকে "সোম বংশস্তব" লেখা হইয়াছে। ২

রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়াছে, সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রযুক্ত মধুশ্রাবী ইতিহাস জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জন মানসে পরাশরপুত্র ব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ৩

১ Taranath's Vassilief's work on Buddhism. Translated by Miss Lyall.

২ Indo-Aryans, Vol. 11. P. 266.

৩ বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণী দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।

এই বীরসেন যে কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। বলিলে তাঁহাকে ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তীও বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরাসনের সহিত গৌড়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।

সেই সেনবংশে (যে বংশে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে) শতশতবীরহন্তা ব্রহ্মপরায়ণ রাজা সামন্তসেন* জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়," দিগের কুলের "শিরোদাম" স্বরূপ ছিলেন। ইনি কর্ণাট-শ্রী-লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় শব্দটী লইয়া একটী কোলাহল উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ "মহৎ বা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়" ৪ অনুমোদন করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে "ব্রহ্মক্ষত্রং" পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। টীকাকার ইহার অর্থ "ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ" লিখিয়াছেন।

১২৩৪ সম্বতের (১১৭৭ খৃঃ অঃ) পৌষ শুক্ল চতুর্থী দিবসে কনোজরাজ জয়চন্দ্র, রাও রাষ্ট্রধর নামক জনৈক ক্ষত্রিয়কে কয়েক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন পত্রে রাও রাষ্ট্রধরকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলা হইয়াছে। ৫

প্রস্তর ফলকে ও সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মবাদী" বলা হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে সামন্তসেনকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করাই প্রস্তর ফলকলেখকের অভিপ্রায় ছিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা কোন গ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হইতেছি না। টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ও করা যাইতে পারে।

এই সামন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হেমন্তসেন। হেমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সামন্তসেন দেব গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেন দেব একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার রাজ্ঞী পতির রত্নস্বরূপ একান্ত প্রিয়তমা, সতী, ব্রতপরায়ণা, যশস্বিনী, ত্রিভুবনমোহিনী ও সুকৃতিশালিনী ছিলেন। তাঁহার নাম যশোদেবী। রাজা হেমন্তসেনদেব শৈব ছিলেন।

মহাদেব ও দেবী হইতে উৎপন্ন কার্ত্তিকের ন্যায়, যশোদেবীর গর্ভে হেমন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। ইনিই বিজয় সেন। প্রস্তর ফলকে বিজয়সেনকে কপিসৈন্যনেতা রামচন্দ্র ও পাণ্ডবসেনাপতি ধনঞ্জয় হইতে শ্রেষ্ঠ বীর বলা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বিজয়সেনের, সংগ্রামক্ষেত্রে অদ্ভুত অসিচর্য্যা দর্শনে জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইত; তাঁহার খড়্গ নীলকমলসদৃশ হইয়াও

---

* সচ্চরিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ।
প্রস্তর লিপির চতুর্থ শ্লোক।

৪ Noblest Kshetriyas.

৫ Asiatic Researches. Vol. XV. page 450.

শত্রুগণের মর্ম্ম দলন করিত; নবজলধরের ন্যায় হইয়া অরাতিদিগের অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিত; ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও ভয় বিস্তার করিত। কজ্জলবৎ হইয়াও শত্রুদিগের যন্ত্রণা উৎপাদন করিত। তিনি সেই উজ্জ্বল খড়গ দ্বারা শত্রু নরপালদিগকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যসদৃশ ও ভুজদ্বয় প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় ছিল।

প্রস্তর ফলকের বিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে বিজয়সেন গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।৬

প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয়সেন এক বহর রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা রণতরী গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ দেশের রাজা বিজয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়াছিলেন, কবিবর উমাপতি তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে বিজয়সেনের রণতরী গঙ্গাবক্ষ বিলোড়ন করিয়া হিমালয়ের পদমূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল কি না ইহাই সন্দেহ স্থল। কবি উমাপতি একজন খ্যাত নামা অত্যুক্তিপ্রিয়। তাঁহার সকল কথা আমাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

বিজয়সেন যে গৌড় বিজয় করিয়াছিলেন ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। মিত্র মহোদয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয় ও তাঁহার পিতৃপিতামহকে গৌড় রাজা অবধারণ করিয়াছিলেন।৭ সুতরাং গৌড়ের রাজা কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বাক্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১৮৭৮খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় আত্মভ্রম কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে বিজয় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের রাজা ছিলেন। বিজয়সেন পালরাজকে জয় করিয়া গৌড় অধিকার করেন।৮ কিন্তু বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বঙ্গের রাজা ছিলেন তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। মিত্র মহোদয় কেবল অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রস্তর লিপি হইতে দেখাইয়াছি যে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণকে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" ও বিজয়সেনের পিতামহ সামন্তসেনকে কর্ণাটলুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদিগের দমনকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিজয় ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথনিবাসী ছিলেন।

৬ ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাঽন্যথা মননরূঢ় নিগূঢ় রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

৭ Journal Asiatic Society of Bengal. Vol. XXX. part 1. page. 130.

৮ J. A. S. B. Vol. XLVII. pt. 1. page. 400.

দক্ষিণাপথনিবাসী চোলরাজগণ এক সময়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভুজবলে এক সময় সমস্ত ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। চোলরাজকুলতিলক কুলতুঙ্গার শাসন পত্রে লিখিত আছে, এই রাজা বাঙ্গালা ও তদ্দেশাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন। ৯

মেকেঞ্জিসংগ্রহের ভূমিকায় বিজ্ঞবর উইলসন চোলারাজের বাঙ্গালা বিজয় বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ কথিত আছে যে চোলারাজ অর্ণবপোতারোহণে যাত্রা করিয়া কলিঙ্গ ও গৌড় জয় করিয়াছিলেন। ১০ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কয়েকখানা তাম্র-লিখিত গ্রন্থ [illegible] অবলম্বন করিয়া তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়া তাহার সত্যতা পোষণ করিতেছে।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল উৎপাটন করেন। চোলা রাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তী যে অনুগাঙ্গ প্রদেশে উড্ডীন হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লেখক বলেন যে বৈদ্যনাথের শিবমন্দির চোলারাজগণের নির্ম্মিত। ১১ মন্দির গিরির সানুদেশে জনৈক চোলা নরপতি যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া চোলারাজগণের বাঙ্গালায় আগমনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ডাক্তার বকনন বলেন যে চোলারাজ আদিত্যসেন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন। চোলা রাজদিগের যে কয়েকখানি বংশাবলী আমরা দর্শন করিয়াছি ১২ তাহার একখানাতেও আদিত্যসেন নামটী দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু মেকঞ্জি সাহেব "আদিত্য চোলা" নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন অতএব বোধ হয় বকনন তাঁহাকেই এই নামে পরিচিত করিয়াছেন। মহীসুরের ইতিহাসে ডাক্তর বকনন কুলতুঙ্গাকে "ত্রিভুবনচক্রবর্ত্তী" লিখিয়াছেন। যাহা হউক কোন কোন চোলানরপতি যে গঙ্গাসৈকতে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। চোলারাজদিগের মধ্যে কুলতুঙ্গা দুর্ব্বল ছিলেন এমত নহে। ডাক্তর বারনেল তাঁহাকে চোলা রাজবংশের

৯ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1876. page. 108.

১০ Mackenjee Collection. Vol. 1 page. LXXXV111.

কিন্তু উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে কুলতুঙ্গার পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলাকে বাঙ্গালা আক্রমণকারী লিখিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে জনৈক ভিন্ন দেশীয় রাজা কর্ত্তৃক জলপথে বাঙ্গালা আক্রমণের কথা কর্ণেল উইলফোর্ড ও লিখিয়া গিয়াছেন। (A. R. Vol IX. page 39.) দক্ষিণ দেশীয় কোন নরপতি দ্বারা যে একবার বাঙ্গালা বিজিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

১১ Eastern India. Vol. 11. p. 22.

১২ Journal Royal Asiatic Society Vol. V111. page 22, 23.

সর্ব্ব প্রধান নরপতি লিখিয়াছেন। ১৩ তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পালরাজগণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য শৈব নরপতি বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলা রাজগণ ভারতের ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া তাহাদের আত্মীয় ও অনুচরবর্গকে সেই সেই প্রদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করার কথা ডাক্তার বকনন লিখিয়া গিয়াছেন।"১৪

রাজসাহির প্রস্তরলিপি ও কুলতুঙ্গার শাসন পত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে বিজয়সেন চোলা রাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র। তিনি কুলতুঙ্গা দ্বারা গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয়সেন শিবোপাসক। সুতরাং শৈব নরপতি বৌদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জনৈক শৈব ব্যক্তিকে গৌড়ের রাজাসনে স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন বলিয়া সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই সময় যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালায় উপনীত হন,তাঁহারাই বোধ হয় বৈদিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নচেৎ দক্ষিণাপথনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালায় আসিবার আর কোন সূত্র ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয়"দাক্ষিণাত্য বৈদিক" গণ দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা তাঁহারা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন।

১৩ P. A. S. B. 1876. page 108.
১৪ Eastern India, Vol. II. p. 23.

আমরা বারম্বার যে প্রস্তর লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রস্তর ফলক রাজসাহির অন্তঃপাতি গোদাগাড়ি থানার অধীন দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী "বরিন্দা" নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে বেগবতী স্রোতস্বতী পদ্মা এই পরিত্যক্ত পল্লীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এক্ষণে পদ্মার প্রবল স্রোত এই স্থান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। একটী পুষ্করিণীর উপতটে প্রোক্ত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই জলাশয়ের মধ্যে পূর্ব্বে আরও ২১ খানা প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেস্থানে এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অনতিদূরে সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত এক মসজিদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রস্তর ফলকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহারাজ বিজয়সেন দেব একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যুম্নেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যুক্তিপ্রিয় কবি উমাপতি এই মন্দিরের বর্ণনা করিতে যাইয়া সমুদ্র, গগন, মেরু-পর্ব্বত, সূর্য্য, অগস্ত্য ও বিন্ধ্য পর্ব্বতকে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। মন্দিরের পরিধি সমুদ্রবেষ্টিত, তাহার মধ্য গগনতলসদৃশ পরিসর ও চতুর্দ্দিক বিস্তৃত। মন্দিরের চূড়া উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্ত্তী মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তৎপরে কবি সূর্য্যকে বলিতেছেন, তুমি অগস্ত্যকে নিরর্থক দক্ষিণদেশবাসী করিয়াছ। বিন্ধ্যপর্ব্বত যত শক্তি উচ্চ হউক

না কেন, এই মন্দিরের ন্যায় উচ্চ হইতে পারিবে না। এই মন্দিরের উচ্চ চূড়াই সূর্য্যরথের হরিতাশ্বের গতিরোধ করিল। বিধাতা সুমেরুতুল্য মৃত্তিকা দ্বারা পৃথিবী-তুল্য চক্রে এক ঘট প্রস্তুত করিলেও মন্দির শীর্ষস্থিত সুবর্ণকলসের তুল্য হইবে না। অ-ত্যুক্তিপ্রিয় কবিদিগের মধ্যে উমাপতির নাম শ্রীহর্ষের পরেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যাহা হউক বিজয়সেন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে,এই মন্দিরের প্রস্তর লইয়া হিন্দুকীর্ত্তিদ্রোহী মুসলমানেরা উল্লেখিত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই।

যে সময়ে বিজয়সেন গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (বা সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয় সমতটের রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। বোধ হয় এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদি শূরের কন্যাকুলসম্ভূত লিখিয়াছেন। সেন রাজগণের যে কয়েকখানি তাম্রশাসন আ-বিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমস্তেই লিখিত আছে যে অদ্বিতীয়কীর্ত্তিশালী, অধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, বেদমার্গাবলম্বী বল্লালসেন বিজয়সেন হ-ইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গর্ব্বিত শত্রুদিগকে নিধন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লালসেন দেব স্বীয় কার্য্য-কলাপ দ্বারা বঙ্গবাসীদিগের নিকট চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রজা-রঞ্জন দ্বারা যশস্বী হইয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্গবাসীগণ বিবিধ অলৌকিক ও বিস্ময়-জনক ঘটনাবলী রচনা করিয়া তাঁহার না-মের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদি-শূরের পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র, অন্য কেহ তাঁহাকে "বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র" ও আবুল ফাজেল তাঁহাকে সুকসেনের পুত্র লিখিয়াছেন।

দুই চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে বল্লালের পিতার দুই স্ত্রী ছিল। বল্লাল-পিতা কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া জনৈক উদাসীন দ্বারা এক যজ্ঞ করাইলেন। উদাসীন যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তাহার চরু রাণীকে প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি এই চরু আপনি রাজাকে খাওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনার চির আজ্ঞা-কারী হইবেন। কনিষ্ঠা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক দাসী দ্বারা চরু অপ-হরণ করিয়া তাহা ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জ্জন করিলেন। চরুর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে নদরাজ নরবেশে রাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সহবাস প্রার্থনা করিলেন। রাণী কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মপুত্র দৈবশক্তি দ্বারা রাণীকে মোহিত করিয়া বলিলেন ভদ্রে! আমার সহবাসে তুমি অপবিত্র হইবে না, তোমার সতীত্ব অক্ষুন্ন থাকিবে। আমা হইতে তুমি যে

পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তিনি অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন নরপতি হইবেন। নদরাজের সংসর্গে রাণী গর্ভধারণ করিলেন। রাজা রাণীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আধুনিক ঢাকার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

সেই নির্ব্বাসিতা রাণীর গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। বনে জন্ম বলিয়া তিনি বল্লাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। দৈব পিতার অনুগ্রহে তাঁহার শৈশব জীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। জনপদের কোলাহলে তাঁহার জীবনের শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। দুক্রিয়াসক্ত সমাজের আমোদ প্রমোদ ও ভোগ বিলাসে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তাঁহার জন্মদাতা নদরাজ লৌহিত্য তাঁহাকে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সুশিক্ষিত করিয়ছিলেন। রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যায় শৈশবেই তাঁহাকে সুপণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি শৈশবকালে রাজা ও সেনাপতিগণ দ্বারা পরিচালিত একদল সুশিক্ষিত সৈন্যকে জয় করিয়াছিলেন।

কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা এই সকল বিবরণ পরিত্যাগ করিতে পারি। যাহা হউক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বল্লাল একজন বীর্য্যবান্, বুদ্ধিমান্ বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মর্ম্মালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, তাঁহার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দানসাগর গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে।

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌশ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ। পদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ব-বসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ। শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তে সদ্বৃত্তচিন্তামণিঃ * * ইতি পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লাল সেন দেব বিরচিতঃ শ্রীদানসাগর সমাপ্তঃ।

রা বল্লাল একজন শিবভক্ত ছিলেন এজন্যই আমরা তাঁহার নামের সহিত "পরম মাহেশ্বর" ও "নিঃশঙ্ক শঙ্কর" এই দুইটী পদ সংযুক্ত দেখিতে পাই।

আদিশূরের সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে বল্লাল যাহাদিগকে নবগুণ ১৫ সম্পন্ন দর্শন করিলেন তাহাদিগকে সেই সেই কুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা কুলীন আখ্যাদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

দক্ষের উত্তর পুরুষ—চট্টবংশীয় বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন।—

ছান্দড়ের উত্তর পুরুষ—পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন, ঘোষাল বংশের শির, কাঞ্জীলাল বংশের কানু ও কুতূহল এই চারিজন।—

বেদগর্ভের উত্তর পুরুষ—গাঙ্গুলি বংশের

১৫ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর, এই দুইজন।—

ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ বন্দ্যোবংশের মহেশ্বর, জাহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন।—

শ্রীহর্ষের উত্তর পুরুষ—মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুইজন।

সর্ব্বশুদ্ধ উনিশজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে বল্লাল কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে দক্ষের অষ্টম উত্তর পুরুষ বহুরূপ; ছান্দড়ের নবম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন; বেদগর্ভের অষ্টম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি; ভট্টনারায়ণের দশম উত্তরপুরুষ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীহর্ষের ত্রয়োদশ উত্তর পুরুষ উৎসাহ মুখটী বল্লালের সমসাময়িক। সুতরাং এই সকল ব্রাহ্মণের বংশাবলী অনুসারে আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০ ও ১৩ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। যদি আমরা এই দুই নরপতির মধ্যে গড়ে নয় পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া, মিত্র মহোদয়ের অবলম্বিত, তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আদিশূরের অন্যূন তিন শত বৎসর পরে বল্লাল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্ব্বে আমরা আদিশূরের যে সময়াবধারণ করিয়াছি, তাহা ইহার সহিত ঐক্য হইতেছে। আদিশূর শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বা খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) জীবিত ছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। দানসাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে "সময় প্রকাশ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, যে, এই গ্রন্থ "নিখিল নৃপচক্র তিলক শ্রীবল্লালসেন দেব ১০১৯ শকাব্দে" (১০৯৭ খৃঃ অঃ) রচনা করেন।"১৬ দানসাগর গ্রন্থ বল্লালের প্রথম বয়সের রচনা নহে এজন্যই এই গ্রন্থ রচনার ৩১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খৃঃ অঃ) মিত্র মহোদয় বল্লালের অভিষেক কাল অবধারণ করিয়াছেন এবং আমরা ও ইহা অনুমোদন করিতেছি।

কয়েকখানা কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে সেনরাজগণ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। এবং যখন যে ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৌড়ের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিতেন। বল্লাল যখন দিল্লীতে রাজত্ব করেন, তৎকালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বৈদ্যকুলজিকারগণ বলেন যে, এই সময় বল্লাল এক নীচজাতীয়া রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন। এজন্য লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হইয়াছিল। তৎকালে লক্ষ্মণ সেনের অনুগত বৈদ্যগণ, বল্লালের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ মানসে উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রভাব ধারণ করে। এই ঘৃণিত

১৬। নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীবল্লালসেন দেবেন।
পূর্ণেনবশশিদশমিতে শকাব্দে দান সাগরোরচিতঃ।

মিথ্যা বাক্য পোষণোপযোগী কতকগুলি অশ্লীল কবিতা বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যে কলুষিত রুচি হইতে কবিচূড়ামণি কালিদাস সম্বন্ধীয় অশ্লীল গল্প প্রচারিত হইয়াছে। যে জুগুপ্সিত রুচি বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের প্রিয়তমা পত্নী "লছমী" দেবীর নির্ম্মল চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা প্রসব করিয়াছে। বল্লাল সেনদেবের বিমল চরিত্রের কলঙ্ক যে কেবল সেই ঘৃণিত রুচির প্রসবিত্রী এমত নহে, ইহাতে একটী সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। বৈদ্যজাতির উপবীত হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীর রাজাসনে স্থাপন পুর্ব্বক সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য দেশ মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। রাজনগর নিবাসী রাজবল্লভ সেন এই সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ। ১৭

সেন রাজগণের দিল্লীতে রাজত্ব করার উক্তি আমাদের বিবেচনায় বাতুলের প্রলাপ মাত্র। যে সময়ে আমরা সেন রাজগণকে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিতে পাই ঠিক সেই সময়ে রাঠোর বংশীয়েরা কনোজে ও তুঅর, তৎপর চৌহান বংশধরেরা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত অনঙ্গ পালের অধিকারের পূর্ব্বে কনোজ ও দিল্লী এক রাজছত্রের অধীন ছিল। তৎপরে আর্য্যবর্ত্তে একটী বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লব দ্বারা আহুত হইয়া রাঠোর বংশীয় চন্দ্রদেব কনোজে ও তুঅরবংশীয় বিলনদেব দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। যেস্থানে একসময় যুধিষ্ঠির ভারতের সমস্ত রাজণ্যবর্গকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিলনদেব (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল আখ্যা ধারণ করত ৯৭৪ শকাব্দে (১০৫২ খৃঃ অঃ) দিল্লীর রাজাসন উজ্জ্বল করেন। সেই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে যে রাশি রাশি ভগ্নাট্টালিকা "কুতুবদ্ধ্রী" নামে পরিচিত রহিয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ নরপতি (দ্বিতীয়) অনঙ্গপালকে "মহারাজাধিরাজ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অনঙ্গপাল হইতে ছহড়দেব বা তৃতীয় অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল তুঅর বংশীয়েরা প্রবল পরাক্রমের সহিত দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। তৃতীয় অনঙ্গপালের পর তাহার দৌহিত্র (চৌহান বংশীয় সোমেশ্বরের পুত্র) সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৮ এই সকল বিখ্যাত নরপতিগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৈদ্য কুলজি

১৭ পূর্ব্বে সেন রাজগণ আমাদের দেশে কায়স্থ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। এজন্যই আবুল ফাজেল ও জোসেপ্ টিফিন তল্লার তাঁহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভসেন ১০ দশ লক্ষ টাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগকে বাধ্য করিয়া সেন রাজগণকে বৈদ্য ও রাজবল্লভকে তদ্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। Eestern India, Vol. II p. 615. History and statistics of Dacca Division; page 4. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী ১১০ পৃষ্ঠা; রাজা রাজবল্লভসেনের জীবন চরিত। (বান্ধব, সপ্তম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধ নির্ণয়, সমালোচনা (বান্ধব, অষ্টমখণ্ড ২৫৩—২৬০ পৃষ্ঠা) দেখ।)

১৮ কবি চাঁদ বর্দাই তাঁহার "পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসৌ" গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব্বের ২৮ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে, চৌহান পৃথ্বী-

লেখকগণ সেনরাজগকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়েই বঙ্গের রাজধানী "সমতট" বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই বিক্রমপুর নগরী অধুনা 'বল্লাল বাড়ী' বা 'রামপাল' নামে পরিচিত রহিয়াছে। ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে বৃহৎ পরিখা ছিল তাহা ক্রমে ভরাট হইয়া শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। সুপ্রশস্ত রাজপথগুলির চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। যে স্থানে রাজবাটী ছিল বলিয়া কথিত হয় তাহার দক্ষিণাংশে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য অনুমান ৩৫০০ হস্ত ও পরিসর এক সহস্র হস্ত হইতেও অধিক। বর্ত্তমান সময়ে এই দীঘির অনেক স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বল্লালের সময়ে এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ও পরিসর কত দূর ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। উক্ত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সমূহ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। রামপাল ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ভূমি খনন করিলে প্রায়ই রাশি রাশি ইষ্টক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে এইরূপ ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড প্রস্তর এইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ১৯ যাহা হউক মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানীর কেবল চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর সকলই কালের অনন্ত কবলে কবলিত হইয়াছে। সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের উত্তরপুরুষ শ্রীআদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

শ্রীআদিদেব—

যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী॥

বল্লালসেন দেব স্বীয় অধিকৃত দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, যথা বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা। আমরা এই সকল বিভাগের সীমা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বল্লালের সময়ে মিথিলার কিয়দংশ বাঙ্গালার রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

বল্লালসেন দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব বাঙ্গলার রাজদণ্ড ধারণ করেন। লক্ষ্মণসেন ১০২৮ শকাব্দে (১১০৬ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন তাহা দীর্ঘকাল এদেশে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ অব্দ কেবল মিথিলা প্রদেশে সামান্য রূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যে ভূমি দান করিয়া-

---

রাজকে দিল্লী প্রদান করিয়া তুঅর অনঙ্গপাল বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

"দিয় দিলী চহুআন কোং
তুঅর বস্ত্রী জাই।"
ইত্যাদি।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের খোদিত লিপিতে তাঁহার মাতুল কিরণ দেবের নাম উল্লেখ আছে। (A. R. XV. 444.) বোধ হয় কিরণদেব তাঁহার পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন।

১৯ রামপালের বিবরণ, Taylor's Topography of *Dacca*, and Taylor's Pereplus of the Erythrean sea. দেখ।

ছিলেন তাহার দুই খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথম এক খণ্ড তাম্রশাসন সুন্দরবনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দের দশই মাঘে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসন পত্র দ্বারা "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন দেব" খাড়ী মণ্ডলিকার অন্তর্গত তিন দ্রোণ ভূমি, ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমির বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চাশৎ পুরাণ অর্থাৎ ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছে। ২০

লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় তাম্রশাসন দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পণ দীঘির নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ সাত লক্ষ্মণাব্দের ৩রা ভাদ্র। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভরদ্বাজ গোত্র, "সামবেদ কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়িনে" শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বিলহিষ্টী গ্রামের কিয়দংশ ভূমি দান করেন। ইহারও বার্ষিক রাজস্ব ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছিল। ২১

প্রোক্ত দুই খণ্ড শাসনপত্রের দ্বারা যে দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল আমাদের বিবেচনায় তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

উভয় শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন তাহাদের রাজ্যের "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন" আখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দান বিষয়ের ঘোষণাপত্র "শ্রীবিক্রমপুর" হইতে প্রচারিত হইয়াছিল ইহা তাম্রশাসনেই লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের নিবাসভূমি বিক্রমপুরে ছিল, ইহাও শাসনপত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেন দেব বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনের শীর্ষ দেশে ভগবতী দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয় ইহা সেন রাজগণের কৌলিক দেবতার প্রতিকৃতি। নারায়ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি লক্ষ্মণসেনের "সন্ধিবিগ্রহিক" ছিলেন। শাসনপত্রাদিতে তাহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ যে সকল পণ্ডিত-রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কবিবর জয়দেব তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২২ উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী-কবিরাজের নাম লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে। ২৩ ডাক্তর ভুলার কাশ্মীরে একখণ্ড হস্তলিখিত গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনের সম-সাময়িক লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ হইতে একটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২৪।

এই পঞ্চ পণ্ডিত রত্নের মধ্যে জয়দেব ও গোবর্দ্ধন ২৫ রাঢ়ীয় ও উমাপতি, শরণ ও ধোয়ী কবিরাজ বৈদিক কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না।

---

২০ ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

২১ J. A. S. B. Vol XLIV. part 1. page 11.

২২ বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধীকোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরোধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক।

২৩ গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

২৪ Indo—Aryans. Vol 11. page 240.

২৫ ইনি পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধন নহেন। পশ্চাৎ দেখ।

সেন রাজদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেন সর্ব্ব প্রধান নরপতি ছিলেন। বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত শাসনপত্রে লিখিত আছে এই রাজার "বাহু করিশুণ্ড" ও বক্ষস্থল প্রস্তর সদৃশ কঠিন ছিল। তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত মুষল-ধারী ও গদাপাণির (বলরাম ও জগন্নাথ) মন্দিরের সন্নিকটে (পুরীতে), ও অশী বরুণার-গঙ্গাসঙ্গমে অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র বারাণসীতে এবং ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী, ত্রিবেণীর তটে (প্রয়াগে) যজ্ঞ যূপ সমূহের সহিত সমর বিজয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মণসেন-দেব একদিকে প্রয়াগ ও অন্যদিকে পুরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জপতি-দিগের শাসন পত্র আলোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে, যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসী কনোজ রাজদণ্ডের অধীন ছিল। লক্ষ্মণসেনের বাঙ্গালা শাসনকালে মদনপাল ও তৎপরে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কান্যকুব্জ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সেন রাজগণ হইতে দুর্ব্বল ছিলেন না। বিশেষতঃ গোবিন্দচান্দ্রের ১১৬৬ সম্বতের (১০৩২ শক) শাসন পত্রে লিখিত আছে যে, হম্মীর গৌড়ের দুর্ব্বার ভীষণ দ্বিরদ সমূহের মস্তক চূর্ণ করিয়া বীরগণের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনি (গোবিন্দচন্দ্র) সেই হম্মীরকে জয় করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ২৬

গৌড়েশ্বর যে দুর্ব্বল ছিলেন ইহা দ্বারা এরূপ বোধ হয় না, বরং গৌড়েশ্বরকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বলিয়াই আর্য্য বীর সমাজে হম্মীরের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই হম্মীরকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং আস্ফালন করিয়াছেন। হম্মীর একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। তাহার শত্রুগণই ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। ২৭ হম্মীর কোন্ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী কোন দেশের রাজা ছিলেন। ২৮

যাহা হউক কেশবসেনের শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন দেবের বিক্রম বর্ণনা করিতে যাইয়া যে সকল কথা সন্নিবেশিত হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের শাসনপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং বোধ হইতেছে এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পরিবর্ত্তে, কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশবসেনের তাম্রশাসনেই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক লক্ষ্মণসেন যে একজন দুর্ব্বল নরপতি ছিলেন এমত বোধ হয় না। দুর্ব্বল রাজণ্যবর্গ দ্বারা স্থাপিত অব্দ এরূপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না।

বল্লালপ্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা লক্ষ্মণসেন দেব দ্বারা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

---

২৬ Proceedings. As. So. Bengal, for 1876. page 131.

২৭ বীর চূড়ামণি পৃথ্বী রাজার খোদিত লিপিতে যতবার হম্মীরের নাম উল্লেখ হইয়াছে, প্রত্যেক বারেই নামের পূর্ব্বে "বীর" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। Asiatic Researches. Vol XV page 444.

২৮ আমরা বৌদ্ধ গয়ার ৩নং প্রস্তর লিপিতে এই রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। J. A. S. P. Vol. V. p. 658.

রন্থাম্বর পতি বীরচূড়ামণি হম্মীরের জীবন চরিত "হম্মীররাসৌ" গ্রন্থে তাহার যে জন্মাব্দ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে গণনা করিলে তাহাকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে হম্মীরকে আলাউদ্দিনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। (See Hamir Raso. Translated by Braja Nath Banarjee) সুতরাং আমরা রন্থাম্বরপতিকে সেই হম্মীর বলিতে পারি না।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর পরগনার জনৈক কৃষক ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্র ফলক আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ পরগণার তদানীন্তন জমিদার ৺ বাবু কানাইলাল ঠাকুর তাহা প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটীক সোসাইটীতে প্রদান করেন। ঐশাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহা কেশবসেনের দান পত্র। কিন্তু শাসন পত্রের যে স্থানে কেশব সেনের নাম লেখা আছে, সেই স্থানটীই কাটা, ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে পূর্ব্বে যাঁহার নাম লিখিত হইয়াছিল, তিনি এই দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী সেই শাসন পত্রে আপন নাম সংযুক্ত করিয়া তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। শাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা কালে বিজ্ঞবর প্রিন্সপ সাহেব এই সকল দর্শন করতঃ বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছি। ২৯

আইন আকবরী প্রণেতা আবুলফাজেল লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের মধ্যবর্ত্তী একজন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই মাধব সেন। রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ মাধব কনিষ্ঠ কেশব। মাধবসেনকে বঙ্গ দেশীয় কুলজি লেখকগণ কেশবের পরবর্ত্তী অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুলজি গ্রন্থগুলিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মহিষীর নাম বসুদেবী, তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্যা, তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতার হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, যেরূপ মহাদেব ও গিরিজা হইতে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ "অশ্বপতি," "নরপতি" ও "গজপতি" রাজগণের অধিপতি, সেন কুলকমলের ভাস্কর স্বরূপ, সোম বংশের প্রদীপ, দানে কর্ণসদৃশ, গাঙ্গেয় সদৃশ সত্যব্রত, শরণাগতপ্রতিপালক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কেশবসেন দেব জন্মগ্রহণ করেন।

কবি কেশবসেনের নামের সহিত অনেকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটীই আমাদের উল্লেখ যোগ্য। প্রথম কেশবসেনকে "সোমবংশপ্রদীপ" অর্থাৎ চন্দ্র বংশের উজ্জ্বলকারী বলা হইয়াছে। এই শাসনপত্রে বিজয়, বল্লাল, লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের নামের সহিত "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আর কোনও শাসনপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রিন্সেপ ও মিত্র মহোদয় শঙ্করগৌড়েশ্বর অর্থে "ভাল" কিম্বা "শ্রেষ্ঠ" গৌড়েশ্বর করিয়াছেন। ৩০

---

২৯ It is curious that wherever the name of Kesava Sena occurs on the plate, there makes of an erasure; as if the grant had been prepared during the reign of Madhava Sena, and, on his dying before it was completed (for such a plate must have taken a long time to engrave), the name of his successor Kasava, fortunately happening to be of the same prosodial quantity, was ingeniously substituted, and *mutato nomine,* the endowment was completed and promulgated. Journal As. So. Bengal. Vol. VII. page 42,

৩০ *Mittra*—The excellent Lord of Gour. *Prinsep*—The auspicious Lord of the city of Gour. কিন্তু প্রিনসেপ সাহেব বলেন "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদটী যদি দন্ত্য "স" দ্বারা (সঙ্কর গৌড়েশ্বর) লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাকে

কাশ্মীর দেশে "শঙ্করগৌরীশ" নামে এক শিব মন্দির আছে। ৩১ সেন গৌড়েশ্বরদিগের মধ্যে কোন নরপতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিত্র মহোদয় অনুমান করেন। কিন্তু আমরা রাজতরঙ্গিনীর সাহায্যে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে,কাশ্মীর-রাজ শঙ্কর বর্ম্মা "গৌরীশ্বর" মহাদেবের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৩২

শাসনপত্রে কেশবসেনকে "পরমসৌর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যোপাসক বলা হইয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব সৌরকে "শৌর" করিয়া তাহার অর্থ "শ্রেষ্ঠবীর" করিয়াছেন। কিন্তু শাসনপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তির মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গেলেই "সৌর" শব্দ দন্ত্য "স" দ্বারা লিখিত থাকা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের শাসন-পত্রে সূর্য্যোপাসক রাজাদিগের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

সেন গৌড়েশ্বরদিগের মিশ্র বা নীচ জাতির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিব। কিন্তু "সোমবংশ প্রদীপ" পদটী স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ভাগে এইরূপ অর্থ যুক্ত পদ প্রয়োগ কোন মতেই সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। শাসন পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তির আরম্ভ ও শেষ ভাগে দুইবার, নবম পংক্তির মধ্যভাগে একবার ও দ্বাদশ পংক্তির প্রারম্ভে একবার, সর্ব্বশুদ্ধ চারিবার "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদের উল্লেখ আছে। সেই সেই স্থানে তালব্য "শ" খোদিত রহিয়াছে। প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইরূপ কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩১ Journal As. So. Bengal. Vol. XVII Part II. p. 283.

৩২ A. R. XV. 65.

বাখরগঞ্জের শাসনপত্র দ্বারা কেশবসেনদেব বঙ্গদেশস্থ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি বাগুলী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে ৩০০ (দ্রোণ) ভূমি শ্রুতিপাঠক শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর কোন মহাত্মা বাঙ্গালার সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবুলফাজেল তাঁহার আইন আকবরীতে কেশবসেনের পর সদাসেন ও নৌয়াজে নামক দুইজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি কুলজি গ্রন্থে ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলীতে কেশবসেনের পর নয়জন রাজার নাম লিখিত আছে। ইহার অধিকাংশই কাল্পনিক। যাহা হউক এই নয় জন রাজার মধ্যে আমরা "হরিসেন" নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

সাবর্ণ গোত্রীয় "ভবদেবভট্ট বালবল্লভীভুজঙ্গ" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাঢ় প্রদেশে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। ভবদেব ভট্টের বন্ধু শ্রীবাচস্পতি শর্ম্মা প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গৌড়েশ্বর হইতে রাঢ় দেশস্থ একশত খানি গ্রাম দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রথাঙ্গ তাঁহার এক পুত্র। রথাঙ্গের পুত্র অত্যাঙ্গ, তৎপুত্র বুধ তাহার পুত্র শ্রীআদিদেব ইনি বঙ্গরাজার মন্ত্রীছিলেন। (আমরা ইহাকে বল্লালের মন্ত্রী লিখিয়াছি।) তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন। ইনি কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। (আমরা এই গোবর্দ্ধনকেই লক্ষ্মণসেনের সভায় দেখিতে পাইতেছি।) গোবর্দ্ধন বন্দ্যোবংশীয় সাঙ্গোকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাঙ্গোকার গর্ভে গোবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে, ইনি ভট্ট শ্রীভবদেব বাল-

বল্লভী ভুজঙ্গ। ইহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়াছিলেন। ৩৩ এই প্রস্তরলিপির সম্বৎকে আমরা অবশ্যই লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; কারণ তৎকালে আমাদের দেশে লক্ষ্মণাব্দই প্রচলিত ছিল।

লক্ষ্মণসেন দেবের চৌত্রিশ বৎসর অন্তে যে হরিবর্ম্মদেব রাঢ়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম অবশ্যই কেশবসেনের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নরপতির নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত না থাকায় একটী সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ কোন কার্য্যের নহে। গুপ্ত বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি ঘটোৎকচের নামে "গুপ্ত" শব্দ সংযুক্ত নাই। গুপ্ত রাজগণের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, কয়েকজন রাজার নামের সহিত গুপ্ত শব্দ সংযুক্ত নাই। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজা জনমেজয় ও তাহার পুত্র যযাতি ও অন্যান্য কয়েকজন রাজার নামের সহিত "কেশরী" শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৪ সুবিখ্যাত মিত্রবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ভদ্রঘোষের নামের সহিত মিত্র শব্দ সংযুক্ত নাই। ৩৫ কান্যকুব্জ পতি দ্বিতীয় ভোজদেবের নামের সহিত পাল শব্দ সংযুক্ত নাই অথচ তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী চারিজন রাজার নামের অন্তে পালপদ সংযুক্ত রহিয়াছে। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে, যে অশোককে, মিত্রমহোদয় সেন বংশের শেষ নরপতি লিখিয়াছেন তাঁহার নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত নাই। এমত অবস্থায় হরিবর্ম্মদেবের নামে "সেন" পদ সংযুক্ত না থাকায়, তিনি সেন বংশীয় নহেন, বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। সেন শব্দ জাতি বাচক উপনাম নহে। "গুপ্ত," "পাল" "বিষ্ণু" "সেন", "আদিত্য", "রুদ্র", "বর্দ্ধন" "সাহ" "সাহি" "নাগ," "মিত্র" প্রভৃতি শব্দগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজণ্যবর্গের নামের সহিত পুরুষানুক্রমে সংযুক্ত থাকার রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ৩৬ প্রোক্ত প্রস্তর

৩৩ J. As. So. Bengal. Vol. VI. p. 90.

৩৪ J. A. S. Bengal Vol. V11. p. 58, and, Vol. XLVI. part 1. pp. 150, 173.

৩৫ J. A. S. Bengal Vol. XLIX. part 1. p. 23.

৩৬ কেবল যে বাঙ্গালার রাজাদিগের নামের অন্ত "সেন" শব্দ সংযুক্ত ছিল, এমত নহে। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার্শ্বে একটী রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন। ইহাঁরা সাধারণতঃ "বাকটকপতি" বলিয়া খ্যাতছিলেন এই বংশীয় প্রবরসেনের শাসনপত্রে ৫ জন সেন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা

মহারাজ প্রবরসেন।
" রুদ্রসেন।
" পৃথিবীসেন।
" রুদ্রসেন।
" প্রবরসেন।

J. A. S. B. V. 128.

আর একটী সেন বংশ বল্লভীদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সূর্য্য বংশীয়। (উদয়পুরের জগদ্বিখ্যাত রাণাকুল এই বংশ হইতে সমুৎপন্ন)। শাসন পত্র হইতে তাহাদের নাম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। সেনাপতি ভট্টায়ক (কণকসেন)।
২। " ধরসেন।
৩। মহারাজ দ্রোণসেন।
৪। " ধ্রুবসেন।
৫। " ধরভট্ট।
৬। " গুহসেন।
৭। " শ্রীধরসেন।
৮। " শীলাদিত্য।
৯। " ঈশ্বরগুহ।
১০। " শ্রীধরসেন।

লিপিতে খোদিত হরিবর্ম্মদেবই কুলজিকারগণ দ্বারা হরিসেন নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রম যে কেবল বঙ্গদেশে হইয়াছে এমত নহে। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ "কেশরী" বংশীয় সমস্ত রাজার নামের অন্তে "কেশরী" শব্দ সংযুক্ত করিয়াছেন। ৩৭ খৃষ্টধর্ম্ম যাজক টিফিনতল্লার গোয়ালিয়র রাজ বংশের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধারাবাহিক ৮৫ জন রাজার নামের অন্তে "পাল" শব্দ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গোয়ালিয়র রাজাগণের নামের অন্তে "সেন," "সিংহ", "মল্ল", "সাহি", "পাল" প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত ছিল।

হরিবর্ম্মদেবের পর আমরা অশোক চন্দ্রদেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মিত্র মহোদয় ইহাকে মুসলমানদিগের লিখিত লাক্ষণেয় (লথমণিয়া) অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সকল কারণে মিত্র মহোদয়ের মত অনুমোদন করিতে পারিতেছি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

বুদ্ধ গয়ার একটী বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে রাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচন্দ্র দেবের নাম খোদিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরলিপির অক্ষর শিশু বাঙ্গালা বা গৌড়ীয়। প্রিনসেপ সাহেব ইহার যে প্রতিলিপি দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সন্দেহ শূন্য ও বিশুদ্ধ তাহা তিনিও স্বীকার করেন নাই এবং আমরাও স্বীকার করিতে পারি না। নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে আমরা প্রস্তরলিপি হইতে মহারাজ অশোকচন্দ্র দেব ও তাহার ভ্রাতা কুমার দশরথের নাম গ্রহণ করিতে পারি। কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ, মহামহাত্মক ঋষিব্রহ্মের পৌত্র, মহাত্মক চাটব্রহ্মের পুত্র শ্রীসহস্রপাদ ভট্টাচার্য্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে খোদিত প্রস্তর লিপি সংস্থিত করিয়াছিলেন। প্রস্তরলিপির শেষ ভাগে লিখিত আছে 'ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব পদোনমতীত রাজ্যে সং ৫৩ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ"। ৩৮

১১। ,, ধ্রুবসেন।
১২। ,, শ্রীধরসেন।
১৩। ,, সিলাদিত্য।

J. A. S. B. IV. 486 and V11. 966.

৩৭ Asiaitic Reserches. Vol. XV p. 264.

৩৮ মিত্র মহোদয় উদ্ধৃত অংশের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেনঃ—On Thursday, the 12th wane, in the month of Vaisakha, Sam. or year 74 after the expiration of the reign of the auspicious Lakshmana Sen Deva,

প্রিন্সেপ দেবনাগর অক্ষরে প্রস্তরলিপির যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন মিত্র মহোদয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তরলিপির অঙ্ক সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেবের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি প্রথমতঃ বলেন It contains a date sambat 73 or 74, আবার কয়েক পংক্তি নীচে তিনি লিখিয়াছেন, The figures, however, are unfortunately doubtful,

আমরা লক্ষ্মণসেনপ্রদত্ত তর্পণদীঘির তাম্রশাসনের খোদিত অঙ্কের সহিত বৌদ্ধগয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অঙ্ক তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত প্রস্তরলিপির দ্বিতীয় অঙ্ক চারি না হইয়া তিন হইবে। প্রথম অঙ্ক লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন খোদিত ৭ অঙ্কের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহাকে একটী অর্দ্ধভগ্ন ৫ অঙ্কের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অতএব আমরা প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত ৭৩ কিম্বা ৭৪ কে "৫৩" লিখিতে বাধ্য হইলাম।

See J. A. S. B. Vol. V. p 659 plate XXXI.

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির উৎপত্তি ও উহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক কি কি প্রকারে উক্ত বৃত্তি উন্নত ও প্রবল হইতে পারে, আর কি কি প্রকারে উহা অধোপ্রাপ্ত ও নিস্তেজ হইতে পারে। মোট কথা এই, যে যে উপায়ে কোন জাতির জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তৃত হইতে পারে সেই সেই উপায়ে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে পারে; জনসাধারণকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া জ্ঞান ও সুনীতি বিস্তারের একটী প্রধান উপায়, এই নিমিত্ত আজি কালি ইংলণ্ড জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে ইতর শ্রেণীদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের এত দৃষ্টি পড়িয়াছে। * কিন্তু সকল দেশেই ও সকল অবস্থাতেই আর কিছু সাধারণকে বাধ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। চিত্রশালা, মিউজিয়ম্, সুরুচি উদ্দীপক নাট্যশালা, উপদেশ-বক্তৃতার ঘর ইত্যাদি প্রকার স্থানে সাধারণের জ্ঞানলাভ ও সুনীতি শিক্ষার বহুল সম্ভাবনা আছে, সুতরাং স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে যত্নশীল হইয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারেন। এই সকল উপায়ে লোকের মধ্যে জ্ঞান ও সুনীতির জ্যোতি

* কিন্তু আমাদের দেশের চাষাভূষাদের মধ্যে পড়িতে জানে না,—রামায়ণ মহাভারত খানা পড়িতে পারে না—এমন লোক অল্পই আছে। যাহারা বা পড়িতে জানে না, শুনিয়া শুনিয়া রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি তাহাদের এমন কণ্ঠস্থ হইয়া পড়ে যে তাহাতে পড়ার সমানই কাজ হয়। এইরূপে, ও আমাদের যাত্রা গান, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতিতে সাধারণের মনে যেরূপ সুনীতি ও ধর্ম্ম ভাব অঙ্কিত করে, উপদেশে, বক্তৃতায় তাহার শত ভাগের এক ভাগ হয় কি না সন্দেহ। সেই জন্যই আমাদের এই দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দীন হীন-অবনতির অবস্থাতেও, আমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নীতি-পরায়ণ জাতি আর পৃথিবীতে নাই। সেই জন্যই আমাদের দেশের অসভ্য চাষাভূষাদের তুলনায় ইয়োরপের সভ্য চাষাভুষারা আকাশ হইতে পাতালের মত তফাৎ।

পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত সকল প্রথায় অনাদর হইয়া দেশের নীতি শিক্ষার মূলে যে দারুণ কুঠারাঘাত করিতেছে এই বড় দুঃখ। ভাং সং।

বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, আর তাহাতে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন হয়, কিন্তু আর কতকগুলি উপায় আছে, তাহাতে উক্ত বৃত্তির উন্নতি সাধন হউক আর নাই হউক অব্যবহিত ভাবে উহার তেজোবৃদ্ধি হইতে পারে। যে সকল ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারে, যে সকল ক্রিয়ায় কি ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র, জাতির অন্তর্গত সকলেই জাতির মঙ্গলের নিমিত্ত, সাধারণের হিতের নিমিত্ত, একমনে কার্য্য করিতে পারে, সে সকল ক্রিয়া দ্বারা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির তেজোবৃদ্ধি হওয়ার ভূয়সী সম্ভাবনা; যেমন, সমুদয় জাতির প্রধান প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত যে ব্যবস্থাপক সভা থাকে, কিম্বা পথঘাট পরিষ্কার রাখা, সাধারণ গম্যস্থলে আলোক দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রত্যেক সহরে যে সভা থাকে, এই দুইপ্রকার সভার সভ্য নির্ব্বাচন ক্রিয়ায় সাধারণে যোগ দিতে পারিলে, এই সকল সভার সভ্যগণ সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতে পারিলে, আর এই নির্ব্বাচনক্রিয়া সুরুচি ও সুনীতির সহিত সম্পাদিত হইলে সাধারণের মনে এই জ্ঞান জন্মিতে পারে যে তাহারা সকলেই একজাতির অন্তর্গত, সুতরাং কতকগুলি ঘটনায় সেই জাতির অন্তর্গত সকলেরই দুরবস্থা হইতে পারে আর কতকগুলি ঘটনায় সকলেরই সুখ সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে। যে সকল অনুষ্ঠানে জাতির মধ্যে এইরূপ শিক্ষা হইতে পারে সে সকল অনুষ্ঠান জাতীয় জীবনে বদ্ধমূল করিতে স্বজাতি হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া উচিত। ভাষা, ধর্ম্ম, ও আচার ব্যবহার এই ভিন্ন বিষয়ে একতা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তিকে অলক্ষিত ভাবে পরিপুষ্ট করে। ভাষাগত একতায় লোকের মধ্যে কতদূর নৈকট্যভাব সংস্থাপিত হয় তাহা আমরা স্বদেশে থাকিয়া বুঝিতে পারি না; যখন বিদেশে থাকা যায়, বিদেশীয় ভাষায় সদাসর্ব্বদা কথা কহিতে হয়, তখন নিজের ভাষায় কথা কহিবার একজন লোকও যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে মনে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ উপস্থিত হয় আর সে লোকটিকে যে কতদূর আপনার বলিয়া মনে হয় তাহা যে সেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে সেই বুঝিয়াছে। ধর্ম্মগত ও আচার ব্যবহার গত একতায় লোকের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নতার পরিমাণ হ্রাস করে, যাহা কিছু দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে—তাহাই তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতির কারণ হয়। ধর্ম্মের বশে লোকে জীবনের অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, লোকে যে ধর্ম্ম অনুসারে চলে সেধর্ম্মের চিহ্ন তাহাদিগের জীবনের প্রতি কার্য্যে লক্ষিত হয়; সুতরাং ধর্ম্ম এক হইলে জীবনের গতি অনেক বিষয়ে এক হইতে পারে আর তাহাতে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অনু-

রাগ বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে তাহা অবগত হওয়াও যেরূপ প্রয়োজন, কি কি প্রকারে উক্ত বৃত্তির অধোগতি ও তেজোহ্রাস হইতে পারে তাহা অবগত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয়, কারণ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা আমরা আগে থাকিতে সাবধান হইয়া চলিতে পারি। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির অধোপ্রাপ্তির দুইটী প্রধান কারণ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে (১) স্বার্থপরতা ও (২) অপর শ্রেণী কিম্বা অপর জাতির প্রতি অনাস্থা। যে জাতির লোকে কেবল নিজের নিজের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত, নিজের নিজের হিতের চিন্তাতেই মগ্ন, অন্যের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি করে না—সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তি অতি নির্জ্জীব অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। স্বার্থপরতা একটী নিন্দনীয় বৃত্তি ইহা সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময়ে অনেকের মনে এই বৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে—অতএব আমাদিগের সকলেরই এই বৃত্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; যাহাতে আমরা অন্যের হিতাহিতের প্রতি আস্থাহীন হইয়া না পড়ি, যাহাতে আমাদিগের নিজের হিতসাধন করিতে যাইয়া আমরা অন্যের হিতের প্রতি অন্ধ না হই, সে বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। আবার যে জাতির মধ্যে এক শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর উপর আস্থা করে না, যে জাতির ব্যক্তিগণ স্ব স্ব শ্রেণী লইয়াই ব্যাপৃত, অন্যান্য শ্রেণী সুখেই থাকুক আর দুঃখেই থাকুক, অন্যান্য শ্রেণী থাকুকই আর নাই বা থাকুক সে বিষয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে না, সেজাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রবল হইতে পারে না, সে জাতির মধ্যে শ্রেণীগত অনুরাগ প্রবল থাকিতে পারে কিন্তু জাতিগত অনুরাগ যে ক্ষীণপ্রভ হইবে সে বিষয়ে মতান্তর হইতে পারে না। আবার যে জাতি অন্যান্য জাতির প্রতি অনাস্থা করে, যে জাতির লোকে অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, উন্নতি অবনতি প্রভৃতির প্রতি নিতান্ত উদাসীন, যে জাতির ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদিগের নিজের প্রকৃতি, নিজের কার্য্যপদ্ধতি, নিজের আচার ব্যবহারই ভাল মনে করে আর বিদেশীয়দিগের প্রকৃতি, কার্য্যপদ্ধতি, আচার ব্যবহার মন্দ বলিয়া মনে করে, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ প্রবল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে অনুরাগ ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিবে, সে অনুরাগ উর্দ্ধপথে উঠিয়া বিস্তৃতপ্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকৃত স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আমাদিগের মধ্যে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল আলোচনা হইতে দেখা যায়, আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমনও মনে করিতে পারেন, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদিগের কোন বিশেষ উপকার নাই। * কিন্তু এরূপ মত অবলম্বন

* পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কোন উপকার

করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সুব্যবহার করিয়াছি কি অপব্যবহার করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে যে অংশ আমাদিগের সমাজের উপযোগী সেই সেই অংশই আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত, আমাদিগের সমাজ এক প্রকার ঘটনায় গঠিত এক প্রকার ঘটনায় বর্দ্ধিত আর ইয়োরোপীয় সমাজ অন্য প্রকার ঘটনায় গঠিত, অন্য প্রকার ঘটনায় বর্দ্ধিত—সুতরাং সমগ্র ইয়োরোপীয় সভ্যতা আমাদিগের সমাজের উপযোগী হইতে পারে না। † মানুষের মনের শক্তি সীমাবদ্ধ। এই সংসারের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা এক ব্যক্তি বা এক জাতির সাধ্যাতীত, সমুদায় মানব জাতিরও সাধ্যাতীত। সুতরাং আমরা যদি সভ্যতার বাজিতে অন্যান্য জাতির নিকট পরাস্ত হইতে না চাই তবে অন্যান্য দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য রাজকার্য্য, ব্যক্তিগত এবং সমাজগত নীতি ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে সেগুলির সহিত আমাদের পরিচিত থাকা আবশ্যক ও সে সকল পন্থা ও পদ্ধতি আমাদিগের দেশের উপযোগী করিয়া লওয়া আবশ্যক। কি কি প্রকারে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে আর কি কি প্রকারে অপকর্ষ ঘটিতে পারে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে; এখন বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক কিরূপ কার্য্য, কিরূপ ব্যবহার স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত প্রকৃত পক্ষে সঙ্গত। অনেক সময়ে লোকে স্বজাতির প্রতি অনুরাগের আশ্রয় লইয়া অনেক কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে প্রবর্ত্তিত করে; সুতরাং এখন যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে তাহার সুমীমাংসা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ যদি কেহ স্বজাতির প্রতি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে পরে সে কার্য্যে ভাল না হইয়া মন্দ হইলেও হইতে পারে। যে কার্য্যে কোন জাতির অন্তর্গত সমুদয় লোকের সুখ বৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা সে কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যাহাতে স্থায়ী রূপে দেশের সুখবৃদ্ধি ও দুঃখনিবারণ হয়, সেই দিকেই দেশানুরা-

---

নাই তাহা বোধ কেহ মনে করেন না, তবে কি, এই শিক্ষার ফলে যে দেশীয় ভাব, দেশীয় সভ্যতা, দেশীয় রীতি নীতি, সাহিত্য শাস্ত্রাদির প্রতি কতক পরিমাণে বীতরাগ জন্মিতে দেখা যাইতেছে, এই বীতরাগ যে আমাদের দেশের প্রকৃত উন্নতির প্রতিবন্ধক তাহা বোধ হয় লেখক অস্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না হইত তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণ উপকারীত্বের সম্বন্ধে বোধ করি কাহারো দ্বিবাক্য থাকিত না। ভাঃ সং।

† যদি ইয়োরপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ এইটি মনে রাখিয়া কাজ করেন ত দেশের যথার্থ মঙ্গল হয়। ভাঃ সং।

গের লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। কোন কার্য্যে আপাততঃ লোকের সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইয়া ভবিষ্যতে তাহার বিষময় ফল দেখা দিতে পারে, যেমন নিজে যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধকার্য্যের নিমিত্ত বিদেশীয়দিগকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে লোকে আপাততঃ আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইতে পারে. কিন্তু এইরূপে পরে তাহারা এরূপ ক্ষীণপ্রাণী হইয়া পড়িবে যে তাহারা নিজের ধন, মান, প্রাণ নিজে রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের বিদেশীয়দিগের পদানত হইতে হইবে। সুতরাং এরূপ কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের অনুমোদিত হইতে পারে না। আবার কোন কার্য্যে কোন সমগ্র জাতি অথবা সে জাতির কোন কোন লোকে আপাততঃ কষ্টলাভ করিয়া পরে উহার ফলস্বরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী সুখ লাভ করিতে পারে, যেমন, কোন জাতির মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য আছে আর তাহা ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় লোক দরিদ্র, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে তাহা দ্বারা একরূপে তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় কিন্তু কিছু সঞ্চয় করিতে পারে না ; এখন উক্ত ধনীব্যক্তিরা যদি আপনাদিগের কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগের অবস্থা উন্নত করিবার চেষ্টা করে আর দরিদ্র ব্যক্তিরাও কিছু কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে শীঘ্র ঐ জাতির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা ; আপাততঃ ধনীদিগের অর্থ ব্যয় হইল বটে, আপাততঃ দরিদ্রদিগের কষ্ট হইল বটে, কিন্তু পরে জাতির অবস্থা উন্নত হইলে ধনীব্যক্তিরা তাঁহাদিগের অর্থ দশগুণে ফিরিয়া পাইবেন, দরিদ্রেরাও পূর্ব্বে যেরূপ সুখের কল্পনাও করে নাই সেরূপ সুখ ভোগ করিবে। সুতরাং এস্থলে ধনীদিগের অর্থব্যয় আর দরিদ্রদিগের কষ্টভোগ উভয় কার্য্যই স্বজাতির প্রতি অনুরাগের অনুমোদিত হইবে। জাতির মধ্যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমগ্র জাতির পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা সে কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত। কিন্তু কোন্ কার্য্যে জাতির সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস হইবে, কোন্ কার্য্যে তাহার বিপরীত হইবে, তাহা আমরা সকল সময় স্থির করিয়া উঠিতে পারি না, এরূপ পক্ষে কোন কার্য্য স্বজাতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগের সহিত সঙ্গত তাহা আমরা কিরূপে স্থির করিব ? যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পায় ; সেরূপ কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেহ বলিতে পারেন জাতির মধ্যে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া আর জাতির মধ্যে প্রকৃত সুখবৃদ্ধি বা দুঃখহ্রাস হওয়া এ দুইটী কথার শেষ অর্থ একই। যাহাতে সুনীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেই পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখহ্রাস হইবে আর যাহা পরিণামে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ হ্রাস করিবে তাহাই সুনীতি আনিবে সত্য বটে, কিন্তু কোন কার্য্যে জাতির মধ্যে প্রকৃত রূপে সুখবৃদ্ধি বা দুঃখ

হ্রাস হইবে ইহা অনেক সময় বলিয়া উঠা কঠিন, অথচ সে কার্য্যে যে সকল ব্যবহার সুনীতি-আত্মক বলিয়া আমরা স্বীকার করি সে সকল ব্যবহারের সুপরিণাম হইবে ইহা আমরা বলিতে পারি। এই নিমিত্তই কোন কার্য্য স্বজাতির প্রতি অনুরাগের সহিত সঙ্গত কি না ইহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশে উক্ত দুইটি লক্ষণ, (অর্থাৎ যে কার্য্যে পরিণামে জাতির মধ্যে সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করে) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

লোকের মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কতদূর প্রবল ইহা কিরূপে নির্ণয় করিতে হইবে? স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কোন জাতির মধ্যে যদি বাস্তবিকই প্রবল থাকে, তবে সে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ সমুদয় জাতির হিতের জন্য তাহাদিগের স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে আর যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ প্রস্তুত থাকিবে তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তিও সেই পরিমাণের হইবে। যে জাতির দরিদ্রদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র কষ্ট, সহস্র সহস্র অপমান, সহস্র সহস্র পরপদাঘাত যন্ত্রণা দেখিয়াও ধনীদিগের হৃদয়ে দয়া ও দুঃখের সঞ্চার হয় না, হইলেও তাহা কার্য্যকর হয় না, যে জাতির মধ্যে লোকে বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখদুঃখ লইয়া ব্যস্ত, ভবিষ্যতে যে পর্ব্বতাকার দুঃখ আসিতে পারে, যে দুঃখের ছায়া বর্ত্তমানেও অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হইতেছে, সে দুঃখের বিষয় চিন্তা করে না, সে দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত আগে থাকিতে সচেষ্ট হয় না, সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগের শক্তি অতি অল্পই ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার যে জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে স্বজাতির উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে, যে জাতির নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সাধারণের মঙ্গল সাধন করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সভা আছে, যে জাতির মধ্যে কোন স্থলে একটু মাত্রও উপদ্রব দেখিলে, একটুমাত্রও অত্যাচার দেখিলে, একটুমাত্রও অরাজকতার চিহ্ন দেখিলে সে স্থলে সমুদয় জাতির দৃষ্টি পড়ে, সে উপদ্রব সে অত্যাচার, সে অরাজকতা দূর করিবার নিমিত্ত সমুদয় জাতি একমনে একপ্রাণে উদ্যোগ করিতে থাকে সে জাতির মধ্যে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই অনুরাগ একবার উত্তেজিত হইলে লোকে কিরূপ প্রাণপণে কার্য্য করিয়া থাকে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা তাহার এক জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ প্রাপ্ত হই। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ অনেক প্রকারে প্রজাদিগের নিকট অবিশ্বাস ও অভক্তির পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পিটিসন্ অব্ রাইট্ নামক আইন বিধিবদ্ধ করিতে সম্মতি দিলেন, এই আইনে এই কথা রহিল যে রাজা আর কখনও পার্লেমেন্টের বিনানুমতিতে রাজ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন না, আর তিনি বিচারালয়ে যথোচিত বিচার না করিয়া কাহাকে কারারুদ্ধ করিবেন না,

আর তিনি প্রজাদিগের ঘরে সৈন্য রাখিবেন না, আর তিনি প্রজাদিগকে যুদ্ধের আইনে দণ্ড দিবেন না। এইরূপ আইনে সম্মতি দেওয়ার পর হাউস্ অব্ কমন্স্ তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল; অর্থ সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু রাজা তাঁহার আইনানুসারে কার্য্য করিলেন না, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বেচ্ছাচারীই রহিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষেরা হাউস্ অব্ কমন্সে এই প্রস্তাব করিলেন যে রাজা তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত রাজকার্য্যে যে সকল দোষ করিয়াছেন সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরিত হউক, আর ইহাও বলা হউক যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর প্রতি প্রজারা এখন পর্য্যন্তও অবিশ্বাস করিতেছে। ১৫৯ জন মেম্বর এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন আর ১৪৮ জন ইহাতে অসম্মত হইলেন। রাজা ঐ লিপি প্রাপ্তে ক্রোধ দমন করিয়া হাউস্ অব্ কমন্সের সহিত একমত হইয়া কার্য্য করিবেন এইরূপ কথা প্রচার করিলেন, আর সেই উদ্দেশ্যে হাউস্ অব্ কমন্সের বিশ্বাসভাজন কয়েকজন লোককে মন্ত্রী করিলেন। প্রজারা তাঁহাকে এখন বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিল, লোকের মত তাঁহার স্বপক্ষ হইতে আরম্ভ হইল—কিন্তু চার্লসের স্বেচ্ছাচারী ভাব যাইবার নয়—তিনি মন্ত্রীদিগকে না বলিয়া এক গুরুতর কার্য্য করিলেন, হাউস্ অব্ কমন্স্ হইতে বিপক্ষ দলের পাঁচজন নেতা ধৃত করিবার উদ্দেশে তিনি স্বয়ং সৈন্য সহ তথায় গমন করিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সে পাঁচজন সভ্য তাহার কিছু পূর্ব্বে হাউস্ অব্ কমন্স্ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। চার্লস্ তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু এখন পার্লেমেণ্টে তাঁহার বিরুদ্ধে লোকে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল, রাজ্যের মধ্যে লোকে তাঁহার স্বেচ্ছাচার দেখিয়া দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না। এখন ইংলণ্ডের লোকে বিধি অনুযায়ী শাসন-তন্ত্র পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে সচেষ্ট হইল, এরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া আর তাহারা কতদিন থাকিবে, তাহাদিগের স্বজাতির প্রতি অনুরাগবৃত্তি প্রজ্জ্ব[illegible] উঠিল, আর তাহাদিগকে কে [illegible]।দবে। চার্লস্ উক্ত আইন-বিরুদ্ধ গুরুতর কার্য্য করার পর রাত্রে সমুদয় লণ্ডন সহর অস্ত্রময় হইল, চারিদিক হইতে লণ্ডনে লোক আসিতে লাগিল, রাজার রাজধানীতে থাকা ভার হইয়া উঠিল, রাজা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, অধিকাংশ প্রজারা এখন বিধি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পাইবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আর শান্ত হইল না।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কৈফিয়ৎ।

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে ‘‘পুরাতন কথা” নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে “আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিম বাবুর কতকগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এই জন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গ বাবু আনুষঙ্গিক যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাততঃ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক্।

বঙ্কিম বাবু বলেন ‘‘রবীন্দ্র বাবু ‘সত্য’ এবং ‘মিথ্যা’ এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত ‘সত্য’ ‘মিথ্যা’ বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই * * * ‘সত্য’ ‘মিথ্যা’ প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।”

বঙ্কিম বাবু যে অর্থ মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি। “যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেই খানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।”

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কি। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ, এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ—সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।—এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাই-

তেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া "আরো কিছু"-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশতঃ সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খ্রীষ্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃষ্টীয়ান হইব—আমার নূতন হিন্দুয়ানীতে আবশ্যক ? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি—দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণতঃ Truth বুঝায় ও কেবল স্থল-বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক. সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—"সত্য" বলিতে প্রতিজ্ঞা "রক্ষা" বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়। কেবল-মাত্র সত্য শব্দে বুঝায় না।

তৃতীয়তঃ—বঙ্কিম বাবু "সত্য" শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি "মিথ্যা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থল বিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে—কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই—আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আরেকটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "যদি মিথ্যা কথা কহেন"—সত্য রক্ষা না করাকে "মিথ্যা কথা কওয়া" কোন পাঠকের মনে হইতে পারে না। তিনি হিন্দুই হউন্ খ্রীষ্টিয়ান্ই হউন্ স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন্ আর অনুবাদ-পরায়ণই হউন্ "মিথ্যা কথা কহা" শুনিলেই তাহার প্রত্যহপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জ্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জ্জুন এখানে কোন সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোন প্রকার সত্যের ভাণও করেন নাই। আমি যদি বলি যে, "আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব" ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে ? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়—আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্ত্তমান-সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি

বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যা-বাদী। অর্জ্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন, না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবল মাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সত্যদয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারলেন না—মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশতঃ এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্য বুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশতঃ বিশ্বাস হইয়াছিল যে তথাপি সত্য রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে "মিথ্যা কথা কহা" বলা যায় না। যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিম বাবু এইরূপ বলেন, যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্ব্বজনখ্যাত দ্রোণপর্ব্বস্থ কৃষ্ণের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষতঃ যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সঙ্গত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। "হত ইতি গজে"র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোন অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেই জন্যই বঙ্কিম বাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক্।

বঙ্কিম বাবু এক স্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যা-কথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোন মতেই বোধ হয় না। কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম "লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর

আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "প্রথম, 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি একথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। *পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ-গুণ বর্ণনা করিয়াছি।"

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্ম্মভ্রষ্ট আরেকজন আচারভ্রষ্ট। ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি—কিন্তু আমাকর্ত্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখ স্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন—"আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখ কালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্ব্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশতঃ আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা ভ্রমপ্রমাদসঙ্কুল ও ভ্রম মনে করাই বঙ্কিম বাবুর ন্যায় উদার হৃদয় মহাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্ব্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন—"তার পর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?"

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম "তিনি একটা 'হিন্দুর আদর্শ' কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন" ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে—তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। "একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা" ও একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা" উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা—ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই, বঙ্কিম বাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে বঙ্কিম বাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা

নহে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি, (জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক্ অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিম বাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোন-একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা,—কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিম বাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোন-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কি ছিল? কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিম বাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন— "যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়"—সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন—এ ত আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিম বাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন "প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে" সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভাল ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "লোকহিত" শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এই জন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি বড় বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিম বাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিম বাবুকে

কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে! তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা-অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবল মাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালি-গালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছো-হাটার ত কথাই নাই আঁষ্‌টে গন্ধটুকু পর্য্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ-উক্তি। "মেছোহাটা"ই বল আর "প্রার্থনা মন্দির"ই বল আমি কোথা হইতেও ফরমাস দিয়া কথা আমদানি করি নাই—আমি বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধার ধারি না—হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন্।

বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—প্রথম সংখ্যক প্রচার বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই?' করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কি যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্ত্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্ব্বল-স্বভাববশতঃ আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিম বাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোন ব্যক্তির মুখে এসম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে প্রচার আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জন্য ভাল করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে এক-দিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দু ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধের মর্ম্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য মিথ্যা বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোন অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোন দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিম বাবুর লেখার ভাব এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তি-বিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্র-নাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখামুখী উত্তরপ্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্দ্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম বাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া আদি-ব্রাহ্মসমাজকে দুই এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই, যে, আদি ব্রহ্মসমাজের লেখকেরা উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিম বাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্ত্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোন মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোন পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভাল, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোন হিসাবেই ভাল নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিম বাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষতঃ নব্যহিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিম বাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিম বাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদিব্রাহ্মসমাজের বা "যোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের" কোন যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতর রূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোন অধিকারই নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে

সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোন গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়তঃ আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের হইয়া লিখি নাই। *

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদিব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিম বাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিম বাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদিব্রাহ্মসমাজ নানাদিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনই তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিম বাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গ-সাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ বিদেশী-দ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ-প্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জ্জন দেন নাই—এই জন্য চারিদিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু কখনও তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদিব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষ-পাত হইতে আদিব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিম বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশতঃ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোন অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া এখনো আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবি-

---

* সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কি যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিম বাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে বঙ্কিম বাবু যে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিককথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ-প্রতিষ্ঠা কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পরে চন্দ্রনাথ বাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথাকাটাকাটি হইয়াছিল সে তাঁহাতে আমাতে বোঝাপড়া। বঙ্কিম বাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

নয় নিবেদন এই যে আমি সরল ভাবে যে সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথঠাকুর।

কোথায়।

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

আমরাও সাথে রহিব না,
আমরাও কথা কহিব না,
একটি মুহূর্ত্ত পরে আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

মোরা ব'সে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়!
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপ-ধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায় কোথা যাবে!

কঠিন অনন্ত এ জগৎ
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ!
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখ চাবে!
হায়, কোথা যাবে!

এই দেখ ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল।
পুরান' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
অতি স্নেহ-ভাবে।
হায়, কোথা যাবে!

খেলা ধুলা পড়ে না কি মনে!
কত কথা স্নেহের স্মরণে!
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে!
হায়, কোথা যাবে!

চির কাল তরে হবে পর,
এ ঘর রবে না তব ঘর।
যারা তব কোলে যেত তারাও কি পরের মত।
তাদেরো আর না ফিরে চাবে!
হায় কোথা যাবে!

হায় কোথা যাবে।
যাবে যদি, যাও, যাও, অশ্রু বা[illegible] যাও,
এই খানে দুঃখ রেখে যাও!
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে তাই যেন সেথা মিলে
মুদি আঁখি-আরামে ঘুমাও!
যাবে যদি যাও!

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

মনের কথা যে মনে মনে চালিত হইতে পারে, কোন একটা অজ্ঞাতশক্তিপ্রভাবে মানুষে যে মানুষের মন জানিতে পারে, এ-কথা আমাদের দেশের কাছে নূতন কথা নহে। আমাদের দেশের জনশ্রুতি, প্রবাদ ইতিহাস, শাস্ত্র সকলই,মানুষের এই আশ্চর্য্য শক্তির অস্তিত্বগান গাহিতেছে, সুতরাং আমাদের দেশের জনসাধারণের যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, ত তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু কেবলি আমাদের দেশে নহে, বিজ্ঞানআলোকপ্রোজ্জ্বলিত, সভ্যতাভিমানী, গর্ব্বিত ইয়োরপেও এ বিশ্বাসের একেবারে অভাব নাই। হইলে কি হয়, যতক্ষণ এই বিশ্বাস একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইতেছে, ততক্ষণ ইহার মূল্য বড় অল্প, ততক্ষণ ইহাকে কুসংস্কার বলা যাইতে পারে। সেই জন্য বাস্তবপক্ষে এ বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডে মানসিকশক্তি-অনুসন্ধান-সভা নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। মনের কথা মনে মনে চালিত হয় কি না এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া এ সভার সভ্যগণ যে ফল পাইয়াছেন আজ তাহারই কিছু কিছু সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে এই সভা প্রথম ইংলণ্ডে স্থাপিত হয়। মনের কথা মনে মনে চালিত হইতে পারে কিনা কেবল এই বিষয়টীর অনুসন্ধানই এ সভার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, মনের কথা পাঠ, দিব্য দর্শন, ইচ্ছাশক্তি সঞ্চালন এবং এই শ্রেণীর আরো কয়েকটি বিষয়, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে রীতিমত পরীক্ষা করাই এ সভার উদ্দেশ্য।

ডাবলিন কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক ব্যারেট, ম্যানচেষ্টারের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট,ব্রিষ্টলের রাজকলেজের অধ্যাপক সেলাশ,পদার্থের চতুর্থ অবস্থা আবিষ্কর্ত্তা ক্রুকৃশ্, অধ্যাপক হেনরি সিজউইক, হাউস অব কমন্‌সের মেম্বর আর্থার ব্যালফোর ও জন হল্যাণ্ড,প্রভৃতি ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ ও সমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এ সভার সভ্যরূপে মানসিক শক্তি অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া ইহার গুরুত্ব বিশিষ্ট রূপে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। অধ্যাপক হেনরি সিজউইকই এ সভার সভাপতি। আমাদের অজ্ঞাত কোন মানসিকশক্তি ইন্দ্রিয়ের অতীত রূপে কার্য্য করিতে পারে,কিনা, এ বিষয়ে আগে হইতে পক্ষ বিপক্ষ কোন মতই তাঁহারা প্রবর্ত্তনা করিতে চাহেন না, পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্য মিথ্যা ঠিক করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। তবে আজ কালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ মানসিক শক্তিসম্বন্ধে একটি যে বদ্ধমূল অবিশ্বাস দেখা

যায়, তাহা তাঁহাদের মতে প্রশংসনীয় কিম্বা বিজ্ঞান-সঙ্গত নহে। এই সভার প্রথম অধিবেশন কালে সভাপতি সিজউইক তাঁহার একটি বক্তৃতার মধ্যে এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন যে—"যদি বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীদিগের কথার দশ ভাগের একভাগও সত্য বলিয়া দেখান যায়—তবে এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার (যে সকল ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে) সত্যতা সম্বন্ধে এই যে অমূলক অবিশ্বাস তাহা নিতান্তই নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। আমি বলি, অত যোগ্য সাক্ষীগণের এই সব ঘটনায় বিশ্বাস সত্বেও তবু যে এখনো ইহার সত্যতার সন্দেহ চলিয়াছে এবং এই সকল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য এত লোকের দারুণ ঔৎসুক্য সত্বেও—শিক্ষিত সমাজ যে এই অমূলক অবিশ্বাস লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ইহা একটি ঘোর কলঙ্কের কথা। *

তাঁহারা চান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণের উপর প্রমাণ চালিয়া যদি পারেন এ অবিশ্বাস ধুইয়া ফেলেন। সিজউইক বলিতেছেন, "এত দিন হইতে এই অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে এবং ইহার শিকড় এত বহুদিকে প্রসারিত হইয়াছে, যে ইহাকে মারা বড় সহজ নহে। তবে যদি কোন মতে ইহাকে মারিতে পারি ত সে কেবল প্রমাণের রাশির নীচে ইহাকে জীবন্তে শুকাইয়া শুকাইয়া। আমরা কেবল প্রমাণের উপর প্রমাণ সংগ্রহ করিব; পরীক্ষার উপর পরীক্ষা করিব, এবং সেই পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিগ্ধমনা বাহিরের লোকের মুখাপেক্ষা করিব না, সেই প্রমাণের আধিক্যের উপর আপনাদের বিশ্বাস গঠিত করিব।" †

তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার পক্ষে ইহাই একমাত্র ও প্রকৃত উপায় সন্দেহ নাই। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তবেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তবেই ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া বিজ্ঞানের একটি নূতন যুগ আনিতে পারেন, জ্ঞানের একটি

---

* "That the dispute as to the reality to these marvellous phenomena, —of which it is quite impossible to exaggerate the Scientific importance, if only a tenth part of what has been alleged by generally credible witnesses could be shewn to be true—I say it is a scandal that the dispute as to the reality of these phenomena should still be going on, that so many competent witnesses should have declared their belief in them, that so many others should be profoundly interested in having the question determined, and yet that the educated world as a body, should still be simply in the attitude of incredulity."

Proceedings of the society for Psychical Research.

† Proceedings of the society for Psychical Research. Vol I. Page 12. Para 1.

সম্যক নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে একটি নূতন পথে চালাইতে পারেন।

কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাঁহারা এ সম্বন্ধে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের দেখিতে হইবে।

মনের কথা চালনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়—এ সম্বন্ধে তাঁহারা কিরূপ প্রমাণ পাইলেন এইখানে তাহাই শুধু দেখিব।

মনের কথা সচরাচর আমরা কি উপায়ে জানিতে পারি? প্রধানতঃ কোন ব্যক্তির কথা শুনিয়া, তাহা ছাড়া ইঙ্গিতে, কখনো কখনো বা কোন ব্যক্তির কেবল মাত্র মুখের ভাবেও তাহার মনের কথা জানা যায়। এই রূপে যে কোন প্রকারেই হউক কাহারো মনের কথা জানিতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য অবশ্য আবশ্যক বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত কোন ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে, কেবল মন দিয়া মনের কথা জানিতে পারা যায় কি না, চিন্তার ছাঁচ তুলিয়া লওয়া যায় কি না, তাহাই মাত্র এই সভার সভ্যগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। মনের কথা চালনার যে রকম দৃষ্টান্তে ইন্দ্রিয়ের কিছু মাত্র সাহায্য আছে বলিয়া বুঝা যায়, সে রকম দৃষ্টান্ত ইঁহারা বাস্তবিক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন না—এমন কি, যদি দুইটি বিশেষ ব্যক্তির ভিতর কেবল মনের কথা চালিত হইতে দেখা যায়, তাহাও তাঁহারা প্রমাণের মধ্যে ধরেন না।

তাঁহারা শুনিতে পান, ডারবিসারে ক্রিয়ারি নামে একজন সম্ভ্রান্ত পাদরির কয়টি বালিকা কন্যা আশ্চর্য্য রূপ মনের কথা বলিতে পারে, ইহা শুনিয়া তাঁহারা এই বালিকাগণকে লইয়াই সর্ব্ব প্রথমে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ইহারা ৫টি ভগিনী, সকলেই সুস্থ বলিষ্ঠ ও নীরোগ, বয়স সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার আঠার—ও সর্ব্ব কনিষ্ঠার ১১ বৎসর মাত্র।

ইহাদের মধ্যে ছোটটি ছাড়া আর সকলেই মনের কথা বলিতে পারিত। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এই বালিকাদিগকে পরীক্ষা করা হইত। যে বালিকা মনের কথা বলিবে—তাহাকে অন্য স্থানে পাঠাইয়া তাহার অসাক্ষাতে একটি ঘরে কোন একটি কথা কিম্বা কোন জিনিস কেহ মনে করিতেন, তাহার পর বালিকা সে ঘরে আসিয়া, কাহারো পানে না চাহিয়া, একটি কথা না কহিয়া, নত মুখে নিস্তব্ধে দ্বারের কাছে দাঁড়াইত। এমন কি, কখনো কখনো পরীক্ষার ঘরের মধ্যে সে একেবারে না আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরে থাকিয়া দ্বারের ভিতর হইতে মনের কথা বলিত। তাস ও সংখ্যা লইয়াই বেশীর ভাগ এরূপ পরীক্ষা হইয়াছে। এই পরীক্ষার মোট ফল সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

তাসের পরীক্ষায় প্রত্যেক ৬১০ বার জিজ্ঞাসার মধ্যে ১১৮টি উত্তর, তাহারা একবারেই ঠিক বলিয়াছে, আর ৭৬ উত্তর একবার ভুল বলিবার পর দ্বিতীয় বারে ঠিক বলিয়াছে। এখন ৬১০ এর মধ্যে ১১৮টি ঠিক হইলে গড়ে ৫·১৭ মধ্যে এক এই হিসাবে অর্থাৎ কিছু অধিক প্রতি ৫ বারের ভিতর

একবার করিয়া ঠিক বলা হইল। কেবল দৈবক্রমে যদি বালিকাগণের উত্তর ঠিক হইয়া যাইত, তাহা হইলে এরূপ হইত না, দৈবাৎসিদ্ধি অর্থাৎ যাহাকে চান্স বলা যায়, তাহার গণনার নিয়ম স্বতন্ত্র, সে নিয়ম অনুসারে ৫২ বারের মধ্যে ১ বার ঠিক হইবার কথা।

কেবল এই পর্য্যন্তই সীমা নহে, ইহা হইতে আরো অধিক মাত্রায় একবার বালিকাগণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। একবার উপরি উপরি ২৬০ প্রশ্নের মধ্যে প্রথমবারেই ৬৮টি ঠিক হইয়াছিল, এবং ৩৫টি একবারের পর দ্বিতীয়বারে ঠিক হইয়াছিল, তাহা হইলে এখানে ৩.৮২ মধ্যে এক, অর্থাৎ কিছু অধিক তিনবারের মধ্যে এক বার করিয়া ঠিক হইতেছে, চান্স ধরিলে যাহা কথনই হইতে পারে না।

ইহা ছাড়া নামের পরীক্ষাতেও বালিকাগণ তাহাদের ক্ষমতার কিরূপ আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দেখিয়া বুঝা যাইবে।

মনে করা হইয়াছে	উত্তর
উইলিয়ম ষ্টব্‌স্	উইলিয়ম ষ্টবস,"
সোফিয়া শ	"সোফিয়া শ."
টিমথি টেলর	(প্রথম বারে) (দ্বিতীয় বারে) 'টমটেলর'—"টিমথিটেলর,"
আইজ্যাক হারডিং	"আইজ্যাক হারডিং"
অ্যালবার্ট স্নেলগ্রেব,	(প্র) (দ্বি) "অ্যালবার্ট সিনগ্রোর"—"অ্যালবার্টগ্রোবার,"
টম থম,	"টম থম,"
সিনড্রেলা,	"সিনড্রেলা,"
চেষ্টার,	(প্র) (দ্বি) "ম্যানচেষ্টার"——"চেষ্টার"
পাইপ,	(প্র) (দ্বি) (তৃ) "প্লেট"———"পেপার,"———"পাইপ,"
কর্ক,	"ফর্ক"
কর্কস্ক্রু	"কর্কস্ক্রু"
টংশ্*	(প্র) (দ্বি) "ফায়ার আয়রণস্"———"পোকার"

* টংশ্, ফায়ার-আয়রণ ও পোকার এই কয়টী কিরূপ কাছাকাছি ধরণের জিনিষ পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন।

এই তালিকায়, যে যে স্থলে উত্তরগুলি পূর্ণ ঠিক হয় নাই, সেখানেও তাহা আসলের কত কাছাকাছি হইয়াছে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, প্রকটার বলিতেছেন,

"It appears to me that the failures in these and other cases yet to be cited are as important a part of the evidence in favour of mind reading and mind ruling, as the successes."

মর্ম্ম এই, "আমার মনে হয় যে যে স্থলে উত্তর ঠিক হইয়াছে সেখানেও যেমন, যেখানে ঠিক হয় নাই সেখানেও তেমনি মনের কথা পাঠের পক্ষ সমর্থন হইতেছে।

কি রূপ করিয়া তাহারা মনের কথা ধরিতে পারে—জিজ্ঞাসার উত্তরে বালিকারা বলিয়াছিল, প্রথমেই কাছাকাছি এক রকমের দুই তিনটা কথা, কিম্বা জিনিস তাহাদের মনে আসে, তাহার মধ্যে আবার যেটা তাহারা মনের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট দেখিতে পায়, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেইটা বাছিয়া লইয়া তাহারা বলে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীন ঋষিগণ বেদ উপবেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং যেরূপে বেদ বিভাগ এবং তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন; তৎসম্বন্ধে চরণ ব্যূহে যাহা উক্ত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

চরণ ব্যূহমতে "ঋগ্বেদস্য উপবেদঃ আয়ুর্ব্বেদঃ," অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণ্যুবেদঃ।" (১) অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ এবং অস্ত্রশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের উপবেদ।

পৃথিবীতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তপাঠে অবগত হওয়া যায় সে সময়ে নৃপতিগণ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করিতেন। (২) জল যে বহুরোগনাশক ঔষধ এবং জলে যে বিবিধ ঔষধ উৎপন্ন হয় তাহাও সে সময়ে ভারতবাসীগণ জানিতেন। (৩) সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত না

(১) শব্দকল্পদ্রুম, আয়ুর্ব্বেদ শব্দে দ্রষ্টব্য।

(২) শতংতে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু * * (ঋগ্বেদে ইত্যাদি অনেক আভাস পাওয়া যায়।

(৩) "অপ্ স্বন্তর মৃতমপ্স্ ভেষজমপামুত

হইলেও ঋগ্বেদের পূর্ব্ব সময় হইতেই যে ভারতে আয়ুর্ব্বেদের সূত্রপাত হইয়া ছিল, এতদ্দ্বারা তাহার সম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ধন্বন্তরি সুশ্রুতকে বলিয়াছেন :

ইহখল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব

প্রজাঃ, শ্লোক শত সহস্র মধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ।

ততোহল্পায়ুষ্ট্বমল্প মেধস্ত্বঞ্চাবলোক্যনরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান"

(সুশ্রুত ১ম অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গরূপে, সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লক্ষশ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন। অনন্তর মানবগণের অল্পায়ু ও অল্পমেধা দেখিয়া আটভাগে বিভক্ত করিয়া পুনরায় সংক্ষেপে আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন।

চরক সংহিতায়ও আয়ুর্ব্বেদকে অথর্ব্ববেদের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলা হইয়াছে :— * * *

পরবর্ত্তী ভাবমিশ্র প্রভৃতিও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন :— * * *

বাহুল্য ভয়ে আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

সৌনক মুনি কৃত "চরণ ব্যূহ" গ্রন্থানুসারে আয়ুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের উপবেদ আবার সুশ্রুত চরক প্রভৃতির মতে উহা অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ সুতরাং এ উভয় মতের কোনটী সত্য? আমাদের মতে এ উভয় মতেই সত্য নিহিত আছে। কারণ ঋক্ যজু সাম এই তিন বেদের কোন কোন অংশ সংগ্রহ করিয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি অথর্ব্ববেদ প্রণয়ণ করেন। আয়ুর্ব্বেদ প্রথমতঃ ঋগ্বেদেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। অনন্তর অথর্ব্ব ঋষি বেদত্রয় হইতে অন্যান্য অংশ সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদ বা অথর্ব্ববেদ ইহার যে কোন গ্রন্থের বেদের অন্তর্গত বা উপবেদ বলিলে দোষ হয় না। ঋগ্বেদে বা অথর্ব্ববেদে যে মূল আয়ুর্ব্বেদ ছিল তাহা বহুশতাব্দী যাবৎ লোপ পাইয়াছে। সে মূল আয়ুর্ব্বেদ, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিগণও দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। আত্রেয় ধন্বন্তরি অগ্নিবেশ হারীত কণাদ প্রভৃতি ঋষিগণ সেই মূল গ্রন্থ হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাতে স্বীয় স্বীয় অভিমত গুরূপদেশ প্রভৃতি সংযুক্ত করিয়া যে যে সংহিতা প্রণয়ণ করেন তাহাই বর্ত্তমান সময়ে মূল গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

আয়ুর্ব্বেদীয় কণাদ সংহিতা প্রণেতা মহর্ষি কণাদের মতে আয়ুর্ব্বেদ কোনও বেদের উপবেদ নহে। আয়ুর্ব্বেদই এক স্বতন্ত্র বেদ তিনি আয়ুর্ব্বেদকে পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন ; যথা :—

যদ্বক্তেভ্যঃ পঞ্চ সংখ্যা গতেভ্যো,
যেন জ্ঞাতা ঋক যজুঃ সাম ভেদাঃ।

প্রশস্তয়ে।" এবং "অপসুমে সোমোহব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজাঃ। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুব মাপশ্চ বিশ্বভেষজাঃ। (ঋঃ বেঃ) সোমরসও তখন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত, যথা "সয়কামো অন্নিহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ ১৪ অ, ৯১ সূঃ।

আয়ুর্ব্বেদোঽথর্ব্ববেদশ্চ স্থিতিমাস্তাং শম্ভৌ"
আয়ুর্ব্বেদঃ পঞ্চমো বৈদ্যকাখ্যো বেত্তা ক-
শ্চিত্তস্য নাস্তে মহেশাৎ।
তস্মাদ্ধাতাধ্যৈত তস্মাৎ তুরাষাট্, তস্মাজ্
জ্ঞাত্বা বক্তু মর্হামিশাস্ত্রং।
(কণাদ সংহিতা)

অর্থাৎ যাঁহার পাঁচ মুখ হইতে ঋক্, যজু এবং সামবেদ উৎপন্ন হইয়াছে সেই শিবেই আয়ুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদ বর্ত্তমান ছিল। বৈদ্যকাখ্য আয়ুর্ব্বেদই পঞ্চমবেদ; মহেশ ভিন্ন তাহা আর কেহই জানিতেন না। শিবের নিকট ব্রহ্মা, এবং ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র ইহা অধ্যয়ন করেন। সেই ইন্দ্রের নিকট অবগত হইয়াই আমি এই আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইতেছি।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণেও আয়ুর্ব্বেদকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে; যথাঃ—

"ঋগ্ যজুঃ সমাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈবায়ুর্ব্বেদং চকারসঃ।
কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌবিভুঃ॥
(ব্রহ্ম বৈঃ পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ১৬শ অধ্যায়)

প্রস্থান ভেদ প্রণেতা দণ্ডী মধুসূদন সরস্বতী বলেন:—

"আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ববেদোঽর্থ শাস্ত্রঞ্চেতি চত্বার উপবেদাঃ।"

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমস্কন্ধের উপসংহার স্থলের টীকায় তট্টীকাকার রত্নগর্ভ ভট্টাচার্য্য ও বলিয়াছেন "উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ"

"আয়ুর্ব্বেদ উপবেদ না স্বতন্ত্রবেদ," এ বিষয়ে যেরূপ নানা মুনির নানা মত সেই রূপ আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক প্রভৃতি লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(ক) মহর্ষি কনাদের মতে; শিবই আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু; শিবের নিকট ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট কণাদ ইহা শিক্ষা করেন।

(খ) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে, ব্রহ্মাই আদি গুরু তাঁহার নিকট সূর্য্য এবং সূর্য্যের নিকট ধন্বন্তরি, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, চ্যবণ, জনক, বুধ, প্রভৃতি ষোল জন শিষ্য আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন।

(গ) ধন্বন্তরির মতে ব্রহ্মার নিকট দক্ষ-প্রজাপতি তাঁহার নিকট অশ্বিনী কুমারদ্বয়, তাঁহাদিগের নিকট ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। তথাহিঃ—

ব্রহ্মা প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতিরধিজগে,
তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্র, ইন্দ্রাদহং ময়াত্বিহ
প্রদেয় মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ।
(সুশ্রুত, ১ম অধ্যায়)

(ঘ) হরিবংশ মতে—ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

"কাশীরাজো মহারাজঃ সর্ব্বরোগ প্রণাশনঃ।
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজাৎপ্রাপ্য———

(ঙ) চরকের মতে—ব্রহ্মা হইতে দক্ষ-প্রজাপতি, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়, তাঁহাদিগ হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজ হইতে আত্রেয়াদি মুনিগণ, এবং আত্রেয়ের নিকট অগ্নিবেশ হারীত প্রভৃতি ছয়জন মুনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন।

"ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তং আয়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ।
জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ॥

অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহি কেবলং
ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজ স্তস্মাচ্ছক্র মুপাগমৎ।
.. ..
তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ।
... .
ঋষয়শ্চ ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং।
... ...
অথ মৈত্রী পরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্ব্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যোদত্তবান্‌ষড়্ভ্যঃসর্ব্বভূতানুকম্পয়া
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতূকর্ণঃ পরাশরঃ
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ।
চরক, সূঃস্থান ১ম অধ্যায়ঃ।

(আত্রেয় মুনির অপর নামই পুনর্ব্বসু)

(চ) হারীত সংহিতার প্রতি সংস্কার কর্ত্তা বলিয়াছেন—

আয়ুর্ব্বেদ্ ব্রহ্মণা প্রোক্তং ইন্দ্রেণ তদনন্তরং।
ধন্বন্তরিস্তদাপ্রোক্তং অশ্বিনৌ যমবায়ুনা।(?)
(হারীত, শারীরস্থানের উপসংহার)

(ছ) বাভটের মতে, ব্রহ্মার নিকট দক্ষ, দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমার দ্বয়, তাহাদের নিকট ইন্দ্র, তাঁহার নিকট আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট অগ্নিবেশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ণ করেন—যথাঃ—

"ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতি মজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রি পুত্রাদিকাম্মুনীন॥
তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তেতু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে।
(বাভট)

বাহুল্য ভয়ে আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণ দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত প্রমাণ সমূহের একটীর সহিত অন্যটীর কিছু না কিছু অনৈক্য আছেই, এবং কোনটীর সহিত বিষম মতভেদও রহিয়াছে। তবে ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র পর্য্যন্ত চরক ও সুশ্রুতে বেশ ঐক্য আছে। বাগ্‌ভটে ইন্দ্রের শিষ্য লইয়া ও হরিবংশে ধন্বন্তরির গুরু লইয়া কিছু গোল যোগ দেখা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে সুশ্রুত ও চরকের মতই অধিক প্রামাণ্য॥

মহর্ষি কণাদের মতে, আয়ুর্ব্বেদ প্রথমতঃ এক মাত্র রুদ্রেই বর্ত্তমান ছিল তাঁহার নিকট উহা ব্রহ্মা অধ্যয়ন করেন। একথাটী আপাততঃ নুতন বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক নুতন নহে। কেননা স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি মতে রুদ্রই শ্রুতি তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের একমাত্র আধার, (৪) তাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াই ব্রহ্মা ঐ সমস্ত প্রচার করেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে, স্বাস্থ্য ও বলবীর্য্যাদি লাভের জন্য গৃৎসমদ প্রভৃতি বেদ ঋষিগণ রুদ্রকে প্রার্থনা করিয়াছেন; তাঁহারা রুদ্রকেই ভিষগ্‌দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। রুদ্র প্রদত্ত ঔষধাদিই অধিক স্বাস্থ্যকর ও বলপ্রদ বলিয়া যে ঋষিদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ও সর্ব্বরোগ নাশক পারদের অপর নাম

(৪) মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব ২৮৫ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্ব ১৭শ এবং ১৮শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

"রুদ্রতেজ" বা "রুদ্র"। কথিত আছে রস-(পারদ) সংযুক্ত ঔষধ গুলির অধিকাংশই রুদ্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। রুদ্রভাষিত তন্ত্র সমূহ হইতেই এই সমস্ত ঔষধ সংগৃহীত হইয়াছে। এই নিমিত্তই "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" প্রভৃতি রস গ্রন্থের প্রণেতাগণ রুদ্রকেই একমাত্র আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। রুদ্রই বৈদ্যনাথ নামে চিরকাল সকলের নিকট পরিচিত। বহুবিধ তৈল ঘৃতও রুদ্রভাষিত বা বৈদ্যনাথ-ভাষিত বলিয়া প্রশংসিত। (৫)

এখন দেবলোকের বিষয় যাউক, নরলোকে কোন কোন মহাত্মা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার আরম্ভ হয় তৎ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

হুগলির ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছবি।

দেড় শত বৎসরেরও পূর্ব্বেকার কথা হইতেছে; এই সময় একদিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছেনা, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশ জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতায় জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড় বড় বট অশ্বত্থের রাশি রাশি পাতার ফাঁক দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকূল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর

(৫) মহাভারতের অনেক স্থানেও রুদ্রকে "বৈদ্য শ্রেষ্ঠ" ও ধন্বন্তরি বলা হইয়াছে।

এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সূঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, ‘বুঝিয়াছি করীম, চোখ ছাড়’’ করীমও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি ছবি ধরিয়া বলিল,"কেমন বল দেখি"। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইঁহারা হিন্দু নহেন। করীম ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহে। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান করীম। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। করীম ও মুন্না বরাবর এক বাড়ীতেই থাকিত, উহারা দুইজনে প্রায় সমবয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহারা পরস্পরকে ভাল বাসে। করীম দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাব জ্যোতি পূর্ণ; নবীন শ্মশ্রু-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ, অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত; প্রশস্ত বক্ষ শালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে সে যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চায়।

করীমের হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না করীমের দিকে ফিরিয়া বসিল, তাহার পর হাসিয়া অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল" এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?’’ করিম বলিল, “কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?’’

মুন্না। “এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না’’

করিম। “কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না’’

মুন্না। ‘‘তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর,"

করীম। "তুই ভাই আদরটা একবার

দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, "তোমার বেলায় ভাল জিনিষের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

করিম। "বুঝিলিনে, এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ," মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

করিম। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক মেয়ে জাত। তাইত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল।" বলিতে বলিতে করিম একটু হাসিল, সে হাসিতে তাহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ বিদ্রুপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল, মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি, উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।" করীম ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তুমি কানাকড়িও দিলে না, কিন্তু এর মধ্যে এর হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কেসে?"

করিম। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি মহম্মদ মসীম।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা করিম জানিত, কিন্তু সেই সম্ভাবিত কষ্টটাকে উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে করিম কথা পাড়িয়াছিল। মুন্নাকে বিষণ্ণ দেখিয়া করিম তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে মসীম এই ছবিখানি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অমন অতুল ঐশ্বর্য্য সবত যায় যায়, তুমি কি একটি কথা কহিবে না"।

চোখের জল চোখে রুদ্ধ করিয়া মুন্না বলিলেন, "ভাই যাহার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে"। সে কথায় সে স্বরে করীমের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল, ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া করীম বলিল "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত"।

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী, ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কথনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, সে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্রুদ্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। করীম তাহা বুঝিতে পারিল—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিল "কিন্তু যার ধন সে যদি পাগল হইয়া

যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না''—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে চাহে তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই। যে হৃদয় একবার প্রেম প্রতিদান পাইবার পর সে প্রেমে সন্দেহ করিয়াছে, যে সন্দেহে যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনায় অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মাহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভস্মীভূত করিলে হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে করীমকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব''—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, করীম বাহিরে চলিয়া গেল। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুক্কায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন

তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলা বালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাওয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্ন মোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া, আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহিরের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, মসীমের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষীণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। মহম্মদ মসীম অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—" মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। মসীম এদিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন,তাহার মনে হইল স্বর্গের একটি হুরি বুঝি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে,—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোকর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মুন্না"—মসীমের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুন্‌ননা—তুম্‌নি—ক্যা—আ ন" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় করীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার, দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল, কিন্তু মসীম তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। করীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলের সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে," মসীম আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন"

সকালে মসীম যতকথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাঁহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহারপর অপরাহ্ণে উঠিয়া বেশবিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তারপর মসীমের নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এতসঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। মসীম কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগেকার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন,"কোথায় পাইলে?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল,"করিম ভু এক টাকায় কিনিয়া আনিয়াছেন।" মসীম আরো জ্বলিয়া গেলেন, তাঁহার হাজার টাকার ছবির মত ছবি যে করীম ভু এক টাকায় কিনিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না, স্খলত সুশ্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার বলিল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি কেউ লয় নাই, সে যেখানকার সেই খানেই আছে, চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখিতে পাইবেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দেয়ালে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই খানেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকা চোরা কর্কশ স্বরে বলিলেন তুমি কে? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা কোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল "আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া, চরণ করিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।" এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতাল অবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু মসীমের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, আহাম্মব! ধন রত্ন যদি খোয়াইলাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন? তোমার ঐ অল-

ঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এ অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি ? আমার মত দুখিনীর আবার সাজ সজ্জা কি ? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে ? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরিনা,—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে ? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে,"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। মসীমের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় মহম্মদ মসীমের সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দুএক বোতল মদ আনিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ।

তারা।

আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল, বাড়িটির চারধারে কেমন বেশ বাগানে ঘেরা একটি সরু ঝিল, ঝির্ ঝির্ কোরে ব'য়ে যেত, আমরা সন্ধেবেলা তার ধারে ধারে যুঁই ফুল তুল্‌তে যেতুম, আমাদের বেশ একখানি বাড়ি ছিল।

একদিন যুঁই তুল্‌তে তুল্‌তে বরু বোল্লে "দাদা, কবে বাবা আস্‌বেন ?" আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে প্রজাপতি ধরবার তরে ছুটে গেল, আমার আর উত্তর দেওয়া হ'ল না, কেন না বরুর কাছে বাবার কথা তুলতে আমার ইচ্ছা ছিল না, বরু ছোট মেয়ে, বয়েস সবে সাত বৎসর, আমাদের প্রাণে সকলি সয়, কচি প্রাণে আঘাত দিতে বড় ব্যথা লাগে, তাতে সে কিছুই বুঝ্‌ত না, আপনার মনে ফুল তুল্‌তো, আপনার মনে কতকি গান গাইত, আর কখনো কখনো আকাশের পানে এমনি ভাবে চেয়ে থাক্‌ত, যেন সেথা তার কত সাধের বাড়ি ঘরদোর ফেলে এসেছে। চাঁদ দেখ্‌তে যেমন সকল মেয়ে ভালবাসে, সে তেমন বাস্‌ত না, সে কেবল তারাদের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌ত, তারাদের ভিতর যেন তার কতকি লুকান আছে। যে দিন পূর্ণিমা, আকাশে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় আকাশ ডুবে গেছে, আর্ ঝুর ঝুর কোরে মধুর বাতাস বইছে, বরু সে দিন চুপ্ কোরে একেলা জানালাটির ধারে বোসে থাক্‌ত, কারো সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইত না, কেবল যখন 'মা' তাকে আদর কোরে চুমো খেতে চাইতেন, তখন সে দুটি হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধোরে এম্‌নি ভাবে চুমো খেত, যেন তার আর চুমো খাওয়া ফুরোবে না, সে যেন আর্ মায়ের কোল থেকে উঠ্‌তে চায় না, সে যেন মায়ের বুকের উপর মাথা রেখে চিরকাল স্বপ্ন দেখ্‌তে চায়। মা যখন তাকে

জিজ্ঞাসা কোরতেন, 'বরু, তুই বুঝি আগে তারা ছিলি, তাই তোর চোখ দুটিতে এখনো তারার আলো ভাসছে?' সে তখনই ছোট মাথাটি দুলিয়ে, কচিমুখখানিতে হাসতে হাসতে বলত "হাঁ মা আমি তারা ছিলুম"। সেই দিন হইতে বরুকে আমরা তারা বলিয়া ডাকি।

শ্রীঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মিশর যাত্রী-বাঙ্গালী। শ্রীশ্যামলাল মিত্র প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের পুস্তক এই নূতন। লেখক মিসর যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছেন তাহাই অতি হৃদয়গ্রাহীরূপে এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতপুরুষদিগের যুদ্ধ চাতুর্য্য মিশরবাসীদিগের রীতি নীতি, আতিথেয়তা প্রভৃতি সকলি এরূপ সুন্দর রূপে লেখা, যে যিনি ইহা পড়িবেন, তিনি যেন তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষ লেখকের প্রতি এবং অন্যান্য ভারতবাসীর প্রতি একজন কাপ্তেনের সেই নিদারুণ অত্যাচার পড়িতে পড়িতে শরীরে কাঁটা দিয়া উঠে, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া আসে। আমাদের অনুরোধ প্রত্যেক বাঙ্গালীই এ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখুন, তাহা ছাড়া ইয়োরপীয়গণও যাহাতে ইহা পড়িতে পারেন সেই জন্য ইংরাজিতেও এখানির অনুবাদ বিশেষ প্রার্থনীয়। শ্বেতপুরুষগণ তাঁহাদের সাধুতা তাঁহাদের সদ্ব্যবহার একবার প্রত্যক্ষ করুন। আন্‌কল্ টমশ্ ক্যাবিন পড়িয়া ইয়োরপে যেমন হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, ক্রীত দাসদিগের কষ্ট যেমন তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এই বইখানির অনুবাদ পড়িয়া ততদূর না হউক, ভারতবাসীদিগের দুর্দ্দশা যদি তাঁহারা কতকটাও অনুভব করেন তবে একটি মহা ফললাভ হইবে।

বিবিধ সন্দর্ভ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নগেন্দ্র বাবু সময়ে সময়ে বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহাই একত্রে সংগৃহীত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু একজন সুলেখক, ইনি বঙ্গ সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, ইহার পর আবার তাঁহার এই প্রবন্ধ গুলি পূর্ব্ব হইতেই সাধারণে সমাদৃত হইয়াছে, এখন নূতন করিয়া ইহার প্রশংসা গান করা বাহুল্য মাত্র।

গৃহ মুকুর। প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত রামদয়াল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে যে সমস্ত সদুপদেশ আছে, তাহা পালন করিলে প্রত্যেক ঘরেই উপকার হইতে পারে। "সন্তান পালন" ও "সূতিকা গৃহ" সম্বন্ধে ইনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সারগর্ভ।

চারুনীতি-পাঠ। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। এ পুস্তকখানি রচনার প্রথা অতি সুন্দর। ইহা কেবব মাত্র নীরস উপদেশ বাক্যে পূর্ণ নহে। গ্রন্থকর্ত্তা উত্তম উত্তম গল্পদ্বারা বেশ নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে কেবল মাত্র বালকের কেন অনেক বৃদ্ধেরও উপকার হইতে পারে।

সেন রাজগণ।

বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৫৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই। মিত্র মহোদয় যে কেন অশোকচন্দ্রকে "অশোকসেন" লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে অরোহণ করেন। শেষ গৌড়েশ্বরের নাম যে প্রকৃত পক্ষে "লক্ষ্মণ" ছিল তাহা তাঁহার সমসাময়িক "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পশ্চিমদেশে লক্ষ্মণকে সাধারণতঃ "লছমণ" বা "লক্ষমণ" বলা হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিহাসলেখক মিনহাজ তদনুসারে তাঁহাকে "লক্ষ্মনিয়া" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ নামবৈচিত্র বা গণ্ডগোল দৃষ্ট হয় না।

মিনহাজই সিরাজ তাঁহার তবকত-ই-নেছারি গ্রন্থে রাজা "লক্ষ্মনিয়ার" জন্ম সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রাজা যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার উদরোপরি রাজমুকুট স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজমাতার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিলেন,"এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত দুর্ভাগা হইবে এবং এই শিশু কখন রাজমুকুট লাভ করিবে না। আর যদি দুই ঘণ্টা পরে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অশীতি বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজদণ্ডধারণ করিবেন।" এই সংবাদ রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ শুভলগ্ন উপস্থিত না হয়, সেই অবধি আমার পাদদ্বয় উপর দিকে বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" তদনুসারে কার্য্য হইল। দুই ঘণ্টা অন্তর রাজমাতার বন্ধনমোচন করা হইলে লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার মাতা সেই মুহূর্ত্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অমাত্যগণ লক্ষ্মণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ৩৯

মিনহাজের লিখিত গল্প হইতে এইমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মণ তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশবাবধি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মিনহাজের লিখিত বাক্য লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ পোষণ করিতেছেন। তিনি 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন বাৎস গোত্রে (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে ৪০)

৩৯ Raverty's Tabakat-i-Nasiri. page 554.

৪০ হলায়ুধ। (ভারতী, সপ্তমভাগ ৩৩২ পৃষ্ঠা।) দেখ।

ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিণী ছিলেন। সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশান, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশান ব্রাহ্মণদিগের "আহ্নিক পদ্ধতি," হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" ও পশুপতি "পশুপতি পদ্ধতি" নামক শ্রাদ্ধাদিকৃত্য প্রস্তুত করেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত-যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। ৪১

মিনহাজ বলেন যে "লক্ষণিয়া" ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই রাজা যে ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল গৌড়ের রাজাসনে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারণ যদি আমরা বিবেচনা করি যে, হলায়ুধ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপণ্ডিত ও ২৫ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মন্ত্রী ও তাহার পর হইতে ধর্ম্মাধিকারে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হলায়ুধের আশ্রয়দাতা লক্ষ্মণসেন দেব ৪০ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অব্দের পর বৎসর অর্থাৎ ১০৮২ শকাব্দে (১১৬০ খৃষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ইহা স্বীকার করিয়া, এক্ষণে আমাদের দেখা উচিত, তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন।

মুসলমানগণ বলেন লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় বাস করিতেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন গ্রন্থে কিম্বা শাসনপত্রাদিতে নদীয়া বা নবদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অতএবই বোধ হয় এই রাজা লক্ষ্মণিয়াই নবদ্বীপে রাজপাঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক মুসলমান সেনাপতি খিল্‌জি দেশোদ্ভব বখতিয়ার পুত্র মহম্মদ প্রকাশ্য "মহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জি" বিহারজয়ের দুই বৎসর অন্তে নদীয়া নগরী অধিকার করেন।

মিনহাজ লিখিয়াছেন, মহম্মদ বখতিয়ার কর্ত্তৃক বিহার অধিকৃত হইলে তাঁহার যশঃসৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে তাহা লক্ষ্মণসেন দেবেরও কর্ণগোচর হইল। বহুসংখ্যক জ্যোতির্ব্বিদ, জ্ঞানী, ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই দেশ তুরকীদিগের হস্তগত হইবে, এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হওয়ার সময় উপস্থিত। তুরকীয়েরা বিহার অধিকার করিয়াছে, পর বৎসর তাহারা অবশ্যই এ দেশে উপস্থিত হইবে। অতএব আমা-

৪১ বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তনুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপাল-নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥
ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, (১। ১২)।

দের বিবেচনায় মহারাজ এ প্রদেশবাসী সকলকে লইয়া অন্যত্র গমন করিয়া তুরকীয়দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষার উপায় করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করি[illegible] যে ব্যক্তি এই দেশ অধিকার করিবে[illegible] গ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি ন[illegible]হারা বলিলেন, আছে, তিনি আজা[illegible]হু ৪২। রাজা বলিলেন, তবে ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা হউক। মহম্মদ বখতিয়ারকে দর্শন করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। সেই দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা পোষণ করিল।

মিনহাজের গ্রন্থ হইতে যে গল্পটী সংকলিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে যে কি সত্য লুক্কায়িত আছে আমরা তাহার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশ জন্য কতপ্রকার জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের কয়েক জন সভাসদকে যে মহম্মদ বখতিয়ার হস্তগত না করিয়াছিলেন ইহাই বা কি রূপে বলা যাইতে পারে। নচেৎ তুরক কর্ত্তৃক গৌড়াধিকার ও কদাকারের আদর্শস্থল মহম্মদ বখতিয়ারের রূপ বর্ণনা কেন হিন্দু শাস্ত্রে সন্নিবেশিত থাকা প্রকাশিত হইবে। যদি এ বৃত্তান্তটী যথার্থই গল্প না হয় তাহা হইলে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজ্‌দৌলার পতনের ইতিহাস কি আমাদিগকে এরূপ অনুমান করিতে প্রণোদিত করে না?

এই ঘটনার পর নদীয়ার অধিকাংশ অধিবাসী সমতট-বঙ্গ ও কামরূপ প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রায় লক্ষ্মণসেন দেব অটলভাবে স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পর মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজি বৃহৎ একদল সৈন্য সহ আসিয়া নদীয়া অধিকার করিলেন। মহম্মদ বখ্‌তিয়ার যখন নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, তখন কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে ছিল। নগরবাসীদিগের নিকট তাঁহারা অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই ছদ্মবেশী ঊনবিংশ অশ্ববিক্রেতা রাজনিকেতন মধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিল। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা একটী ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে মহম্মদ বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রস্তুত নদীয়াবাসীদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। রাজা লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না, অগত্যা সপরিবার খিড়কি দ্বারে বাহির হইয়া "সমতট বঙ্গে" প্রস্থান করিলেন।"

---

৪২ Raverty's Tabakat-i—Nasiri. page. 556.

আমরা মিনহাজের গ্রন্থ হইতে এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম। মিনহাজ লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ বখতিয়ার এইরূপ দ্রুতগমন করিয়াছিলেন ৪৩ যে, কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সহিত গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ দ্রুত গমনে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণ যে নগর আক্রমণকালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইহা জাতীয়-পক্ষপাতান্ধ মিনহাজও স্বীকার করিয়াছেন। ৪৪ মহম্মদ বখতিয়ারের নদীয়া অধিকারের প্রায় ৪০ বৎসর অন্তে মিনহাজ গৌড়ে আসিয়া দুই একজন বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট যে সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন ২০ বৎসর অন্তে তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও স্বীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা গল্পনবিস বৃদ্ধদিগের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া মিনহাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই অতিরঞ্জিত ঘটনায় তিনি আবার কবিত্বশক্তি ফলাইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্সমান-প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ রঙ্গের উপর রং চড়াইয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে মহম্মদ বখতিয়ার বাঙ্গালা বিজয় করিয়াছেন। ৪৫ মার্সমানের ন্যায় একজন সদাশয় ধর্ম্মপ্রচারক যে কিরূপে এই মিথ্যাবাক্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে জাতীয় ইতিহাসলেখক হিন্দুকুলভূষণদিগের পরলোকগমনকে [illegible] রকে গমন" বলিয়া লিখিতে কিছু [illegible] ঠিত হন নাই মিনহাজ সেই [illegible] লেখক। তিনি যে জাতীয় গৌরব [illegible] জন্য তাঁহার শ্রুত গল্পের উপর আরও কিছু রং চড়াইতে ত্রুটি করেন নাই, ইহা বোধ হয় কোন সদাশয় পাঠকই অস্বীকার করিবেন না। মিনহাজের লেখা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়" ইহা নবনির্ম্মিত মিথ্যা বাক্য।

---

৪৩ Raverty's Tabakat-i-Nasiri page. 557.

৪৪ ঐ গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠা দেখ।

৪৫ মেজর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "মহম্মদ বখতিয়ার তাঁহার বৃহৎ সেনাদল নগরপ্রান্তে এক বন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ অশ্বারোহীর সহিত নগরে প্রবেশ করেন। তিনি দূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং নদীয়াবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। পরে তিনি যখন রাজবাটীর মধ্যে (আহারের সময়ে) প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিলেন অমনি তাহার সৈন্যগণও বন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল। (Stewart's History of Bengal. page. 44.) ষ্টুয়ার্ট কোন্ গ্রন্থ হইতে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকার নিশ্চয়ই একটী চক্রান্তমূলক কার্য্য। বাঙ্গালার অদৃষ্ট চিরকাল চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

তৎপরে মিনহাজ বলেন রায় লক্ষণিয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সমতট বঙ্গে" গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালকবলিত হন। তাঁহার উত্তর পুরুষ অদ্যাপি (৬৫৮ হিঃ অঃ ১২৬০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজধানী সমতট নামে পরিচিত ছিল। ইহা আমরা পাঁচ-বৎসর পূর্ব্বে বিশেষ রূপে দর্শাইয়াছি। ৪৬ মিনহাজের গ্রন্থে সমতট নামটী বিকৃতভাবে লিখিত আছে। হস্তলিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে কোনটীতে "সনকট, কোনটীতে সক-নট" অন্য কোনটীতে "সনকনট" দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মিনহাজের কিম্বা তাঁহার পরবর্ত্তী নকলনবিসদিগের ভ্রম। যেস্থলে মিনহাজ বারংবার "সনকট" শব্দের সহিত "বঙ্গ" যোগ করিয়াছেন, সেস্থলে তিনি যে সমতট বঙ্গকে লক্ষ্য করিয়াছেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবকত-ই-নাছরি গ্রন্থের অনুবাদক মেজর রেবার্টী সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ৪৭

পরবর্ত্তী মুসলমান ইতিহাস "তবকত-আকবরি" ও "তজকরত উল মুলুকে" লিখিত আছে যে, রাজা লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। ৪৮ বৃদ্ধ মিনহাজের বাক্য এস্থলে সমধিক প্রামাণ্য। মিনহাজ ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহম্মদ বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া রাঢ় দেশের উত্তরভাগ ও বরেন্দ্রের পশ্চিম ভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। "বঙ্গদেশ লক্ষ্মণের অধিকারে ছিল, তাহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি সেই দেশ শাসন করি-তেছেন।"

এক্ষণে দেখা যাউক লক্ষ্মণসেন দেব কোন্ বৎসর নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেজর রেবার্টী সাহেবের মতে ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। ৪৯ বুকমান সাহেবের মতে ১১২৫ শকাব্দে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধি-কার করেন। ৫০ টোমাস সাহেবের মতে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃঃ অঃ ৬০০ হিঃ অব্দে) লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করেন। ৫১ কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১১২৯ শকাব্দে (১২০৭ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ

৪৬ ভারতী চতুর্থ ভাগ। ১২১—১২৫পৃষ্ঠা

৪৭ The part meant by our author more probably refers to a province of Eastern Bang. Raverty's Tabakat-i Nasiri p. 557.

৪৮ মেজর ষ্টুয়ার্ট এই মত অবলম্বন করেন। তদনুসারে পরবর্ত্তী ইংরাজ ও বাঙ্গালি লেখকগণ ষ্টুয়াটের প্রদর্শিত ভ্রম-মার্গে বিচরণ করিতেছেন।

৪৯ Tabakat-i Nasire, and J. A. S. B. XLIV. part 1 page 277.

৫০ J. A. S. B. XLII part 1. pp. 206, 211.

৫১ Joarnal. Royal As. Society (1873) Vol. VI. p. 340. and J. A. S. B. XLII part 1. p. 343.

বখ্‌তিয়ার নদীয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ৫২ আমরা বুকমান কিম্বা রেবার্ট সাহেবের মতানুমোদন করিতে পারি না। কারণ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৯৯ লক্ষ্মণাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।৫৩ এই সময়ে লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক গ্রন্থকারের লেখা অবশ্য পরবর্তী লেখকদিগের লিখিত বাক্য অপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে এই গ্রন্থ রচনার পর লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমরা বিজ্ঞবর টোমাস সাহেবের মতে অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে ১১২৭ শকাব্দের (১২০৫ খৃঃ অঃ) শেষভাগে মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জীবিতকালে ঐ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১১৮২ শকাব্দে (১২৬০ খৃঃ অঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনও তিনি লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। তৎপরে "তওয়ারিখে ফিরোজ সাহি" লেখক জইয়ে বারণি লিখিয়াছেন ১২০২ শকাব্দে (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুলতান বলবন যখন বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দিন তুগ্রলের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর ধনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণসেন দেবের নদীয়া হইতে পলায়নের ৭৫ বৎসর পরে ও বঙ্গদেশ তাহার উত্তর পুরুষের হস্তে ছিল।

সামসুদ্দিন আবুল মোজফর ফিরোজ সাহের শাসনকালে ১২৯—১২৪৯ শকাব্দের (৭০২—৭২২ হিজরী অব্দ, ১৩০৭ হইতে ১৩২৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন এক সময়ে বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের হস্তে আইসে। কারণ টোমাস সাহেবের প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবে দৃষ্ট হইতেছে যে ফিরোজ সাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা সুবর্ণগ্রামের টাকসালে মুদ্রিত হইয়াছিল। ৫৪ অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রায় এক শত বৎসর কাল লক্ষ্মণ সেন দেবের উত্তর পুরুষগণ প্রকৃত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধারাবাহিক নাম আমরা কোন স্থা-

---

৫২ Asiatic Researches. Vol. IX. page. 203.

৫৩ শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্যাহি রসরসচাব্দে॥

মিত্র মহোদয় তাহার Notice of Sanskrit MSS-এর তৃতীয় খণ্ডে এই কবিতাটী বিকৃত অবস্থায় উদ্ধৃত করিয়াছেন (pp. 134. 149.) তাহাতে দুইটী ভয়ানক ভুল আছে। প্রথমতঃ কবিতার উভয় পদের অর্থ পরস্পর বিপরীত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ছন্দো ভঙ্গ দোষ হইয়াছে। কারণ এই কবিতা আর্য্যাছন্দে লিখিত। এই ছন্দের নিয়মানুসারে প্রথমার্দ্ধে ত্রিশ মাত্রা, দ্বিতীয়ার্দ্ধে ২৭ মাত্রা হইবে। মিত্রমহোদয়ের প্রকাশিত কবিতার দ্বিতীয় অর্দ্ধে ২৫'এর অধিক মাত্রা নাই। যাহা হউক ভক্তিভাজন মিত্র মহোদয় ইহার জন্য দায়ী নহেন। তিনি যে হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থলেখকই তাহার দায়ী।

৫৪ Thomas. Initial coninage of Bengal. (J. A. S. B. Vol. XXXVI. part 1. p. 45.)

সেই প্রাপ্ত হইতেছি না। মিত্র মহোদয় অনুমানের সাহায্যে তিন জন রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বল্লালসেন (দ্বিতীয়)
সুসেন—
সুরসেন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা কেবল অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

তাম্র ও প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া আমরা সেনরাজগণের নিম্ন-লিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম। সমস্ত খোদিত লিপিতে এই রাজবংশকে চন্দ্রবংশজ বলা হইয়াছে। উহাঁরা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষত মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠ কুল হইতে উদ্ভূত। ভারতের রাজণ্যবর্গ ইহাঁদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কোন বর্ণসঙ্কর জাতি হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না ও খোদিত লিপিতেও "চন্দ্রবংশ" "ওষধিনাথবংশ" ও "সোমবংশ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত না। কারণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের এরূপ পরিচয়ের অধিকার নাই। মিত্র মহোদয় পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রাজা সুসেনকে সোমবংশীয় লেখা হইয়াছে। ৫৫

প্রাচীনকালে ভারতে অম্বষ্ঠ নামে এক-দেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণের, দ্বিতীয়াংশ, তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের সংক্ষিপ্ত ভূগোল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে "অম্বষ্ঠা" শব্দ দ্বারা সেই নামখ্যাত দেশবাসীদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৫৬ মহাভারত, সভাপর্ব্বে নকুলের দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চ কর্পট, মধ্যমক, বাটধান" কে পরাজয় করিয়াছিলেন। ৫৭ বরাহমিহির "মেকলাম্বষ্ঠা" এই দুইটী দেশের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ও অন্যান্য গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বোধ হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে, নর্ম্মদাসান্নিধ্যে অম্বষ্ঠ দেশ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ পূর্ব্বে সেই দেশে বাস করিতেন। এ জন্যই তাঁহারা লোকসমাজে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। পরে যখন কেবল কায়স্থ জাতিই সমস্ত ভারতে অম্বষ্ঠ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন, তখন সেনরাজগণও কায়স্থ জাতীয় বলিয়া খ্যাত হন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যজাতীয় রাজবল্লভ উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ অভিন্ন অবধারণ করিয়া আপনাকে বল্লাল বংশজ পরিচয় দিতে লাগিলেন সেই সময় হইতে সেন রাজগণ আমাদের দেশে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহোদয় সর্ব্বপ্রথম খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অবধারণ করেন। তমসাচ্ছন্ন গুহায় নিপতিত সত্য উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। এই

৫৫ তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেদ্রাজা সুসেনাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥
Indo-Aryan. Vol. 11. p. 266.

৫৬ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয় অংশ ২৬ পৃষ্ঠা।

৫৬ সিংহ মহোদয়ের মহাভারত সভাপর্ব্ব ৪৫ পৃষ্ঠা।

প্রস্তাবের কোন কোন স্থানে আমরা মিত্র মহোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন ও তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন করি নাই। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা ঐতিহাসিক জগতে বিচরণ করিতেছি, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে অনন্ত কাল স্বীকার করিব।

বংশাবলী।

(চন্দ্র)

*

*

বীরসেন। দাক্ষিণাপথনিবাসী।

*

*

সামন্তসেন। ঐ

|

হেমন্তসেন ঐ

|

১। মহারাজ বিজয়সেন দেব। গৌড়ের প্রথম রাজা।

|

২। ,, বল্লালসেন দেব।

|

৩। ,, লক্ষ্মণসেন দেব।

|

৪। ,, মাধবসেন দেব ৫। কেশবসেনদেব

*

৬। ,, হরিব্রহ্মদেব

*

৭। অশোকচন্দ্র দেব।

*

৮। লক্ষ্মণসেন দেব। ১১২৭ শকাব্দে নদীয়া হইতে পলায়ন করেন।

*

সুসেনদেব।

*

দনুজ রায়।

*

বল্লালসেন দেব (দ্বিতীয়।)

দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে মুসলমানগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন। ইহা একটী প্রবাদ বাক্য। দীর্ঘকালাবধি এই প্রবাদ বিক্রমপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরেজি, বাঙ্গালা বিবিধ পুস্তকে দেশপ্রচলিত প্রোক্ত প্রবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বংশাবলীর শেষভাগে আমরা যে তিন জন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে সুসেনের নাম হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। দনুজরায়ের নাম বারণির লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় বল্লালসেনের নাম দেশপ্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগৃহীত। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ওই নামটী বিশ্বাস করিতে পারেন, না করিলেও আমাদের কোন আসিয়া যায় না। কিন্তু আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে দর্শন করিয়াছি যে, বল্লালসেনের সময়ে "বা আদম" নামে জনৈক মুসলমান প্রকৃত বঙ্গ দেশে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান জয়পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সেন রাজগণের চিহ্ন মাত্র লোপ পাইয়াছে। বঙ্গীয় আর্য্য-গৌরব-ভাস্কর চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

গোঁড় গীত।

উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত গোঁড়দেশ বিস্তৃত। হোসঙ্গাবাদ, জব্বলপুর, মাণ্ডলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের প্রায় সমুদয় জেলাতেই গোঁড়ের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারক হিস্‌লপ গোঁড়দের কতকগুলী গীত সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিসনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) ঐ সকল গীত ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্ দিয়া) বাঙ্গলা অনুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওয়া হইয়াছে। গীতগুলি গোঁড় সমাজের ক্রমবিকাশ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পঠিত। কিন্তু তা ছাড়া উহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়—গোঁড়রা মহাদেব পার্ব্বতী প্রভৃতি হিন্দু দেব দেবীর ধার ধারে না; তাহাদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র কিন্তু গীতগুলির আসল গঠন যে গোঁড়ী তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম ভাগ।

গোঁড়ের কারাবাস।

জনমিয়া গোঁড় বনে ছড়ায়ে পড়িল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ কিম্বা নিম্ন উপত্যকা,
গোঁড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়।
যা কিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার;
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিস, শূকর,
ষাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা,
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়। *
ছয় মাস ধরে গোঁড় স্নান নাহি করে;
মুখ নাহি ধোয় কভু; গোবরের পর
স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহে; † ছিল এইরূপ
গোঁড় সৃষ্টির প্রথমে; পূরিল অনিল
দুর্গন্ধে ধবলাগিরি শিবের আবাস।
ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী বলে ডাকি নারায়ণে;
"কলুষিত সব স্থান করিলেক গোঁড়;
ধ্বংশিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার।
এহেন ধবলাগিরি, বাস স্থান মোর,
পূরিত দুর্গন্ধে এবে; আন হেথা গোঁড়"।
দলে দলে গোঁড় তবে হইল আনীত;
লয়ে তাহাদিগে নিম্নে, উপত্যকা মাঝে,
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে,
নিরমিয়া এক কাঠবিড়ালি তখন,
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া।
খাড়া করি লেজ কাটবিড়ালি দৌড়ায়;
দেখি তারে গোঁড় সব উঠিল দাঁড়ায়ে,
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে "মার,"

* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি এরূপ খাইয়া থাকে।

† নিতান্ত অসভ্য গোঁড়ের পক্ষে এ-চিত্রটী এখনও অযথার্থ নহে।

না পায় দেখিতে কিছু; কভু বসিতেছে,
দাঁড়াইছে কভু, লম্ফ দিতেছে কভু বা,
গড়াগড়ি যায় কভু আরম্ভিল নৃত্য।
রাক্ষসী † প্রভাতে আসি ঘরের বাহির,
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত।
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল;
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহু,
নোয়াইয়া ঘাড় নৃত্যও করিছে
ভস্মাসুর নাচে
হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য; দেখিয়া তাহারে
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী "ওরে মিন্‌ষে মোর,
বড়ই মধুর অই সঙ্গীত, রে বুড়ো'
কেড়ে লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।"
এতবলি আরম্ভিল নাচিতে রাক্ষসী। ‡

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।
(বি এস্ সি, লণ্ডন)

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ক্রিয়ারির কন্যাগণ মনের কথা বলিবার জন্য যে কিছুমাত্র কপটতা, কিছুমাত্র প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই, ইহা আমরা কি করিয়া জানিব? কিন্তু যদি সেই উচ্চশ্রেণীর খ্যাতনামা পরীক্ষকগণকে বিশ্বাস করিতে হয়, ত এ সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না, তাঁহারা বলিতেছেন যে "ক্রিয়ারি একজন সম্ভ্রান্ত সাধুচেতা ব্যক্তি, কন্যাগুলি অতি শিষ্ট শান্ত সৎস্বভাব, যিনি তাহাদের দেখিয়াছেন তিনিই বলিবেন যে প্রতারণা কপটতা তাহাদের কর্ম্ম নহে।" ইহা সত্বেও তাঁহারা যেরূপ সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রতারণার উপায় পর্য্যন্ত রাখিতে দেন নাই। সন্দেহের পথ একেবারে বন্দ করিবার জন্য পরীক্ষকগণ এত সাবধানে কাজ করিতেন, যে পরীক্ষাধীন বালিকার সাক্ষাতে কেহ কাহারো কাণে কাণে কথা পর্য্যন্ত কহিতে পাইত না, কি জানি ঠোঁট নাড়ার ধরণে যদি বালিকাগণ কিছু বুঝিতে পারে। কেহ যদি বলেন যে বালিকার পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ যাহারা সে গৃহে থাকিতেন তাঁহারা ত আগে হইতে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া সেই সময় ইঙ্গিতে, কথা না কহিয়াও, বালিকাদের কিছু জানাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, পরীক্ষকগণ যে কথা মনে করিতেন, তাহা বালিকাদের আত্মীয়গণকে সব সময় জানিতে

---

† রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে শুইয়াছিল।

‡ অসভ্যের উপরেও সঙ্গীতের ক্ষমতা এখানে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গৌড় কবির এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়।

দিতেন না। তবে যখন বালিকাদের আত্মীয়গণকে তাহা জানাইতেন তখন এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাদের উপর নজর রাখিতেন, যে সেদৃষ্টি এড়ান বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তারপর বালিকাগুলি এত শিষ্ট শান্ত, যে পরীক্ষকগণ পরীক্ষার সুবিধার জন্য যখন যে স্থানে যে অবস্থায় দাঁড়াইতে বলিয়াছেন তাহারা তাহাই করিয়াছে, পরীক্ষকগণও কপটতা অবলম্বন করিবার' যো না থাকে এইরূপ স্থানে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের দাঁড় করাইয়াছেন। ইহা ছাড়া আগেই বলা হইয়াছে যে বালিকাগণ অনেক সময় পরীক্ষা গৃহের কাহারো সহিত কোনরূপ সংশ্রবে না আসিয়া অন্য লাগাও রুদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে ঠিক উত্তর করিয়াছে।*

মনের কথা পাঠের পক্ষ প্রমাণ ইহা হইতে আর কি অধিক হইতে পারে।

---

* এসম্বন্ধে অধ্যাপক বারেট যাহা বলিতেছেন তাহা বরং এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"The exceptional nature of this inquiry goes far to invalidate arguments founded on character and demeanour; and, on this head, we will only state our conviction that any candid critic, present during the whole course of the experiment would have carried away a far more vivid impression of their genuineness than the bare printed record can possibly convey. Of more real importance is the hypothesis of exalted sensibility of the ordinary sense organs. We could discover no indication of this in any of its known forms: but by way of precaution, as has been already stated, we commonly avoided even whispering any word, number, or name that we had selected; and the position of the excluded child, when the door was opened, would in every case have satisfied the most exacting critic. The explanation which might be sought in unconscious indications given by the sitters, and especially in the movement of the lips, has been already adverted to. Coming as we did to this investigation with considerable previous experience of the same kind, we were throughout strictly on our guard against giving such indications ourselves; the possibility of their being given by the family was, of course, excluded where the family were ignorent of the selected word or thing; and on the remaining occasions our perpetual vigilant watch never detected a trace of any thing of the kind. The absolute docility of the children—both the guesser and others—in taking any position in the room that we indicated, was naturally an assistance to our precautions. It may be further mentioned that, on a previous visit made by one of us, the child called the required name through the shut door, or from an adjoining room, having thus been completely isolated from the very begining to the very end of the experiment.

এক কথায়, বালিকাদের এই মনের কথা বলিতে পারার ভিতর যে মিথ্যা জুয়াচুরি কিছুমাত্র ছিল না, সে বিষয়ে পরীক্ষকগণ নিঃসংশয় হইয়াছিলেন।

প্রতারণা ত দূরের কথা, কোন জ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ বিশেষ তীক্ষ্ণ অসাধারণ অনুভব শক্তি দ্বারাও যে বালিকাগণ উক্ত ঘটনা সকল সংধিত করিয়াছিল এমন লক্ষণ পর্য্যন্তও তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

প্রফুল্ল ও উৎসাহ পূর্ণ মনের অবস্থাতেই মনে করা হইয়াছে।

বালিকাগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্য হইত। এমন কি একবার উৎসাহিত হইয়া উপরি উপরি ১৭টি তাস একেবারে ঠিক বলিয়াছিল, একটিও ভুল করে নাই।

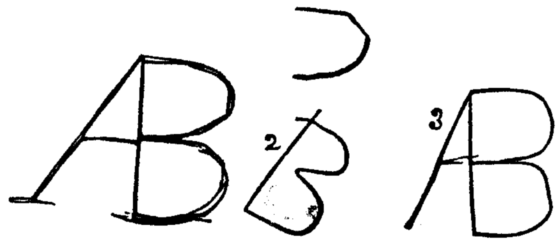
ক্রিয়ারির কন্যাগণই যে একমাত্র মনের কথা বলিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছে এমন নহে, লিবারপুলের দুটি মহিলা উক্ত সভার সভ্যগণের নিকট কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন তাহা নিম্নের তালিকায় প্রকাশ করা যাইতেছে।

	উত্তর।
এক সোনার ব্রোচ,	ইহার রং হলদে, ইহা একটা ব্রোচ।
একটা ডিম,	ঠিক যেন একটা ডিমের মত।
একটা কলম দণ্ড (এই দণ্ডের উপর একটা আঙ্গুল দস্তানা (থিমবল) উলটান ছিল।)	একটা থাম, একটা ঘণ্টার মত গড়নের জিনিস তার উপর উলটান রয়েছে।
একটা ঘোর লাল অ্যাপেল	এটা গোল, খুব ঘোর লাল রংয়ের, একটা দরজার নবেরমত দেখিতে, এটা একটা আপেল।
একটা চাবি,	একটা ছোট জিনিস, তার একশেষে একটা গোলচাকা, আর একশেষে একটা ছোট নিশানের মত, একটা খেলেনার যেন নিশান মত রয়েছে। (তাহার পর ইহার নাম কি বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া,) এটা একটা চাবির মত।

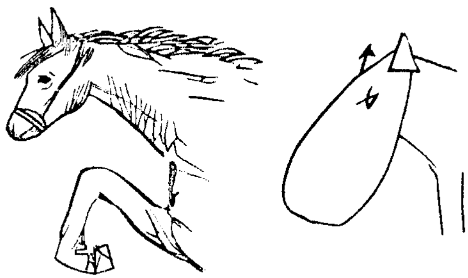
ইত্যাদি।

স্মিথ নামক একজন যুবকের উপর পরীক্ষা করিয়াআরো আশ্চর্য্যরূপ মানসিক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে মিষ্টার ব্ল্যাকবর্ণ স্মিথের পরীক্ষক। ব্ল্যাকবর্ণ অতি সূক্ষ্মদর্শক, অতি কড়া পরীক্ষক, তাঁহার কাছে পান হইতে চুনটি খসিবার যো নাই, সেই জন্য অন্যান্য সভ্যগণ কর্তৃক তিনিই পরীক্ষক রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। স্মিথের চোখ বাঁধা, তিনি একটি টেবিলের কাছে উপবিষ্ট, তাঁহার হাতের কাছে টেবিলে আঁকিবার জিনিসপত্র। একজন সভ্য তাহার কাছে বসিয়া পাহারায় নিযুক্ত আছে, আর একজন সভ্য অন্য স্থানে গিয়া কোনরূপ একটি ছবি আঁকিয়া তাহা ব্ল্যাকবর্ণকে ডাকিয়া দেখাইলেন, ব্ল্যাকবর্ণ সেই ছবি কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দেখিবার পর চোখ বুজিয়া আর

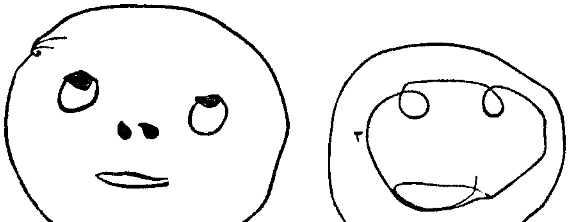
একজনের হাত ধরিয়া পরীক্ষা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া স্মিথের পশ্চাতে কিছু দূরে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিলেন হয়ত বা বসিলেন। কিছুক্ষণ ব্লাকবর্ণ স্থির মনে ঐ ছবি ভাবিবার পর, স্মিথ সেই চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ব্লাকবর্ণের মনের ছবি আঁকিয়া দিলেন।



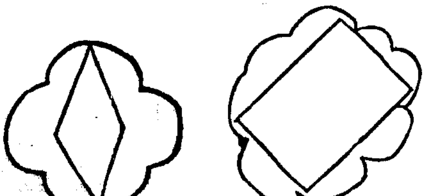
ব্লাকবর্ণ মনে করিলেন, স্মিথ আঁকিলেন, তৃতীয় চেষ্টায়



ব্লাকবর্ণ মনে করিয়াছেন, স্মিথ আঁকিলেন



ব্লাকবর্ণ মনে করিয়াছেন, স্মিথের আঁকা



ব্যাকবর্ণ মনে করিয়াছেন, স্মিথ আঁকিলেন

এখানে যেরূপ নমুনা দেখান হইল এইরূপ ছবি, ৬০ পাতা ধরিয়া উক্ত সভার কার্য্যবিবরণ পুস্তকে দেওয়া আছে। এই রূপ পরীক্ষার সময় একবার স্মিথের চোখ বাঁধিয়াই পরীক্ষকগণ ক্ষান্ত হন নাই। তাহার কানে ছিপি দিয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া, তাহার পর আর এক কাপড়ে মাথা হইতে সমস্ত মুখ ঢাকিয়া তাহার উপর আবার আর একখানি কম্বল দিয়া মাথা হইতে তাহার বুক পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়াছিলেন। কোন প্রকারে যাহাতে তাহার আর বাহিরের কিছু শুনিবার কি বুঝিবার সম্ভাবনা না থাকে। আশ্চর্য্য এই, এই অবস্থায় স্মিথের ছবি আঁকা অন্য সময় হইতে আরো ঠিক হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখিতে পাইতেছি সংযত অবস্থাই চিন্তাপাঠের অনুকূল অবস্থা। ইহাতে আমাদের যোগশাস্ত্রেরি জয় দেখা যাইতেছে. যোগশাস্ত্রমতে বাহির হইতে মনকে যতই সরাইয়া লইবে, ততই মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন হইবে।

ক্রমশঃ

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

এই দেখা যায় যে, প্রথমে ভরদ্বাজ মুনিই ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রচার করেন, তাঁহার এই উদ্যমের ফল, আত্রেয় সংহিতা, অগ্নিবেশ তন্ত্র বা চরক-সংহিতা, হারীত সংহিতা প্রভৃতি অবিনশ্বর কীর্ত্তি সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্যতম প্রচারক ধন্বন্তরির প্রচারের ফল ধন্বন্তরি সংহিতা, সুশ্রুত, ঔরভ্র প্রভৃতি। ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে এত উন্নতি হইয়াছিল ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরিই তাহার আদি কারণ। চ্যবণ কণাদ প্রভৃতি মহর্ষিগণও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ভারতবর্ষে যেরূপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন, চরক সংহিতার প্রারম্ভে তাহা এইরূপে বর্ণিত আছে।

যে সময়ে নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া শরীরীদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, আয়ু প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিঘ্ন জন্মাইতেছিল, তখন প্রাণী সমূহের প্রতি দয়া করাই প্রধান উপলক্ষ করিয়া পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ মঙ্গলময় হিমালয়-পার্শ্বে এক সুমহতী সভা আহ্বান করিলেন। অঙ্গিরা, যমদগ্নি বশিষ্ট, কাশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, "গৌতম, সাংখ্য" পুলস্ত, নারদ, অসিত, অগস্ত্য, বামদেব, মার্কণ্ডেয় অশ্বলায়ণ, পারিক্ষি, "ভিক্ষু আত্রেয়," ভরদ্বাজ, কপিষ্ঠল, বিশ্বামিত্র, আশ্বরথ্য, ভার্গব চ্যবণ, অভিজিৎ, গার্গ্য, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিন্য, বার্ক্ষি, দেবল, গালব, সাঙ্কৃত্য, বৈজবাপি, কুশিক, বাদরায়ণ, বড়িশ, শরলোমা কাপ্য, কাত্যায়ণ, কাঙ্কায়ণ কৈকশেয়, ধৌম্য, মারীচ, কাশ্যপ, শর্করাক্ষ, হিরণ্যাক্ষ, লৌগাক্ষি,

পৈঙ্গি, শৌনক, শাকুনেয়, মৈত্রেয়, (৬) মৈমভায়নি প্রভৃতি ঋষিগণ বৈখানস এবং বালখিল্য মুনিগণ এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া তপোলব্ধতেজঃ প্রভাবে হূয়মান প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞান, দম এবং নিয়মের নিধি স্বরূপ। তাঁহারা তথায় সুখে উপবেশন করিয়া এই পুণ্যজনক কথার প্রস্তাব করিলেন,:—"আরোগ্যই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায়। রোগ সমূহই সেই আরোগ্যের মঙ্গলের এবং জীবনের অপহর্ত্তা। ব্যাধি মনুষ্যগণের পক্ষে মহাবিঘ্ন স্বরূপ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই ব্যাধি সমূহের শান্তির উপায়, কে বলিয়া দিবেন?"

ইহা বলিয়া তাঁহারা ধ্যানস্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধ্যান চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে, এ বিষয়ে ইন্দ্রই একমাত্র শরণ্য। তিনিই যথাযথ রূপে রোগশান্তির উপায় বলিয়া দিবেন। অনন্তর আবার প্রস্তাব করিলেন, ইন্দ্রকে রোগশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কে ইন্দ্রভবনে গমন করিবেন? "এখানে এজন্য আমিই নিযুক্ত হইলাম" সর্ব্ব প্রথমে ভরদ্বাজই এ কথা বলিলেন সুতরাং ঋষিগণ কর্ত্তৃক তিনিই নিয়োজিত হইলেন।

ধীমান ভরদ্বাজ ইন্দ্রভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন দেবর্ষিগণের মধ্যে সর্ব্ব-বলহন্তা ইন্দ্র দীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভগবান ভরদ্বাজ নিকটে যাইয়া, জয় উচ্চারণ এবং আশীর্ব্বচন দ্বারা ইন্দ্রকে অভিনন্দন করিয়া, ঋষিগণের অভিলষিত বাক্য জানাইয়া বলিলেন, ব্যাধিসকল সকলপ্রাণীর আতঙ্ক স্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, হে অমর প্রভো! আমাকে সেই ব্যাধি সকলের শান্তির উপায় আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দিন।

অল্প কথাতেই বিপুল বুদ্ধি দেখিয়া, ভগবান ইন্দ্র, মহর্ষিকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মভাষিত আয়ুর্ব্বেদ, সুপবিত্র, নিত্য; রোগের কারণ, রোগের লক্ষণ, এবং ঔষধ জ্ঞান এই ত্রিবিধ সূত্রে পরিপূর্ণ এবং সুস্থ ও রোগী উভয়েরই সমান আশ্রয়স্থল। মহামতি ভরদ্বাজ মুনি তন্মনা হইয়া সেই অনন্ত পার ত্রিস্কন্দ আয়ুর্ব্বেদ অচিরাৎ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ দীর্ঘ আয়ু কামনা করিয়া প্রজাদিগের হিতকর এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধন আয়ুর্ব্বেদ ভরদ্বাজ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ, আয়ুর্ব্বেদ পাঠে জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া তন্ত্রোক্ত বিধি, সামান্য, বিশেষ গুণ, কর্ম্ম, সমবায় প্রভৃতি অবগত হইয়া পরম শান্তি এবং অনশ্বর জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

---

৬ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র মুনির পুত্রদিগের নামের তালিকায় অশ্বলায়ন, গার্গ্য, গালব, হিরণ্যাক্ষ জাবালি সুশ্রুত এবং নারদের নাম দৃষ্ট হয়। বৈশ্যার গর্ভে এবং বিশ্বামিত্রের ঔরসে সুশ্রুতের জন্ম হয়। যদি উল্লিখিত সভায় অশ্বালয়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিশ্বামিত্রের পুত্র হন তবে তাঁহারা সুশ্রুতের ভ্রাতা।

ভরদ্বাজের শিষ্যদিগের মধ্যে লোক-হিতে রত পুনর্ব্বসু আত্রেয় ঋষি, সকল প্রাণীর হিতের জন্য অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি, এই ছয়টি শিষ্যকে সুপবিত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও মুনির বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যদিচ মুনি, সকল শিষ্যকেই এ সম্বন্ধে সমান উপদেশ দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়, কেন না, সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবেশই তন্ত্র প্রণয়ন করেন। অনন্তর সুমেধা-সম্পন্ন ভেল প্রভৃতি পঞ্চ ঋষিও নিজ নিজ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া ঋষিগণের সহিত আত্রেয় মুনিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণ সূত্রার্থ শ্রবণ করিয়া "সুন্দর রূপে রচিত হইয়াছে" এই বলিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে অনুমোদন করিলেন। সেই সময়ে দেবতাগণও মহা আনন্দ করিয়াছিলেন। * * *। ঋষিগণ কর্তৃক সেই তন্ত্রগুলি অনুমোদিত হইয়া প্রাণীগণের হিতার্থে পৃথিবীতে পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। (৭)

বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর মূল উদ্ধৃত করিলাম না। কেবল মূলের অনুবাদ করিয়া দিলাম। চরক সংহিতা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের এরূপ বিস্তৃত প্রাচীন ইতিহাস আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত সভাতে যে যে ঋষি উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই যে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে যত্ন করিয়াছিলেন এখনও তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ঔষধ, তৈল, ঘৃত প্রভৃতিতে কাশ্যপ, চ্যবণ, গার্গ্য, অগস্ত্য প্রভৃতির নাম দেখা যায়। যথাস্থলে এই সকল আলোচনা করিব।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতাদিগের এবং তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির বিবরণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরূপে লিখিত আছে;—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বাতু পঞ্চমংবেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতা স্ততঃ॥
তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানিচ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বি! মত্তোনিশাময়॥
ধন্বন্তরি র্দিবোদাসঃ কাশীরাজোঽশ্বিনী সুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবণো জনকো বুধঃ॥
জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এবচ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ॥
চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোরমং।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান চকার প্রথমে সতি।
চিকিৎসাদর্পণং নাম দিবোদাস শ্চকার সঃ।
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশীরাজ শ্চকার সঃ॥
চিকিৎসা সারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নং চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ॥

৭ চরকসংহিতা ১ম অধ্যায় (সূত্রস্থান)।

চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনং।
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজ শ্চকার সঃ॥
চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনং॥
সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালস্তন্ত্রসারকং।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলি মুর্নিঃ॥
পৈলো নিদানং করথ স্তন্ত্রং সর্ব্বধরংপরং।
দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ॥
চিকিৎসা শাস্ত্রবীজাণি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শঃ॥ (৮)

ইহার মর্ম্ম এই, ব্রহ্মা ঋগযজুঃ সাম এবং অথর্ব্ব এই চারিবেদ, অবলম্বন করিয়া পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করত উহা সূর্য্যকে প্রদান করেন। সূর্য্য আবার নিজ নামে ভাস্করসংহিতা প্রণয়ন করিয়া ধন্বন্তরি প্রভৃতি ষোড়শ জন শিষ্যকে উহার শিক্ষা দান করেন। এই ভাস্করসংহিতা অবলম্বন করিয়া ষোলজন শিষ্যের মধ্যে (১) ধন্বন্তরি চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান (২) দিবোদাস চিকিৎসাদর্পণ (৩) কাশীরাজ চিকিৎসাকৌমুদী (৪। ৫) অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসাসারতন্ত্র (৬)নকুল বৈদ্যক সর্ব্বস্ব (৭) সহদেব ব্যাধিসিন্ধু-বিমর্দ্দন (৮) যমরাজ জ্ঞানার্ণব (৯) চ্যবন জীবদান (১০) রাজর্ষি জনক বৈদ্যসন্দেহভঞ্জন (১১) বুধ সর্ব্বসার (১২) জাবাল মুনি তন্ত্রসার (১৩) জাজলি মুনি বেদাঙ্গসার (১৪) পৈলমুনি নিদান (১৫) করথ মুনি সর্ব্বধরতন্ত্র এবং (১৬) অগস্ত্যমুনি দ্বৈধ-নির্ণয় তন্ত্র প্রণয়ন করেন; এই ষোল খান তন্ত্রই চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজ স্বরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই সকল কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? ইহাতে যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহাতে প্রকৃততত্ত্ব অপেক্ষা অমূলক বিবরণের ভাগই অধিক। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই এখন লোপ পাইয়াছে; সুতরাং সত্যাসত্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা সহজ নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় টীকাকারগণ অনেক প্রাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলির কোনখানির নামই প্রায় টীকা প্রভৃতিতে দেখা যায় না।

অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, সুশ্রুত, কাশীরাজ ধন্বন্তরি বাগ্‌ভট প্রভৃতি ভিন্ন, অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা প্রণেতৃগণই ব্রাহ্মণ ছিলেন। অতি পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণগণই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ছিলেন। যাঁহারা এই শাস্ত্রের প্রাণদাতা যাঁহারা এই শাস্ত্র প্রভাবে মানুষের জীবনত্রাণ করিতেন সেই ব্রাহ্মণ গণ এই চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করিলে এক্ষণে লোকসমাজে এত ঘৃণাস্পদ হয়েন কেন? আমরা এই সূত্রে পূজ্যতম ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক উদারতা এবং অপার্থিব নিঃস্বার্থতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরাকালের ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের অনেক বিষয়ে স্বার্থপরতার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা আবার অনেক স্থলে এরূপ উদারতা মহত্ব ও নিঃস্বার্থতার পরিচয় দিয়াছেন যে

---

৮ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১৬শ অধ্যায়।

তাহা তুলনা পৃথিবীতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণগণের এরূপ অসীম ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। তাঁহারা রাজেশ্বর সম্রাটেরও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবাধে নিজেরাই রাজদণ্ড ধারণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা কদাচ করিতেন না বরং যিনি এজন্য লালায়িত হইতেন তাঁহাকে পতিত হইতে হইত। অতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট উপার্জ্জনও ছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির সময় হইতে বৈদ্যদিগকে এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলেন তখন তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যদি ব্রাহ্মণগণ এ ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ না করিতে পারেন তবে আর বৈদ্যজাতির উপায়ান্তর নাই, তবে তাহারা কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে? সুতরাং নিয়ম করা হইল, চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পাওয়া যাইবে না ৯। যখন এ সামান্য ক্ষতিতে তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না তখন নিয়ম করা হইল "চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্য; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তাহাদের অন্নভোজন করিলে পতিত হইবেন এবং কুকুরযোনি লাভ করিবেন। ১০ কিন্তু ইহাতেও ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসায়ের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। *যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে* তক্ষক দংশন করিতে যায় তখন কাশ্যপের ন্যায় মহর্ষিও অর্থলোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, পরীক্ষিতের চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তক্ষক বহু অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পথেই বিদায় করিয়া দিল। মহর্ষিগণ দেখিলেন, এরূপ চক্রান্ত করিয়াও অর্থলুব্ধ ব্রাহ্মণদিগকে এ ব্যবসায় হইতে বিরত রাখা যাইবে না। অর্থের কাছে এই আত্মমর্য্যাদা টুকুর জন্য অনেকেই এ ব্যবসা ছাড়িবেন না। সুতরাং এ নিয়ম ও বৈদ্যদিগের উপার্জ্জনের পক্ষে অনুকূল হইল না। সুতরাং আবার নিয়ম করিলেন—"ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্টা সচেলং স্নানমাদিশেৎ" এবং "পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং * * * (ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে দেখিলে বস্ত্রসহ স্নান করিবে, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের অন্ন পূয়তুল্য, ইত্যাদি। ধন্য ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যথার্থ ভূদেব। দেবতা ভিন্ন সামান্য মনুষ্য কি অন্যের জন্য নিজ স্বার্থ এইরূপ বলিদান করিতে পারে! শুধু বৈদ্যদিগের জন্য নহে, রাজা যুদ্ধব্যবসায়ী রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের জন্য ব্রাহ্মণগণ এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কাছে অর্থলোভ, রাজ-পদ প্রভৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। অন্য ব্যবসায় অবলম্বন

৯ মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য।

১০ মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৮৫ অধ্যায়।

করিলে তপোযপ ধর্ম্মকর্ম্ম শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির দিকে মনোনিবেশ হয় না সুতরাং এই সমুদায়ের উপর ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন, এবং স্বজাতিদিগকেও ঐ সমুদয় ব্যবসায়ের উপর বিতৃষ্ণ করিবার নিমিত্ত অনেক সময়ে এই সকল নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিতেন। তাহা হউক; তথাপি দেবতুল্য লোক ব্যতীত কি সামান্য মনের লোকে এই সকল লোভ সংবরণ করিতে পারে? যাহা হউক, এই সকল নিয়ম করিয়া ঋষিগণ বেশ কৃতকার্য্য হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসায় একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। প্রায় বাগ্‌ভট গুপ্তের সময় হইতে চিকিৎসা, বৈদ্যদিগের একচেটিয়া ব্যবসা হইয়া গেল। সেই সময় হইতে কত শত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকার, টীকাকার প্রভৃতির নাম শুনিতে পাই, তাহারা সকলেই প্রায় বৈদ্যবংশীয়।

কিন্তু আত্রেয় প্রভৃতি মুনিদিগের সময় হইতে ব্যবস্থা আছে যে ব্রাহ্মণগণ কেবল প্রাণীদিগের উপকারার্থ, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার্থ এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির নিমিত্ত কিম্বা সামান্যতঃ ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রতিগ্রহের নিমিত্ত, সকলেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে। তথাহিঃ—

স (আয়ুর্ব্বেদঃ) চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণ রাজন্য বৈশ্যৈঃ; তত্রানুগ্রহার্থং প্রজানাং ব্রাহ্মণৈ রাত্মরক্ষার্থং রাজন্যৈ, বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ, সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ। ইত্যাদি। (চরক, সূত্রস্থান, ৩০শ অধ্যায়)

এই নিয়মানুসারে চলিয়া চিকিৎসা করিলে ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃক চিকিৎসোপজীবীদিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইত না। কিন্তু পরোপকারী ঋষিগণ দেখিলেন এ নিয়মানুসারে চলিলেও কোন কোন অর্থলুব্ধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র না মানিয়া চিকিৎসা দ্বারা অর্থাদি গ্রহণ করিতে পারে; সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে একেবারে উঠাইয়া দিয়া "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা * * এই বিশেষ বিধিই বজায় রাখিলেন।

যেমন বৈদিক কালে সেইরূপ পৌরাণিক ও আচার্য্য সময়েও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ আন্তরিক যত্ন করিতেন। বিক্রমাদিত্য, ভোজ মদনপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ স্বয়ং প্রজাদিগের চিকিৎসা করিতেন এবং তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত শাসনের প্রয়োজন। সমাজের অন্তর্গত সমুদায় ব্যক্তিগণ যাহাতে সুখে থাকিতে পারে এই উদ্দেশে দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার নিয়মাবলী ও কার্য্য পদ্ধতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সকল কার্য্যপদ্ধতি ও নিয়মাবলীর মধ্যে এক প্রধান সাদৃশ্য এই যে তাহাদের সকলেরই এক মুখ্য উদ্দেশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে ঘৃণা করে ও শাসন করিতে চেষ্টা করে। আর যে ব্যক্তি যৎ-সামান্য আহার্য্য ও পরিধেয় পাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সমাজের উন্নতি সাধনে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে তাহাকে সকল সমাজেরই লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে। দুষ্টের দমন দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথম, সমাজের কতকগুলি কর্ম্মচারী দ্বারা। দ্বিতীয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা।

যেরূপ কার্য্যে সমাজের আত্যন্তিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা সেরূপ কার্য্যের যথোপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব না হইলে তাহার দণ্ড কতকগুলি কর্ম্মচারী দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। নর হত্যা, চৌর্য্য-বৃত্তি, জ্ঞাতসারে প্রকাশ্য ভাবে অন্যের সম্পত্তিনাশ, ইত্যাদি কার্য্য এই শ্রেণীর দুষ্কর্ম্ম। আর যেরূপ কার্য্যে সমাজের অত্যল্প ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কিম্বা আত্যন্তিক ক্ষতি হইলেও প্রমাণ দেওয়া কঠিন সেরূপ কার্য্যের দণ্ড সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রদত্ত হয়। যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি কর্কশাচরণ করে, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করে, আইন দ্বারা সে ব্যক্তির দণ্ড হয় না, কিন্তু তাহার প্রতিবাসী-গণ তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে ও তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ শাসনকে আমরা সামাজিক শাসন বলি; সামাজিক শাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের দ্বিমত নাই। যেরূপ কার্য্যে সমা-জের অমঙ্গল হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভাবনা অথচ আইন দ্বারা যাহার দণ্ড বিধান করা বিবেচনা সঙ্গত নহে, সামাজিক শাসন দ্বারা সেরূপ কার্য্যের নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক, আবার সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকাও আবশ্যক। যে প্রথা অধিককাল ধরিয়া কোন সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া আইসে, আর কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিলে সে ব্যক্তির প্রতি লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িতে পারে—সে ব্যক্তি তা-হার প্রতিবাসীদিগের, এমন কি সমুদায় সমাজের বিরাগভাজন হইতে পারে। এ-রূপ হওয়ার কারণ কি? আমরা যাহা কিছুতে অধিক কাল ধরিয়া অভ্যস্ত হই তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদিগের নিকট সহজ হইয়া আইসে, তাহা যদি আমাদিগের শুভ-কর হয়, উত্তম,—যদি অশুভকর হয় তাহা হইলে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিতে শিখি, যদিই পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় না দেখি তথাপি তাহা হইতে আমরা যে কষ্ট পাই কালক্রমে তাহা আ-মাদিগের পক্ষে সহ্য হইয়া আসিতে পারে। আর যাহা কিছু আমাদিগের পক্ষে নূতন, তাহা আমাদিগের শুভকর কি অশুভকর হইবে তাহা আমরা প্রথমতঃ জানি না সুতরাং তাহার প্রতি আমরা আদর না

দেখাইতে পারি; যদি কোনরূপে তাহা হইতে আমরা বিপদ আশঙ্কা করি তবে তাহার প্রতি আমাদিগের বিরাগ জন্মিতে পারে। সমাজে যে সকল প্রথা অধিক কাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে লোকে সে সকল প্রথায় অভ্যস্ত; প্রথমতঃ যখন সে সকল প্রথার বিপরীতাচরণ দেখা যায়, তখন তাহাতে লোকে বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে। সমাজ যতই পুরাতন হইতে থাকে তাহার মধ্যে প্রচলিত প্রথা গুলির সংখ্যাও অধিক হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই সকল প্রথা লোকে মান্য করিয়া চলে, অনেকের তাহার অন্যথা করিতে ইচ্ছা হয় না; কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইলেও সেরূপ করিতে সাহস হয় না। এই রূপে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস হইয়া আইসে, সমাজের প্রারম্ভে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য দেখা যায়, সমাজের বর্দ্ধিতাবস্থায় সামাজিক শাসনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য হ্রাসায়তন দেখা যায়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োজন। মনুষ্যের জীবন কি? চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যীকরণ মাত্র। তাহার চতুষ্পার্শে যে সকল ঘটনা দেখা দিতেছে সেই সকল ঘটনার সহিত স্বীয় শরীর ও মন এই দুয়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশে মনুষ্য যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছে সেই শক্তির প্রকাশকে কার্য্য বলে, মনুষ্যের কার্য্য সমূহই তাহার জীবন। যখন আমরা দেখিতে পাই যে মনুষ্যের চতুষ্পার্শস্থ ঘটনাবলী ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ক্রমাগত অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, আলোক, উত্তাপ, তাড়িৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বল সমূহ ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে, ভৌতিক বস্তুগুলি পরস্পরের সহিত এক্ষণে এক প্রকারে সম্বন্ধ, আবার পরক্ষণে আর এক প্রকারে সম্বন্ধ, হইতেছে; যখন আমরা দেখিতেছি প্রকাণ্ড নাট্যশালার মধ্যে দৃশ্য ও অভিনয়ের পরিবর্ত্তনের ন্যায় এই বিশাল সংসার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তু ও প্রাকৃতিক বল সমূহের লীলাখেলা ক্রমাগত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতি ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, তখন মনুষ্যদিগের মধ্যে কে সাহস করিয়া বলিবে যে জীবনে কার্য্য-প্রথার পরিবর্ত্তনে প্রয়োজন নাই? প্রকৃতি যেমন চলিতেছে, মনুষ্যেরও তেমনি চলিতে হইবে। প্রকৃতির আজ্ঞা "গতি ও পরিবর্ত্তন"—এ আজ্ঞা বড় কঠোর আজ্ঞা, যে ব্যক্তি ও যে জাতি বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই আজ্ঞা পালন করিতে পারে সে ব্যক্তি ও সে জাতি উন্নতির উচ্চ শৃঙ্গ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে থাকে। আর যে ব্যক্তি ও যে জাতি তাহা না করিতে পারে—তাহার? তাহার সর্ব্বনাশ, অধোগতি ও বিলয় তাহার পরিণাম। দূরতীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, অন্যান্য যাত্রীদিগের সহিত সমবলে চল, যদি তাহা না পার তুমি পশ্চাতে পড়িয়া থা-

কিবে, অন্ধকার আসিবে অরণ্যের মধ্যে পথ হারাইয়া কষ্ট পাইবে। তাই বলিতেছি সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত এক পক্ষে যেমন সামাজিক শাসনের প্রয়োজন, অপর পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। স্বেচ্ছাচার জাত অমঙ্গল সমূহ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সামাজিক শাসনের যেমন প্রয়োজন, চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর পরিবর্ত্তনের সহিত মনুষ্য জীবনের কার্য্য-পদ্ধতিগুলির পরিবর্ত্তনের উদ্দেশে ব্যক্তি-গত স্বাধীনতারও সেইরূপ প্রয়োজন। সকলেই যদি পুরাতন প্রথানুসারে কার্য্য করে তবে প্রকৃতির নূতন মূর্ত্তি দেখা দিলে নূতন প্রথা প্রচলিত করিবে কে? সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত, সমাজের উন্নতির নিমিত্ত, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এতদুভয়েরই প্রয়োজন ইহা আমরা বু-ঝিতে পারিয়াছি। এক রাজ্যে দুই রাজা হইলে তাহাদিগের মধ্যে দেশ বিভাগের প্রয়োজন হয়। দেশ বিভাগ না হইলে রাজায় রাজায় সংঘর্ষণ হইয়া প্রজাগণের সম্পত্তিনাশ ও জীবননাশ হয়। সমাজ-রাজ্যে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য করা উচিত আর ব্যক্তি-গত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য থাকা উচিত আমাদিগের এ-ক্ষণে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইতেছে। কিন্তু এ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে স-মাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিলে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা অপেক্ষা-কৃত সহজ হইয়া আসিবে। আমরা সদা সর্ব্বদা "আমি" "তুমি" "সে" এই কথা-গুলির ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং আমরা মনে করি যে এই কথাগুলির অর্থ আমরা সম্পূর্ণ রূপে বুঝি। কিন্তু আমিই বা কি 'সেই বা কি 'তুমি'ই বা কি এই প্রশ্ন গুলির অর্থ কে সহজ করিয়া বলিয়া দিতে পারে? আমি, তুমি ও সে ইত্যাদির সমষ্টিই সমাজ, এক্ষণে প্রশ্ন এই যে আমি তুমি ও সে লইয়াই সমাজ—না সমাজ হই-তেই আমি, তুমি, সে। আমি, তুমি, সে ইত্যাদি ব্যক্তি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টির নামই সমাজ না সমাজের বিশেষ বিশেষ অবতারই আমি, তুমি ও সে? এক কথায় ব্যক্তিত্ব সমূহই সমাজ না সমাজের বিশেষ আকারের অস্তিত্বই ব্যক্তিত্ব। প্রশ্ন বড় জটিল, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছি, বাহিরে, অন্ধ-কার দেখিয়া আমরা ভীত হইব না, সাব-ধানে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পদবিক্ষেপ করিতে করিতে আমরা অবশেষে একটী পথ দেখিতে পাইব এরূপ আশা করা যাইতে পারে। আমি প্রথমতঃ আমার আমিত্ব সম্বন্ধে কি জানি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক পরে 'তুমি' কি 'সে' কি 'সমাজ' কি তাহা বিবেচনা করা হইবে। আমি দেখিতেছি যে আমি কখনও বা সুখ অনুভব করিতেছি কখনও বা দুঃখ অনুভব করিতেছি ক-খনও বা আহ্লাদ পাইবার আশায় আর কখনও বা কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবার আশায় আমি শক্তি প্রয়োগ করিতেছি,

আর কখনও বা ইন্দ্রিয়জাত বোধসমূহ ও তাহাদিগের কাল্পনিক প্রতিবিম্বসমূহ হইতে জ্ঞানলাভ করিতেছি। আমার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা কেবল এই সকল অনুভূতি, এই সকল উদযমন, আর এই সকল জ্ঞান; আমি এইরূপ অনুমান করি যে এই সকল ঘটনার মূলে একটী অস্তিত্ব আছে, এই অস্তিত্বকে আমি "আমি" এই নাম দিই। আমি দেখি যে আমার মানসিক ঘটনা হইতে আমার কার্য্যের উৎপত্তি," আমি জ্ঞাতসারে যে সকল কার্য্য করি তাহা আমার মানসিক ঘটনার ফল মাত্র; আমি কষ্ট পাইতেছি এই কষ্টরূপ মানসিক ঘটনা হইতে উহার নিরাকরণোপযোগী কার্য্য সংসারে আবির্ভূত হইল।' আমার কার্য্য সমূহ আমার মানসিক ঘটনা সমূহের চিহ্ন, আর এই সকল মানসিক ঘটনা হইতেই আমি আমার অস্তিত্ব প্রস্তাব করি। আমি যখন অন্য কোন পাত্রে আমার ন্যায় কার্য্য দেখি আর যখন দেখি যে সে কার্য্য আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না তখন আমি এই মনে করি যে তাহার অপর পার্শ্বে মানসিক ঘটনা আছে আর ঐ মানসিক ঘটনার মূলে অস্তিত্ব আছে। এই অস্তিত্বকে আমি অবস্থাভেদে কখন বা "তুমি" কখনও বা "সে" বলি। এইরূপে আমি আমার ন্যায় কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব প্রস্তাব করি, এই সকল অস্তিত্বকে আমি আমার চতুপার্শ্বস্থ ব্যক্তি সমূহ বলি; আমি ও আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগুলিকে লইয়া আমার সমাজ গঠিত। অতএব এই পক্ষে দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিত্বসমূহই সমাজ, সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্তি প্রধান বিষয়, কারণ ব্যক্তি হইতেই সমাজ গঠিত। আবার অপর পক্ষে দেখা যাউক ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সামাজিক অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করে কি না। সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারিবিন্দু লইয়াই সমুদ্র; আবার সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বারিবিন্দুসমূহ সমুদ্রের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ; সমুদ্রের প্রত্যেক বারিবিন্দু হইতে সমুদয় সমুদ্রের গুণাগুণ অবগত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমুদ্র ও সমুদ্রস্থ প্রত্যেক বারিবিন্দুর মধ্যে যে রূপ সম্বন্ধ, সমাজ ও সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেও সেই রূপ সম্বন্ধ। সত্য বটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইয়াই সমাজ—আবার ইহাও সত্য যে সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সমুদয় সমাজের প্রতিকায়া মাত্র। সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি 'আমি' 'সে' ইহারা ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবতার, এক শাখারই ভিন্ন ভিন্ন কুসুম, এক বৃক্ষেরই ভিন্ন ভিন্ন ফল।

আমাদিগের সমাজ যে সকল বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত, আমাদিগের সমাজ যেদেশ যে জলবায়ু ও ঋতুসমূহের মধ্যে অবস্থিত, যেরূপ আচার ব্যবহার, ও যেরূপ নীতি দ্বারা পরিচালিত, 'তুমি' 'আমি' 'সে' আমরা সকলেই সেই সমুদয় বিষয় হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে

অতি গূঢ় নৈকট্য সম্বন্ধ; ব্যক্তি সমূহ লইয়াই সমাজ, সমাজের অবতারই ব্যক্তি। এই দুয়ের মধ্যে একের মঙ্গল হইলে অপরের মঙ্গল হয়, একের অমঙ্গল হইলে অপরেরও অমঙ্গল হয়; একটি সুরে যেন দুইটি তার বাঁধা, একটি বেসুরো হইলে আর একটিকেও যেন বেসুরো হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

হুগলীর ইমাম বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।*

সন্ন্যাসী।

দেড়শত বৎসরেরও আগেকার কথা হইতেছে, এই সময় কোথা হইতে কেজানে এক সন্ন্যাসী আসিয়া হুগলী সহরে আবির্ভাব হইয়াছেন, ইঁহার নাকি অলৌকিক ক্ষমতা, ইঁহার কৃপায় নাকি অন্ধে আঁখি পায়, খঞ্জ আরোগ্য হয়, ইঁহার আশীর্ব্বাদে নাকি দুঃখ ক্লেশ দূরে চলিয়া যায়। লোকেরা ইহা কেমন করিয়া জানিল তাহা বলিতে পারি না, সত্য সত্য কোন কানা খোড়াকে তাহারা আরোগ্য হইতে দেখিয়াছে কিনা কেজানে, কিন্তু চারিদিকে এইরূপ ত এক মহা গুজব উঠিয়াছে; হিন্দুরা তাহাকে মহাপ্রভু বলিয়া প্রণাম করিতেছে, মুসলমানেরা পীর বলিয়া পূজা দিতে যাইতেছে, ইহাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান এক হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী সবে দুই চারি দিন আসিয়াছেন, দুই চারি দিন হইতে গঙ্গার ঘাটে, লোকে লোকারণ্য, কানা খোড়া, দীন দুঃখীর ত কথাই নাই, কত ধনী, ক্ষমতাশালী, ভাগ্যবান তাঁহার দর্শন জন্য লালায়িত। তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া থাকে, রাজ দর্শনেও বুঝি এত লোকের সমাগম হয় না। আজও প্রত্যুষে নদীতীরের রাস্তায় লোক ধরিতেছে না, পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে লোক জমিয়া সন্ন্যাসী দর্শনে চলিয়াছে। সেই সময় সেই জনতাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া একখানি বস্ত্রাবরিত শিবিকা স্কন্ধে করিয়া সুসজ্জিত

---

* গত পৌষ মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হুগলির ইমাম বাড়ীর প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদে, একটি বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। যাঁহার নাম মহম্মদ মসীন হওয়া উচিত—তাঁহার অন্য নাম হইয়া, আর এক জন উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইহাতে পাঠকদিগের নিকট সাতিশয় লজ্জিত ও অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। এই ভুল শোধরাইবার জন্য ভারতীতে সেই দুইটি পরিচ্ছেদ পুনঃপ্রকাশ করা যাইতেছে।

এই সুযোগে একটি পরিচ্ছেদ নূতন বাড়াইয়া দিলাম।

বেশভূষাধারী বাহকগণ মহা প্রতাপভরে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে আট জন প্রহরী, তাহারাও মহাদম্ভে হুঙ্কার ছাড়িয়া নিরপেক্ষ ভাবে আশে পাশের ভীরু লোকদিগের উপর আপনাদিগের উদার যষ্টির করুণা বিতরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এতখানি করিবার যে বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছিল তাহা নহে, পাল্‌কিখানি কাছে আসিতে না আসিতে পথের লোকেরা আপনা হইতেই মহা ত্রস্তে ভয়ে ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছিল। তবু সকলের অদৃষ্টে রেহাই ঘটিতে ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবার এই সময় এক জন বৃদ্ধা আসিয়া পালকীর সমুখ দিয়া রাস্তা পার হইতে চেষ্টা করিল, সে সন্ন্যাসী দর্শনে যাইবে, ঘুরিয়া গেলে বিলম্ব হইয়া যায়—পালকীর কাছ দিয়াই সে ছুটিয়া যাইতে চাহে। ক্রুদ্ধ প্রহরী ভীমবলে বৃদ্ধার হস্তধারণ করিয়া সেখান হইতে সরাইয়া দিল। বৃদ্ধা আবার সরিয়া আসিয়া অতি কাতরে কাঁদিয়া "বলিল বাবা গো তোরা ছেড়ে দে, আমার ছেলে বাঁচে না, সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা আনতে যাচ্ছি, বাবা ছেড়ে দে" দুর্ব্বলা বৃদ্ধা প্রাণের দায়ে সেই ভীমবল প্রহরীর হস্তকে তাচ্ছিল্য করিয়া যাইবার জন্য যুঝাযুঝি করিতে লাগিল। বৃদ্ধার সেই অসীম সাহস দেখিয়া অন্য লোকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে সেই একজন অবলা রমণীকে পরাজয় করিতে আট জন প্রহরী তাহার উপর আসিয়া পড়িল

একজন তরুণ যুবক আসিয়া বুড়িকে আশ্রয় দিয়া সমুখের প্রহরীকে পদাঘাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন!" অরে কাপুরুষ, একজন বৃদ্ধা নারীকে মারিয়া তোমাদের বীরত্ব,—এস বাছা এস আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে পঁহুছিয়া দিয়া আসি।"

যুবকের সেই তেজস্বী বীর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রহরীগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাঁহার সেই দৃষ্টিতে যেন তাহাদের মত সহস্র প্রহরী ভস্ম হইয়া যাইবে, তাঁহার বাহুর স্পর্শে যেন সহস্র তরবারী বিফল হইয়া পড়িবে। প্রহরীদের তর্জ্জন গর্জ্জন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, সিংহের নিকট মেষের ন্যায় তাহারা বলহীন হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক বুড়ির হাত ধরিয়া অনায়াসে সেইখান দিয়া চলিয়া গেলেন, দর্শকেরা অবাক হইয়া রহিল, দু এক জন বলাবলি করিল "ধন্যি সাহস বলতে হবে—নবাব খাঁ জাহাঁর লোককে হারালে গো"। যুবক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এক জন খোঁড়া বলিল "বাবা গো আমার লাঠি গাছটি এক দুষ্ট ছেলে কাড়িয়া লইয়া গেল—আমার হাতটি ধর বাবা, একবার প্রভু দর্শনে যাই।" একজন অন্ধ সে কথা শুনিয়া বলিল "কে তুমি গো জয় হোক, অন্ধ ব্রাহ্মণকে ধর, কত কষ্টে আসিয়াছি বাবা, আর বুঝি পৌঁছান হয় না।" একটি ছোট ছেলে যে অন্ধের হাত ধরিয়া আনিতেছিল বৃদ্ধার সহিত প্রহরীর গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই সে অন্ধের হাত ছাড়িয়া সেখানে দেখিতে ছুটিয়াছে, এখনো ফিরিয়া আসে নাই, হয়ত

ভিড়ে লুকাইয়া পড়িয়াছে। যুবক তাহাদের নিকটে আসিয়া খোঁড়াকে কাঁধ ধরিতে বলিলেন। খোঁড়া পশ্চাৎ হইতে তাঁহার স্কন্ধ ধরিল, তিনি এক পাশে বুড়িকে লইয়া আর এক হাতে অন্ধের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন, এক স্থির নিশ্চল, দেবোপম কান্তিসম্পন্ন পুরুষ রত্নকে গঙ্গার ঘাটে একটি গাছের তলায় পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। ইহাঁর বেশভূষা সাধারণ সন্ন্যাসীর মত নহে, এবং বেশ দেখিয়া হিন্দু কি মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যুবক তাহাকে স্বজাতি বলিয়াই স্থির করিলেন। সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় ইহাঁর দেহ অনাবরিত নহে, এক ঢিলা অঙ্গাবরণে গলদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত ইহাঁর আচ্ছাদিত। কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা কিম্বা স্ফটীক মালা কিছুই নাই, মুখমণ্ডল ভষ্ম কিম্বা চন্দন চর্চ্চিত নহে, পৃষ্ঠ-লম্বিত কেশ জটা, ও আবক্ষ বিস্তৃত শ্মশ্রু রাশি মাত্র তাঁহার শুভ্রশ্বেত অসামান্য জ্যোতি সম্পন্ন প্রশান্ত-গম্ভীর সহাসমুখের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত শত সহস্র অনাথা, দীন দুঃখী, রোগ শোক, পাপ তাপ, দুঃখ জ্বালা হইতে মুক্ত হইবার কামনায় তাঁহার চরণ তলে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাহাকেও ঔষধ দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার পবিত্র হস্তস্পর্শে মাত্র শান্তিলাভ করিতেছে। যাহার রোগ শোক প্রতিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত তাহাকেও এমন স্নেহের বাক্যে ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখাইতেছেন যে সেও শান্তি সুখ অনুভব করিতেছে। এইরূপে কত নিরাশ হৃদয় আশা পূর্ণ হইতেছে—কত রোগী পাপী, তাপী, দীন, দুঃখীর বিষণ্নমুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। যুবক এমন দৃশ্য কখনও দেখেন নাই, শত শত লোকের সুখে তাহার হৃদয় পুরিয়া গেল, তিনি পূর্ণ হৃদয়ে অভিভূত চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভক্তি উথলিত হৃদয়ে সন্ন্যাসীর শান্ত গম্ভীর দেবশ্রীপূর্ণ মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

ক্রমে বেলা অধিক হইল, দ্বিপ্রহরের বড় বিলম্ব নাই সন্ন্যাসীর ধ্যানের সময় আসিয়া পড়িয়াছে, তিনি গৃহে গমন করিবেন। ভিড়ও কিছু কমিতে লাগিল, যাহারা অনেকক্ষণ আসিয়াছে তাহারা চলিয়া গেল, নবাগতেরা কেবল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব জ্যোতিশালী নয়নের দৃষ্টি তখন যুবকের উপর পতিত হইল—যুবক বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"বৎস আমার সঙ্গে আইস" সে স্বর যতদূর গেল যেন শান্তি ঢালিয়া দিল। সন্ন্যাসী অগ্রগামী হইলে যুবক তাহার অনুসরণ করিয়া দুই জনে গঙ্গা তীরে একটি ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন যুবকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, নীহারমণ্ডিত মহান পর্ব্বত শিখরে চন্দ্র কিরণের ন্যায়, ঈষৎ মৃদু হাস্যে আপনার বিমলপ্রশান্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ক[illegible] [illegible] "কেই বীর [illegible]

দুর্ব্বলের রক্ষক, সেই পুরুষ, যে অসহায়ের সহায়, সেই মহাত্মা যে অত্যাচারের নিবারক, আইস আমরা আলিঙ্গন করি, আজ হইতে তুমি আমার শিষ্য হইলে।" সন্ন্যাসী যুবককে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্শ কি পবিত্র, কি সুখজনক, তাহাতে যেন যুবকের মোহ হঠাৎ দূরে গেল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া দিল—কি এক দিব্য স্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল, যেন এই মহাপুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন, কত নিস্তব্ধ গম্ভীর রজনীতে, দুঃখতাপে জরজর হইয়া যখন চারিদিক শূন্য দেখিয়াছেন, ঐ মহাপুরুষ অমৃতময় বাক্যে যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, কতবার যখন মোহের ছলনে অশান্তির তরঙ্গময় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যেন ঐ দিব্য মূর্ত্তি দেখা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। জাগন্তে, স্বপ্নে, সুখে দুঃখে, ঐ এক মূর্ত্তি—ঐ এক দিব্য ছবি কতবার কতবার যেন—তাহার চোখের সমুখে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে। যুবক পুলকে, বিস্ময়ে নিস্তব্ধে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাহাকে নিকটে বসিতে অনুমতি দিয়া আপনি একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে তেমনি সহাস আননে বলিলেন—"বৎস, আমরা আপনারা শিষ্য বাছিয়া লইয়া থাকি, উপযুক্ত হইলে গুরুর জন্য লালায়িত হইতে হয় না, শিষ্য গৃহীত হইলে গুরুর কার্য্য তাঁহাকে শিক্ষা দান করা, শিষ্যের কার্য্য শিক্ষার বিষয় মনোনীত করা। কোন শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিতে তোমার অভিলাষ, কোন বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে তোমার আকাঙ্ক্ষা বৎস?

যুবক অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন—দেব, যখন অনুমতি পাইয়াছি—তখন আমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিব—শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিতে আমি দারুণ পিপাসিত, কিন্তু আজ আপনার যে বিদ্যা দেখিয়াছি—তাহার নিকট শাস্ত্র জ্ঞান অতি তুচ্ছ, প্রভু সর্ব্ব প্রথমে তাহা শিক্ষা করাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন—"বৎস—ঠিক বলিয়াছ, শিক্ষা দ্বারা শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ করায় তোমার আবশ্যক কি? সে জ্ঞান তোমাতে স্বতঃই বর্ত্তমান। যাহার হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই, যাহার ধর্ম্মে বিধর্ম্মে দ্বেষ নাই, যাহার প্রাণ আত্মপর সমান করিতে চায়, সে, সকল শাস্ত্রের অতীত, বেদ কোরাণ আর তাহাকে কি শিক্ষা দিতে পারে? আর আমিই বা তবে তাহাকে কি শিখাইতে পারি। তুমি কি তবে জ্ঞান ছাড়িয়া সুখশান্তি লাভের বিদ্যা অধিকার করিতে চাও? সত্য বটে তাহা শাস্ত্রের অতীত, পণ্ডিত হইলেই সকলের সুখ শান্তি মিলে না, সুখ শান্তির অন্যরূপ সাধনা করাচাই।"

সন্ন্যাসীর প্রশংসায় যুবক ম্লান হইয়া পড়িলেন, বুঝিলেন এই পরীক্ষায় তাহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে,—সে কথায় কোন উল্লেখ না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "না

প্রভু আমি নিজের সুখশান্তি লাভের বিদ্যা চাহিতেছি না, আর অধিক কি বলিব ?”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“ধর্ম্মই সকল সুখের মূল, পুণ্যই সকল শান্তির আধার, আর ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও পুণ্যের উত্তেজক, তোমার এ সকলি আছে, এবিদ্যা তোমার আবশ্যকই বা কি ? তুমি কি তবে বৎস প্রকৃতিকে হস্তগত করিতে চাও ? প্রকৃতি বশে আনিয়া তুমি কি দেবতুল্য অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে চাও” ?

যুবক অধোবদনে বলিলেন, “না গুরু আপনি জানেন তাহা বলিতেছি না।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“আমি জানি বটে সত্যই যাহার ব্রত, দীনেতে যাহার দয়া কাম ক্রোধ যাহার বশীভূত, তাহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে—তাহার পক্ষে প্রকৃতি জয় করা অতি সামান্য কথা। বল বৎস তবে তুমি কি শিখিতেচাও, আমি বুঝিতে পারিলাম না?” যুবক বুঝিলেন পরীক্ষা শেষ হইল, তিনি সাহসীহৃদয়ে সবলকণ্ঠে বলিলেন—“যে বিদ্যার অদ্ভূত বলে আজ আপনি দীন দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া তিন লোক মুগ্ধ করিয়াছেন, পরকে সুখী করিবার সেই বিদ্যা আমাকে কৃপা করিয়া দান করুন। চিরদিন ধরিয়া এই এক ইচ্ছা, এই এক আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণের মধ্যে জাগিয়া আছে। অন্যের কষ্ট দেখিলে যখন আকুল হৃদয়ে তাহা উপশম করিতে ব্যগ্র হই কেন প্রভু তাহাতে সফল হইতে পারি না ? আমি আর কিছু চাহি না, এই বিদ্যা আমাকে দান করুন” রোমাঞ্চিত শরীরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রাণ ভরিয়া যুবাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “আমি তোমাকে যত দূর উচ্চ, ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহা হইতেও উচ্চ। এ পর্য্যন্ত এরূপ বিদ্যা আমার কাছে কেহ শিখিতে চাহে নাই। হউক, তাহাই হউক, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমার প্রেমের অনন্ত ধারে পাপী তাপী সুশীতল হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কর্ম্মে সুসিদ্ধ হওয়া যায় না। আত্ম পর না মানিয়া ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, ক্রমেই এই ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে যখন অভ্যাসে অভ্যাসে বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশি স্বতঃ উৎসারিত হইবে, যখন এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অনন্ত প্রেমকে ধরিতে পারিবে—যখন সেই ভালবাসায় স্বার্থের বিন্দুমাত্র থাকিবে না, তখনই সুসিদ্ধ হইবে এখন নহে। যাও বৎস গৃহে গিয়া ইহার সাধনা কর,”

আনন্দের উচ্ছ্বাসে, যুবার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল, তিনি এত আনন্দ বুঝি কখনও পূর্ব্বে অনুভব করেন নাই—যুবক কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন “আবার কবে আসিব” সন্ন্যাসী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, আর আসিতে হইবে না, যদি প্রয়োজন হয় আমাকে দেখিতে পাইবে”—বলিয়া অতি স্নিগ্ধ স্থির কটাক্ষে যুবকের প্রতি চাহিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, যুবার দেহ সবল হইল, প্রাণ তেজস্বী হইল, হৃদয়

জুড়াইয়া গেল, ভক্তিভরে অভিবাদন পূর্ব্বক সেখান হইতে যুবা চলিয়া গেলেন।

পরদিন আর সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছবি।

যেদিনের কথা হইতেছে, সেই দিন দ্বিপ্রহরের পর নৌকা হইতে হুগলি সহরের দিকে চাহিয়া দেখ—সম্পূর্ণ নুতন দৃশ্য দেখিতে পাইবে। এখন শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর ন্যায় শ্বেত প্রাসাদগুলি, একটির পর একটি সারি বাঁধিয়া গঙ্গা উপকূলে শোভা পাইতেছেনা, প্রাসাদের আশে পাশে, ছোট বড় গাছ গুলি, যেখানে যেটি শোভা পায় সেখানে সেটি সাজান নাই। কোথায় বা খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বড় ছোট গাছের রাশি জঙ্গল বাঁধিয়াছে, গায়ে গায়ে ঘেসাঘেসি করিয়া আপনাদের গাঢ় আলিঙ্গনে অবনত হইয়া লতায় জটাজুট লইয়া নদীতে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেই জঙ্গলের পরেই হয়ত খানিক দূর লইয়া একটি আর গাছ দেখা যায় না, সেখানে সারি সারি, চক্রের মত, আঁকা বাঁকা, নানা গড়নে সাজিয়া ছোট ছোট পাতার কুটির গুলি উইঢিবির মত প্রকাশ পাইতেছে। কোথায় বা এক একটি বড় বড় বট অশ্বত্থের রাশি রাশি পাতারফাঁক দিয়া এক একটি পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী অতি দীন হীন ভাবে উঁকি মারিতেছে, আবার কোথায় বা উপকূল যোড়া এক বিচিত্র উদ্যান যুক্ত বিচিত্র বৃহৎ অট্টালিকা, চারিদিকের ছোট কুটীরদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, আশে পাশের বড় বড় গাছ গুলির প্রতি উপেক্ষা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। আর এইরূপ একটি প্রাসাদের বাতায়নে একটি ছোট সুন্দর মুখ ফুটিয়া তাহার মধুররূপে উপকূলের কবিতাময় ভাবটি আরো ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যুবতী বাতায়নে বসিয়া কি সুঁচের কাজ করিতেছিলেন, কাজ করিতে করিতে কচি কচি আঙ্গুলগুলি বুঝি ক্লান্ত হইল, আনত মৃণাল কণ্ঠ, বুঝি ব্যথিত হইল, একবার কাজ ছাড়িয়া আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আকাশে মেঘের স্তরের উপর স্তর, পাছে একটি হইতে একটি সরিয়া পড়ে, একটি হইতে একটির বিচ্ছেদ হয়—তাহারা কত না ভয়ে ভয়ে কতনা প্রাণপণে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আলিঙ্গন করিয়া আছে—কিন্তু হায় দেখিতে দেখিতে তবু ঐ স্তরগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, একটি হইতে একটি সরিয়া পড়িতেছে,—ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। যুবতীর হৃদয়েও সহস্র চিন্তা আসিয়া সেই মেঘ পুঞ্জের মত স্তূপ বাঁধিতে লাগিল। এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার চোক টিপিয়া ধরিল। মুন্না চমকিয়া উঠিল, একবার সহসা কি যেন কি আশায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া যুবতী হাসিয়া বলিল, 'বুঝিয়াছি মসীম, চোখ ছাড়" মসীনও হাসিয়া চোখ ছাড়িয়া মুন্নার চোখের উপরে একখানি

ছবি ধরিয়া বলিলেন, "কেমন বল দেখি" এইখানে ছবির কথা একটু বলিয়া লই। মহম্মদ মসীন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসেন, পথে একজন ছবি-বিক্রিওয়ালা তাঁহাকে মহা ধরিয়া পড়িল, তাঁহার ছবি কিনিবার কোনই ইচ্ছা কিম্বা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু যখন ছবিবিক্রি-ওয়ালা একখানি ছবির দুই টাকা দাম চাহিয়া শুষ্ক মুখে মিনতি করিয়া বলিল "মহাশয় গো সমস্ত বেলায় আজ একখানা ছবি বিক্রি করতে পারিনি, এখন যদি কিছু পাই তবেই ছেলে গুলো খেতে পাবে" তখন মসীম আর একটি কথা না কহিয়া দুই টাকার স্থলে দশটি টাকা দিয়া ছবিখানি তুলিয়া লইলেন। ছবিওয়ালা অবাক হইয়া রহিল।

ভ্রাতার হাত হইতে ছবিটি স্বহস্তে লইয়া মুন্না তাঁহার দিকে ফিরিয়া বসিল। নামেতেই সকলে বুঝিয়াছেন ইহারা হিন্দু নহেন। মহম্মদ মসীন ও মুন্না দুজনে ভ্রাতা ভগিনী। তবে ঠিক আপনার ভাই বোন নহেন। মুন্নার মাতার দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহের সন্তান মসীন। তাহার পর তিনি বিধবা হইয়া ঐ সন্তানটিকে লইয়া আবার বিবাহ করেন, এই দ্বিতীয় বিবাহে মুন্নার জন্ম। মসীন ও মুন্না বরাবর এক বাড়ী-তেই থাকিতেন, উহাঁরা দুইজনে প্রায় সম-বয়স্ক বলিলেই হয়, দু-এক বছরের মাত্র ছোট বড়, সেই জন্য উহাঁদের মধ্যে মান্যের ব্যবধান নাই, সমকক্ষ ভাবেই উহাঁরা পর-স্পরকে ভাল বাসেন। মসীন দ্বাবিংশতি বর্ষীয় যুবক, উন্নত ললাট পূর্ণায়তন নয়ন উদার ভাবজ্যোতি পূর্ণ; নবীন শ্মশ্রু-শোভিত গৌর বর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী, অথচ সে তেজ অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত, প্রশস্ত বক্ষ শালী সুগঠন বলিষ্ঠ দেহ, যেন শত শত দুর্ব্বলের আশ্রয় নিকেতন। তাঁহার সেই স্নেহানুরাগের সবল আশ্রয়ের ছায়ায় দুর্ব্বল মুন্নাকে তিনি যেন অতি যত্নে রক্ষা করিতে চান।

মুন্না ছবিখানি দেখা হইলে একটুখানি হাসিয়া অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টিতে বলিল "এমন ভাল ছবি কোথায় পেলে? কে দিলে?" মসীন বলিলেন, "কেন দেবে আবার কে? অমনি কি কিছু পাওয়া যায় না?"

মুন্না। "এমন ভাল জিনিস অমনি পাওয়া যায় তাত জানতুম না।"

মসীন। "কেন ভাল জিনিষের কি আর দর আছে? এ পর্য্যন্ত তাতো দেখলুম না।"

মুন্না। "তবে বুঝি এখনো জহরী কেউ জন্মায়নি, তাই জহরের এত অনাদর।"

মসীন। "তুই ভাই আদরটা একবার দেখিয়ে দে, আমি বেচতে এসেছি, একটা মোটা দর বল,"

মুন্না হাসিয়া বলিল, "তোমার বেলায় ভাল জিনিসের দর নেই, তুমি পাও কুড়িয়ে, আর অন্যের বেলা মোটা দর চাও, বেশত মজা।

মসীন। "বুঝিলি নে. এই হচ্ছে সেয়ানা লোকের কাজ," মুন্না ছোট মাথাটি নাড়িয়া, অলক গুচ্ছগুলি দুলাইয়া একটু মৃদু মধুর হাসিয়া বলিল—"তুমিই এক সেয়ানা আর জগৎ শুদ্ধ নির্ব্বোধ বুঝি,"

মসী।। "নিদেন জগতের অর্দ্ধেক লোক মেয়ে আত। তাই ত তোর কাছে আগে বিক্রির জন্য এসেছি। কত দিবি বল" বলিতে বলিতে মসীন একটু হাসিলেন, সে হাসিতে তাহার শুভ্র ললাটে ঈষৎ সরস বিক্রপময় ভাবের যেন রেখা পড়িল. মুন্না বলিল, "মরে যাই আর কি,উনি যা পেলেন কুড়িয়ে, তাই আমি পয়সা দিয়া কিনিব। এক কানাকড়িও না।" মসীন ঘাড়নাড়িয়া বলিলেন— তুমি কানাকড়িও দিলে না. কিন্তু এর মধ্যে এর যে হাজার টাকা দাম উঠিয়াছে।" মুন্না হাসিয়া বলিল, "এমন নির্ব্বোধ কেসে?"

মসীন। "সে নির্ব্বোধ আর কেউ না, আমার সুযোগ্য ভগিনীপতি সালা উদ্দীন।"

স্বামীর নাম শুনিয়া মুন্নার প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল, হাসির রেখাটি অধর হইতে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এ কথা শুনিলেই মুন্নার কষ্ট হইবে, তাহা মসিন জানিতেন, সেই সম্ভাবিত কষ্টটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়েই প্রথম হইতে ওরূপ তামাসার ভাবে তিনি কথা পাড়িয়াছিলেন। মুন্নাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মসীন তামাসা রাখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমি ঠাট্টা করিতেছি না, সত্যই হাজার টাকার বিনিময়ে সালাউদ্দীন এইরূপ একখানিছবি পাইয়াছেন, এরূপ করিয়া আর কদিন চলিবে, অম [illegible] র্য্যা সবত যায় যায়. তুমি কি এক [illegible] ব না।"

[illegible] কুন্ন [illegible]

বলিলেন,

রিলে আমা.

কথায় সে স্বরে মসীনের সুন্দর মুখ কাল হইয়া পড়িল. ভাসন্ত চোখে যাতনা ফুটিয়া বাহির হইল—একটু পরে একটুখানি. কাষ্ঠহাসি হাসিয়া মসীন বলিলেন "ধন কার? তোমারি কি সব ধন নহে? তোমার মুখে ঐ কথা শুনিলে একজন বালকেও হাসিবে। সকল স্ত্রীলোকে যদি তোমার মত হইত তবেত দেখিতেছি জগতের ধারা উলটাইয়া যাইত"।

মুন্নার পিতার ঐশ্বর্য্যেই মুন্নার স্বামী ধনী সত্য, কিন্তু মুন্না কখনো ও ভাবে তাহা দেখে নাই। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে হইত না, যে উহা তাহার স্বামীর নহে মুন্নার নিজের ধন। ভ্রাতার কথায় মুন্না আশ্চর্য্য হইল, মুন্না ক্ষুব্ধ হইল, মুন্না বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। মসীন তাহা বুঝিতে পারিলেন—কথাটা শামলাইয়া লইবার ইচ্ছায় বলিলেন "কিন্তু যারধন সে যদি পাগল হইয়া যাহা ইচ্ছা করে, তবে সে পাগলকে কি কেহ নিরস্ত করিবে না"—

তাত সত্য, কিন্তু মুন্না কেমন করিয়া স্বামীকে বলিবে? মুন্না যে তাঁহাকে কতবার কাঁদিয়া, কত মিনতি করিয়া, কত. করিয়া বলিয়াছে, তাহাতে কি কোন ফল হইয়াছে? তিনি কি তাহাতে একবার ভ্রুক্ষেপ করিয়াছেন? তবে আবার মুন্না কি করিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিতে যাইবে? অভিমান করিয়া যে মুন্না নীরব থাকিতে [illegible] তাহা নহে, মুন্নার অভিমান নাই।

যে অবিশ্বাসে বিশ্বাস লুকাইয়া রহিয়াছে, যে নিরাশায় এখনো আশা, ভরসা দিতেছে, সে হৃদয়ে অভিমান আছে।—কিন্তু মুন্না অভিমান করিবে কেন? মুন্নার মনে স্বামীর ভালবাসার আশা বিন্দু মাত্র নাই, সে সন্দেহে বিশ্বাসের রেখা মাত্র নাই, স্থির-নিরাশায় মুন্নার হৃদয় গঠিত, মুন্না অভিমান করিবে কি? মুন্না যে স্বামীকে কিছু বলিতে চাহে না—সে তাহা হইতেও অধিক দুঃখে, অধিক কষ্টে। মুন্না তাহার সমুখে যাতনার অশ্রু নদী বহাইয়াছে, তিনি একবার ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, প্রাণের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস টুটিয়া যদি আপনা হইতে কোন কথা বাহির হইয়াছে তিনি না শুনিয়া চলিয়া গিয়াছেন, যদি কখনো আত্মহারা হইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তির আশার ন্যায় স্বামীর চরণ ধরিয়াছে তিনি সেই নির্ভরকারী লতাকে নির্দয়ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। স্নেহের চক্ষে অনুগ্রহ চক্ষে একবার চাহিয়া দেখেন নাই। সেই অবধি যাতনার তীব্র অনলে হৃদয় ভষ্মীভূত করিলে, হৃদয়ের অগ্নি নিশ্বাস গভীর নিশীথের বায়ু তরঙ্গে মুন্না মিশাইতে থাকে, উন্মত্ত দুঃখের অশ্রু লহরী বরফের মত হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া ফেলে, তবু কখনো স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করে না।

কিন্তু আজ মুন্নার প্রাণের ভিতর স্বামীকে যে কথা কহিবার বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে সে মুন্নার নিজের কোন কথা নহে, তবে ইহাতে সঙ্কোচ কিসের? মুন্না ভীরু নিস্তেজ হৃদয় পাষাণ বলে বাঁধিয়া স্বামীকে একবার এ কথা বলিয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিল। নিজের জন্য হইলে সহস্র কষ্টেও মুন্না বলিত না—কিন্তু স্বামী আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিতে বসিয়াছেন, মুন্না একবার সাবধান করিবে না? স্বামী তাহার কথা শুনিবেন না সে তাহা জানে—তবু সে দেবতার উপর নির্ভর করিয়া একবার তাহাকে বুঝাইবার সঙ্কল্প করিল, তার পর আস্তে আস্তে মসীনকে বলিল "তিনি কি আমার কথা শুনিবেন? আচ্ছা আমি একবার বলিয়া দেখিব"—

রামমোহন রায়।

সাধারণতঃ আমরা প্রতিদিন গুটিকতক করি ও স্ফীত হইয়া তা-

আমাদের প্রতিদিন পূর্ব্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি ধারাবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতি দিবসের উদরপূর্ত্তি প্রতিরাত্রের নিদ্রা—বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন শ পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্ত্তন এই ত আমাদের জীবন—ইহাতে আমাদের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হয় না; অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের অভাব নাই বটে কিন্তু আপনাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নাই। একপ্রকার নিকৃষ্টজাতীয় জীবাণু আছে সে কেবল গতিবিশেষ অবলম্বন করিয়া ঘুরিতেই জানে, সে সমস্ত জীবন একই ঘুরন ঘুরিতেছে, তাহার সহিত আমাদের বেশী প্রভেদ দেখিতে পাই না। আমাদের আহ্নিকগতি আছে বার্ষিক গতি নাই—আমরা নিজের চারিদিকে ঘুরিতেছি নিজের নাভিকুণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছি কিন্তু অনন্ত জীবনের কক্ষপথে এক পা অগ্রসর হইতেছি না। এই পরম কৌতুকাবহ আত্ম-প্রদক্ষিণ-দৃশ্য চতুর্দিকে দেখা যাইতেছে—সকলে মাটির উপরে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রচনা করিয়া লাটিমের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমির মধ্যেই জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রমণ নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। প্রতিদিন চারিদিকে ইহাই দেখিয়া মনুষ্যত্বের উপরে আমাদের বিশ্বাস হ্রাস হইয়া অম—সুতরাং মনুষ্যত্বের গুরুতর কর্ত্তব্য একাম করিবার বল চলিয়া যায়। এই জন্য

আদের প্রতি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করা বলিলেন নিতান্ত আবশ্যক।) মহাত্মাদের মিলে আমালোচনা করিলে মনুষ্যত্ব যে কি তাহা বুঝিতে পারি, "আমরা মানুষ" বলিলে যে কতখানি বলা হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, জানিতে পারি যে আমরা কেবল অস্থিচর্ম্মনির্ম্মিত একটা আহার করিবার যন্ত্র মাত্র নই, আমাদের সুমহৎ কুলমর্য্যাদার খবর পাইয়া থাকি। আমরা যে আমাদের চেয়ে ঢের বড়, অর্থাৎ মনুষ্য, সাধারণ-মানুষদের চেয়ে যে অনেক পরিমানে শ্রেষ্ঠ ইহাই মনের মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমাদের মাথা তুলিতে ইচ্ছা করে মৃত্তিকার আকর্ষণ হ্রাস হইয়া যায়।

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্য সকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদের যতই "আমার" মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা তাঁহাদের কার্য্য তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদের শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদের "আমার" বলিয়া মনে করি। এই জন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন

সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকেঁ ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন "মিল্টন, আহা তুমি যদি আজি বাঁচিয়া থাকিতে। তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে, তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তথাপিও যে জাতি কল্পনার জড়তা হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাহার মহত্ব কোনমতে অনুভব করিতে পারে না তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজেকে মস্তলোক মনে করিয়া নিজের পায়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিতেছি, বাষ্পের প্রভাবে স্ফীত হইয়া লঘু হৃদয়কে লঘুতর করিয়া তুলিতেছি। প্রতিদিনকার ছোটছোট মস্তলোকদিগকে, বঙ্গসমাজের বড় বড় যশ-বুদ্বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মত পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ব পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ব-পূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি। এজলাষ হইতে জোন্স্‌ সাহেব চলিয়া গেলে হাটে তাহার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখি, জেম্‌স্‌ সাহেব আসিলে তাহার পায়ে পুষ্পমালা দিই। অর্থের বিনয়ের উদারতার অভাব দেখিতে পাই না; কেবল আমাদের যথার্থ স্বদেশীয় মহাপুরুষকেই হৃদয় হইতে দূরে রাখিয়া, তাঁহাকে সম্মান করিবার ভার বিদেশীদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া রহিয়াছি ও প্রতিদিন তিনবেলা তিনটে করিয়া নূতন নূতন মৃৎপ্রতিমা নির্ম্মাণে নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া আছি।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহনরায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্ম্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য যে কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস জন্মিবে। আমাদিগকে যদি কেহ বাঙ্গালী বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব রামমোহন রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার আর একটি গুরুতর আবশ্যক আছে। (আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মত আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।) আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি "রামমোহন রায়, আহা তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গ-

দেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক—আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্ম বিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!

রামমোহনরায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আরেক্‌টা কথা দেখিতে হইবে। একেক্‌টা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায় কাজের হাট বসিয়া যায়, অনেকে মিলিয়া হোহা করিয়া একটা কাজের কারখানা বসাইয়া দেন, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে. বিশেষতঃ একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কার্য্যে মত্ততাসুখ ছিল না, অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইবার হাঁসফাঁস করিবার আনন্দ ছিল না, একাকী অপ্রমত্ত থাকিয়া ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, তাঁহার সঙ্কল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে সুধীরে তাঁহার গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। ব্যস্তসমস্ত চটুল স্রোতস্বিনীতে যেমন দেখিতে দেখিতে আজ চড়া পড়ে কাল ভাঙ্গিয়া যায়, —সেরূপ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া কাজ যত না হউক খেলা অতি চমৎকার হয়,—তাঁহাদের সে কালে সেরূপ ছিল না। মহত্ত্বের প্রভাবে হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোন প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ছিল। রামমোহনরায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোন কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল! তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই; তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদে-

শীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কি না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল,' বঙ্গভাষা বল' বঙ্গসাহিত্য বল,' সমাজ বল,' ধর্ম্ম বল' কেবলমাত্র হতভাগ্য স্বদেশের মুখ চাহিয়া তিনি কোন্ কাজে না রীতিমত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? কোন্ কাজটাই বা তিনি ফাঁকি দিয়াছিলেন? বঙ্গসমাজের যে কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখা-প্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন চেষ্টা করিলে একাদশ অবতারের পদ সহজে অধিকার করিয়া বসিতে পারিতেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন তাহা না করিয়া তিনি প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখনত দেখা যায় না। বড়-বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধা পান করতঃ এক প্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষক পণ্য দ্রব্য হইয়া উঠে, ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ নামটা বিলাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিবার সরঞ্জম করি। স্তুতি কোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণ শব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোন বিষয়ের যথার্থ ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারিনা তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয় আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারী রকমের বড় লোক, তাঁহারা নিজের শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড় বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু কিছু ভাল কাজ সে করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কি করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে সে স্থায়ীভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করে সেও যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের [illegible]হতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রো[illegible]ণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি না [illegible] থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা [illegible]বন্ত ভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমা[illegible]জের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ ক[illegible]রিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লঘু আত্মাই প্রবাহে ভাসিয়া উঠে ভাসিয়া যায়। যাঁহার আত্মার গৌরব আছে তিনিই প্রবাহে আত্মসম্বরণ করিতে পারেন। রামমোহন রায়ের এই আত্ম-ধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কি সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহা নিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার অঙ্গারের খণিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কি কাণ্ডই উপস্থিত হয় ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন ব্যক্তি সহজে ধারণ করিতে পারে? কোন বালক ত পারেই না। কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত

মহৎ ছিলেন এই জন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল, এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশের মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্য রক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরাত ধৈর্য্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তুপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুঁ দিয়া দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া বাহাদুরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর নিভিবে না। এত বল এত ধৈর্য্য নহিলে তিনি রাজা কিসের? দিল্লির সম্রাট তাঁহাকে রাজোপাধি দিয়াছেন কিন্তু দিল্লির সম্রাটের সম্রাট তাঁহাকে রাজা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষে বঙ্গসমাজের মধ্যে তিনি তাঁহার রাজ সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবে আমরা কি তাঁহাকে সম্মান করিব না?

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও এক-প্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতবড় ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায় এমন আর কোথায়! রামমোহনরায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল তাহার জীবন নাই অস্তিত্ব নাই কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে মাভৈঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন,তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়ত ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্প বধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের

আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে।

রামমোহনরায়ের সময়ে হিন্দুস... ভিত্তির সহস্র ছিদ্রে স...স্র বাস্তু-অসস্তু রোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহনরায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এই জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহনরায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবলপ্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্গচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণ বাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রেরা যখন হিন্দু-কালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশান দৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের ... হিন্দুসমাজের কিছুই ভাল কিছুই ...। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ...ঃ বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালরূপ স...কার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নি...ক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণ মনে যে গৃহে ফিরিয়া আ...সিবেন প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতি...র প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূ...তপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে ... দিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্ম...ন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা ক... তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙ্গিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছাস সর্ব্ব প্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রামমোহনরায়—তাঁহারত এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি ত স্থিরচিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার অন্ধকার হিন্দুসমাজে আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক ত জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহনরায়ের প্রধান মহত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে

জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ক’লেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া f ধর্ম্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়ি” ছিল, যে জড়পাষাণ স্তূপে পিষ্ট ” ধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হই” …োহনরায় সেই মৃতভার সেই জড়স্তূপে তাহার ভিত্তি প্রচণ্ডবলে আঘাত করিলেন, আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল তাহার বিপুলায়তন বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দু তিনি ভাঙ্গিয়া প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতি দেব-প্রপড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম, কেবল তিমা আর দেখা যাইতেছিল স্তুউচ্চ মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্র ধূলিস্তূপ … হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার ' অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছে …ড় নানা-বিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্ততঃ প্রতিদিন ক…ণ্টকাকীর্ণ গুল্ম সকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই প… ুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে ছিল। হিন্দুসমাজ … দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে … পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বত প্রমাণ জ… …রের তলে পড়িয়া প্রতিদিন … …জন হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্ন মন্দির ভাঙ্গিলেন সকলে বলিল তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই জন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কি সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া …

… রা… হইতেছিল; … …তে মাঝ খানে … । তিনি যে বাঁধ নি… দিলেন খ্রীষ্টিয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মত মহৎলোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়ত দুয়েকটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু … এত কারবার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্ম্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল—তিনি ত বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্ম্মাগ্নি আহরণ করিতে পারিতেন ; তবে কেন তিনি সঙ্কীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য সকল ধর্ম্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষেরই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান দর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার লাভ করিবার সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে দুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকাজের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক না হইত

তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত। তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম না কি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এই জন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোন দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোন বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন, সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোন জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি, ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এ ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না চাহিও না কিন্তু অবস্থা ও সাধনা বিশেষের গুণে ইহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী। আমি যদি উদারতাপূর্ব্বক বলি, খৃষ্টধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, মুসলমান ধর্ম্মে ব্রাহ্মধর্ম্ম আছে, তবে উদারতা নামক পরম শ্রুতিমধুর শব্দটার গুণে তাহা কানে খুব ভাল শুনাইতে পারে কিন্তু কথাটা মিথ্যা কথা হয়। সুতরাং সত্যের অনুরোধে মিথ্যা উদারতাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই জন্য রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষিদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম, সমস্ত জগতে ইহাকে প্রচার করিতে হইবে এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষরূপে রোপন করিতে হইবে। ভারতবর্ষেরত দারিদ্র্যের অভাব নাই, জীবন্ত ঈশ্বরকে হারাইয়া ভারতবর্ষ ক্রমাগত হীনতার অন্ধকূপে নিমগ্ন হইতেছে, আমাদের পৈতৃক সম্পদ যে ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্ন আছে রামমোহন রায় সেই ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, আমরা কি গৌরবের সহিত মনের সাধে আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে পারিব! আমাদের দীনহীন জাতিকে এই একমাত্র গৌরব হইতে কোন্ নিষ্ঠুর বঞ্চিত করিতে চাহে? আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ব্রহ্মকে পাইয়া কি আমাদের হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না?

আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শন-শাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মেতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্ম্মে আছে, আমাদের ধর্ম্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসোবৈ সঃ। তিনি রস স্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দ-য়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ সমীরণে আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ এই জন্যই আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের অবসান থাকে না। এত পাই-য়াও কি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট থাকে? এমন অসীম আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জ্জিত, ভারত-বর্ষীয়দের উপার্জ্জিত আমাদের উপার্জ্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমা-দিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর আত্মা হইতেও আত্মীয়তর এমন আর কোন দেশের ঈশ্বর নহেন, রামমোহন রায় ঋষি-প্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি স্পর্দ্ধিত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিতেন তবে আমাদিগকে কতদূরেই ভ্রমণ করিতে হইত—তবে আমাদের হৃদয়ের এমন অসীম পরি-তৃপ্তি হইত না, তবে সমস্ত ভারতবাসী বি-শ্বাস করিয়া তাঁহার সেই নূতন পথের দিকে চাহিয়াও দেখিত না। তিনি যে ক্ষুদ্র অভিমানে অথবা উদারতা প্রভৃতি দুই একটা কথার প্রলোভনে পুরাতনকে পরি-ত্যাগ করেন নাই, এই তাঁহার প্রধান মহত্ত্ব।

বাস্তবিক, একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় জ্ঞানের কথায় আর ভাবের কথায় একই নিয়ম খাটে না। জ্ঞানের কথাকে ভাষান্তরিত করিলে তাহার তেমন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভাবের কথাকে ভাষা বিশেষ হ-ইতে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভাষান্তরে রোপন করিলে, তাহার স্ফূর্ত্তি থাকে না, তাহার ফুল হয় না ফল হয় না, সে ক্রমে মরিয়া যায়। আমি ভারতবাসী যখন ঈশ্ব-রকে দয়াময় বলিয়া ডাকি তখন সেই দয়া-ময় শব্দ সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান ভারত-বাসীর বিরাট হৃদয় হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের আকাঙ্খা কুড়াইয়া লইয়া কি সুগভীর ধ্বনিতে ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উত্থিত হয়। আর অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে যদি Merciful বলিয়া ডাকি তবে Webs-ter's Dictionary-র গোটাকতক শুষ্কপত্রের মধ্যে সে শব্দ মর্ম্মর করিয়া উঠে মাত্র। অতএব ভাবের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদারতা

খাটে না। আজকালকার অনেক ধর্ম্ম প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে ইংরাজি "Faith"শব্দকে অনুবাদ করিয়া "বিশ্বাস" নামক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় যে হৃদয়ের অভাববশতঃ স্বদেশীয় ভাষার অমূল্য ভাবের ভাণ্ডার তাঁহাদের নিকটে রুদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বাস শব্দের বিশেষ স্থলে বিশেষ প্রয়োগ আছে, কিন্তু ভক্তি শব্দের স্থলে বিশ্বাস শব্দের প্রয়োগ অসহ্য। অলীক উদারতার প্রভাবে স্বদেশীয় ভাবের প্রতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি জন্মিলে এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে যদি সস্তা কাপড় সহজে কিনিতে পাওয়া যায় তবে তাহার উপরে মাসুল বসাইয়া সেই জিনিষটাই আর এক আকারে বিলাত হইতে আমদানি করাইলে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করা হয়! সর্ব্ব সাধারণে কি সে কাপড় সহজে পরিতে পায়? এক হিসাবে বিলাতের পক্ষে উদারতা করা হয় সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাকে প্রকৃত উদারতা বলে না! আমি নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছি বলিয়া কি সকলে বলিবে আমি হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ পরের সহিত স্বতন্ত্র হইতেছি? স্বগৃহ না থাকিলে আমি পরকে আশ্রয় দিব কি করিয়া? রামমোহন রায় সেই স্বগৃহ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। অথচ স্পষ্ট দেখা গিয়াছে পরের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহাকে অনুদার বলিতে চাওত বল! উদ্ভিজ্জ ও পশু মাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ আমাদের নিজের জীবন আছে বলিয়া। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিঁকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই তবে পারলৌক মৃত দেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃত ভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু, তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। তাও যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সম্পূর্ণ করিতে পারিব এমন ভরসা নাই। আমাদের জঠরানলেরও যেমন এমন সার্ব্বভৌমিক উদারতা নাই যে সমস্ত খাদ্যকে সমান পরিপাক করিতে পারে আমাদের হৃদয়েরও সেই দশা, কি করা যায় উপায় নাই। এই জন্যই বলি প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আগে আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই তাহার পরে

সার্ব্বভৌমিকতার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গৃহদেবতা তিনি ভারতবর্ষের পিতা। তিনি ভারতের হৃদয়ের যত নিকটবর্ত্তী তিনি ভারতের অভাব যত বুঝিবেন এমন আর কেহ নহে। ব্রহ্মই ভারতবর্ষের জাগ্রত দেবতা, জিহোবা গড অথবা আল্লা আমাদের ভাবের সম্পূর্ণ গম্য নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ইহা বুঝিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি হইলে ভারতের এ মর্ম্মান্তিক অভাব হয় ত তাঁহার চক্ষে পড়িত না। [আমাদের ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণ স্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্ম দর্শন লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারত ভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে ঋষিদের জয়ে সত্যের জয়ে ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রাবলী।

"A thing of beauty is a joy for ever" Keats.

১

কদম কাননে কে মরি! সজনি,
বাঁশরী বাজায় রাতে।
সুরেতে সুরেতে ছবি এক খানি
এঁকে দেয় হৃদি-পাতে!
বাশরী বাজায়ে রাতে।

২

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে
চঞ্চল যমুনা-জল !
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ভাঙা ভাঙা চাঁদ,
মুখে আধ' কল কল !
কূলে কূলে ঢল ঢল !

৩

কূলেতে দাঁড়ায়ে কদম্ব তরুটি,
একটু প'ড়েছে হেলে,
ছায়াটি, জলেতে ধরিতে চাঁদেরে,
আকুলি ব্যাকুলি খেলে !

৪

পুট পুট ক'রে একটি আধটি
খসিছে পল্লব ফুল।
থেকে থেকে থেকে শিহরে সমীর,
হইয়া সৌরভাকুল !

৫

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
পূর্ণিমা শরত-চাঁদ !
মুখেতে হাসিটি পড়িছে লুটিয়া,
চ'খে আধ' ঘুম-ছাঁদ !

৬

পাতলা মেঘ-গুলি, হেলি দুলি দুলি,
ভাসিয়া ভাসিয়া যায় !
ব'সে ব'সে ব'সে ছোট তারা-গুলি
আধ' ঘুম-ঘোরে চায় !

৭

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে—
কে যমুনা-তীরে আসি,
কদম-তলায় মোহন মূরতি
দাঁড়ায়ে, বাজায় বাঁশি !

৮

মধুর অধরে মদির হাসিটি,
উছলি উছলি ঝরে !
তরল নয়নে চমক-চাহনি,
চমকে গো কার তরে !

৯

ঘেরি চারিদিকে অবাক নয়নে
দাঁড়ায়ে গোপিনী-কুল।
কারো হাতে মালা, কারো বা চন্দন,
কারো বা হাতেতে ফুল !

১০

পায়ের কাছেতে প'ড়েছে শুইয়া
বিবশা হরিণী-কুল ;
দূরেতে কোকিল ডাকিছে ভুলিয়া,
খসিছে কদম-ফুল।

১১

অধরের কাছে গুঞ্জরে ভ্রমর ;
সমীর বহিছে ধীরে ;
নাচিছে শিখিনী ছড়ায়ে পেখম ;
যমুনা উথলি উঠিছে তীরে।

১২

তরুলতা পাতা নাচিছে মৃদুল ;
জ্যোছনা প'ড়েছে শুয়ে।
প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় খেলিয়া,
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে !
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে !

শ্রী অক্ষয় কুমার বড়াল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

গৃহলক্ষ্মী। (যথা প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে যে সকল গুণ শিক্ষার আবশ্যক স্ত্রীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ) শ্রী গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত।

পুস্তক খানির প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ গিরিজা বাবুর লেখা নহে, ইঁহার কোন বন্ধুর লেখা। এই তিনটি পরিচ্ছেদ বাদ দিলেই ভাল হইত, ইহাতে শিক্ষার মত কিছুই দেখিতে পাই না, কুশিক্ষাই প্রায় সব। ভরসা করি পুনঃ মুদ্রাঙ্কনের সময় লেখক একবারে এই তিনটি পরিচ্ছেদ উঠাইয়া দিবেন।

উক্ত তিনটি পরিচ্ছেদ ছাড়া বইখানি সুন্দর হইয়াছে, ইহার উপদেশ গুলিই যে কেবল সারগর্ভ এমন নহে, নাটকাংশেও বইখানি প্রশংসনীয়। স্ত্রী যে কখনো একটু অভিমান করিয়া, কখনো একটু লজ্জার ভাবে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি ঢালিয়া স্বামীর সহিত কথা কহিতেছেন সে কথায় রমণী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য যেমন ফুটিয়াছে তাহাতে তাহার বাঙ্গালিত্বও তেমনি বজায় আছে, তাহার কথা বার্ত্তা পড়িলে-বাঙ্গালি-ঘরের মেয়ের একটি পরিস্ফুট ছবি আমাদের চোখে পড়ে। লেখকের সহিত একটি বিষয়ে আমাদের মতের অনৈক্য হইতেছে, তিনি স্ত্রীলোকদের সঙ্গীত শিক্ষা করিতে বলেন। আমাদের দেশের মেয়েরা যে গান গাহিতে জানেন না এমন নহে, আড়াল হইতে শুনিয়া শুনিয়া, কিম্বা স্বামী ভাই প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের কাছে শুনিয়া শুনিয়া, তাঁহারা আপনা হইতেই গান গাহিতে শিখেন। পাঁচ জন মেয়ে একত্র হইলে গানটা তাঁহাদের না গাহিলে একবারে চলে না, আর স্ত্রী গাহিতে জানিলে স্বামীর কাছে যে না গাহেন তাহাও বোধ হয় না। ইহার পর নূতন করিয়া শিক্ষার কথা বলিলে গায়কের কাছে শিক্ষা করা বুঝায়, কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহা কতদূর উপযোগী বলিতে পারি না। বিশেষ শ্বশুর শাশুড়ি গুরুজন এরূপ শিক্ষা কতদূর পসন্দ করিবেন সন্দেহ, সুতরাং এ রূপ স্থলে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমে অবাধ্যতা শিক্ষা করিতে হয়।

গৌড়গীত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

নীরবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোর ;
সম্ভাষিল উচ্চে লিঙ্গো রিকদ রাক্ষসে।
বলিল রিকদ, "ভাল প্রতারিত তুমি
করেছ মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন।"
আলিঙ্গিয়া বৃদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল,
"নমি আমি খুড়া তোমা।" হাত ধরাধরি
বসিল উভয়ে তবে আগুনের পাশে।
জিজ্ঞাসিল রক্ষ "কোথা হতে বাপু তুমি,
আসিয়াছ হেথা ?" "এসেছিল ভাই মোর
অগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহারে
তুমি করেছিলে তাড়া ; যদ্যপি গ্রাসিতে,
কোথা পাইতাম তারে এজনমে পুনঃ ?"
উত্তরিল খুড়া "হয়ে গেছে যা হবার,
করেছিনু ভুল, আছে কন্যা সাত মোর,
লয়ে যাও তাহাদিগে দিনু অনুমতি।"
সম্ভাষি রিকদে লিঙ্গো হইয়া বিদায়,
চলিল যথায় ছিল কন্যা সাত তার ;
বাহিরিয়া গৃহ হতে আসি লিঙ্গো-পাশে
প্রশ্নিল সকলে তারে, "কে তুমি যুবক ?
আসিয়াছ কোথা হতে, বলতো মোদিগে।"
"পিতা তোমাদের খুড়া সম্বন্ধে আমার,
নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য ঈশ্বরের আমি।
অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিনু হেথা ;
ক্ষুধায় পীড়িত ভাই চারি জন মোর,
রহিয়াছে বসি দূরে মোর প্রত্যাশায়।"
"ভাই তুমি আমাদের ? উত্তম সম্বন্ধ !
কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে ?
লবে না মোদিগে সঙ্গে ? মোরাও যাইব।"
"আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্র ক'রে।"
চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ।
লিঙ্গোর প্রতীক্ষা করি গোঁড় চারি ভাই
আছিল বসিয়া পথ নিরীক্ষণ করি ;
দেখি দূর হতে তাকে, বলিল সানন্দে,—
"ভাই লিঙ্গো, আসিতেছে ;" উঠিল সকলে,
চাহিল লিঙ্গোর দিকে, চমকি উঠিল ;
"কে ওরা লিঙ্গোর সাথে ? সুন্দর উহারা !
কার কন্যাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো ?
দেয় যদি উহাদিগে, করিব বিবাহ।"
সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে,—
"তনয়া ইহারা শুন খুঁড়ার আমার ;
রাঁধিয়া যতনে সেবা কর ইহাদের।"
জ্বালাইয়া অগ্নি তবে গোঁড় চারি ভাই,
করি মাংস পাক, সুখে খাইল সকলে।
ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্নীগণে,
"এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও ত্বরা করি।"
উত্তরিল ভগ্নী সাত, "যাইবে যথায়,
যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে।"
এত শুনি বলিলেক গোঁড় চারি ভাই,—
ভালত বলিছে এরা, স্বীকারিলে তুমি,
ভাই, লিঙ্গো, মোরা সবে বিবাহ করব।
লও বাছি সকলের সুন্দরী যে হয় ;
লবে বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ

তাহাদিগে।" বলিলেন লিঙ্গো "শুন ভাই,
নাহক কাঁদনা মোর বিবাহ করিতে ;
ভ্রাতা মোর তোমা সবে, ভগিনী উহারা,
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে !
বয়সে তোমরা বড়, সর্ব্বছোট আমি ;
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয় ;
আনি দিবে জল, খাদ্য, করিবে প্রস্তুত
শয্যা, করাইবে স্নান, বস্ত্রাদি ধুইবে।"
"কেমনে বিবাহ লিঙ্গো করিব আমরা ?
ভাই মোরা চার, কিন্তু ভগ্নী সাত জন।"
"জ্যেষ্ঠ তিন কর বিয়ে প্রত্যেক দুজনে,
করিবে কনিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ।"
চলিল সকলে তবে কাচিকোপাগ্রামে ;
না ছিল পুরুষ তথা, না ছিল রমণী।
হরিদ্রাদি বাটি লিঙ্গো মাথাল সকলে ;
নির্ম্মিল মণ্ডপ এক, সাজাইল তায়
গাঁথি বহু পর্ণ মালা। এরূপে সমাপ্ত
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্যেষ্ঠ ভাই,—
কত উপকার লিঙ্গো করেছে মোদের ;
বিবাহের তরে আনি দিয়াছে তনয়া ;
পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমরা ;
আহরিয়া ফলফুল আনি দিব তারে ;
শীকার আনিব ঘোর অরণ্য হইতে ;
দোলানায় শুয়ে সুখে থাক্ লিঙ্গো ঘরে।"
বাহিরিল চারিভাই তীরধনু হাতে,
শীকার উদ্দেশে, ঘন আঁধার জঙ্গলে ;
দোলনায় শুয়ে লিঙ্গো সুখে নিদ্রা যায় ;
গোঁড়পত্নী সাত জন দোলায় তাহারে।
এইরূপে কয়দিন হইল অতীত।
একদা গিয়াছে বনে গোঁড় চারিজন ;
নিদ্রাযায় দোলনায়, লিঙ্গো গুরুতর ;
ভাবিল ভগিনী সাত—নাহি হাসে লিঙ্গো !
নাহি কভু কহে কথা আমাদের সনে !
না চায় মোদের পানে ! কহাইব কথা
তাকে আমাদের সনে ; হাসাইব তাকে ;
আমোদ প্রমোদ মিলি করিব সকলে।
কেহ হস্ত কেহ পদ ধরিল লিঙ্গোর ;
কেহবা দিইল টান ধরি তার গাত্র।
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মেলিয়া নয়ন।
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জনে,
"হেন ব্যবহার কেন কর মোর সনে ?
ভগিনী তোমরা মোর নাহি কি স্মরণ ?
দাস আমি ঈশ্বরের,—যায় যাক্ প্রাণ,
হাসিব না তবু আমি তোমাদের সনে ;
চাহিব না তবু আমি তোমাদের পানে।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বলিল সকলে,—
"চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদের পানে ?"
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসর তারা।
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক
ক্রোধে হইল পূরিত ; উত্তরিল লিঙ্গো
দ্রুত দোলনা হইতে। সম্মুখে মুদ্গর
ছিল পড়ি, লয়ে তাহা প্রহারিল সবে।
প্রহারিত ভগ্নী সাত যায় পলাইয়া।
দোলনায় ফিরি লিঙ্গো পুনঃনিদ্রা যায় ;
নিজ নিজ গৃহে ফিরি গেল ভগ্নী সাত।
মধ্যাহ্ন সময়ে আসে গোঁড় চারি ভাই ;
মেরেছে হরিণ কেহ কেহ খরগোস,
ময়ূর কেহ বা, ফুল আনিয়াছে কেহ ;
আপন আপন বোঝা তারা নামাইয়া,
বলিল সকলে "চল, লিঙ্গোকে মোদের
ভেটিব আমরা, দিব উপহার ফুল।
দোলনায় নিদ্রাযায় দেখিয়া লিঙ্গোকে,

আপন আপন ঘরে ফিরিল সকলে।
করিয়া নিদ্রার ভাণ আছিল শুইয়া
ভগ্নী সাতজন, যেন জড়সড় ভয়ে।
জিজ্ঞাসিল সবে "কেন নিদ্রিত তোমরা ?
কেন না দোলাও সবে লিঙ্গোর দোলনা ?"
উত্তরিল তারা:—"শুন, বলি তবে শুন,
সে পোড়া লজ্জার কথা—লিঙ্গোর আচার
হায় কি লজ্জার কথা। কতদিন আর
লুকায়ে রাখিব মোরা ? ছিনু এত দিন
চুপ করি—কত দিন স'ব অপমান ?
এক স্ত্রীর দুই স্বামী সম্ভবে কি কভু ?
এইদণ্ডে পিতৃগৃহে ফিরি যাব মোরা।"
এত শুনি জ্বলি ক্রোধে বলে যত গোঁড়;
"বলেছিনু মোরা 'লিঙ্গো' করহ বিবাহ
সপ্ত ভগিনীর মধ্যে যারে সাধ যায়;
বলিল তখন ভণ্ড, পাষণ্ড, পামর,
'দেখিব ওদিকে আমি মাতার সমান;'
শঠ লিঙ্গো প্রতারিত করেছে মোদিগে।
বন মধ্যে ছলে ধূর্ত্তে যাইব লইয়া;
নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটিয়া।
মারিয়াছি এত দিন হরিণ খরগোস;
নূতন শীকার মোরা করিব আজিকে।
মারিয়া তাহারে, ছিঁড়ি নিব চক্ষু দুটী;
খেলিব সে চক্ষু লয়ে আমোদে আমরা।
এ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ নাহিক পুরিবে,
জলস্পর্শ ততক্ষণ কেহনা করিবে।"
চলিল সকলে তবে লিঙ্গোর সদন;
"উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই" বলিল সকলে।
উত্তরিল লিঙ্গো তবে, "কি হয়েছে ভাই ?
কোথা ফুল? কোথা জন্তু? খালি হাতে কেন?"
বলিল তাহারা, "এক দেখিয়াছি জন্তু
প্রকাণ্ড-শরীর, বহু মারিলাম তারে,
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে।
ক্লান্ত হয়ে শেষে মোরা এলাম চলিয়ে।
উঠিয়া বসিল লিঙ্গো, ভাইদের পানে
বলিল চাহিয়া—'আমি মারিব সে জন্তু।"
লিঙ্গো সনে চারি গোঁড় অরণ্যে চলিল;
অন্বেষিল চারিদিকে, মিলিল না জন্তু;
সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো,
"গিয়াছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।"
বৃক্ষ মূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে।
বলিল তাহারা, "বস, ভাই, হেথা;
আনি দিব জল তোমা," চলি কিছু দূর,
ছুড়িল চারিটী তীর আড়াল হইতে
গোঁড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি।
সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ।
ছিঁড়িলয়ে চক্ষু দ্বয় শবদেহ হতে,
সন্ধ্যাকালে গোঁড় চারি ফিরিল আবাসে।
বলিল সম্বোধি পত্নী তবে এক জন,
"জ্বাল অগ্নি শীঘ্র করে, জ্বালহ প্রদীপ;
খেলিব আমরা সবে মিলি কুতূহলে।"
হরিষে সকলে তবে হাঁটু গাড়ি বসি,
আরম্ভিল খেলিবারে চক্ষু দুটী লয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ বসু।
(বিএস্ সি লণ্ডন)

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

মাঘ মাসের ভারতীর ৪৪০ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্মা (হরিবংশ মতে ধন্বন্তরি) আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন—তদ্‌যথা, শল্য, শালাক্য কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমার-ভৃত্য অগদতন্ত্র রসায়ণতন্ত্র এবং বাজীকরণ তন্ত্র।

১। শল্যশাস্ত্র (বা অস্ত্র চিকিৎসা)। বিবিধ প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধূলি, লৌহ লোষ্ট্র, অস্থি, নখ, পূয় প্রভৃতি দেহের মধ্যস্থ হইলে তাহাদিগকে শল্য কহে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার অগ্নি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া দেহস্থ শল্য বাহির করিবার উপায় এবং ব্রণ নির্ণয়ের নিয়ম এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

২। শালাক্য—উর্দ্ধজত্রুগত রোগ, অর্থাৎ চক্ষুরোগ কর্ণরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ এবং নাসিকাসংস্থতরোগ প্রভৃতির শান্তির নিমিত্ত এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। কায়চিকিৎসা—সর্ব্বাঙ্গসংস্থত রোগ সমূহের অর্থাৎ জ্বর, অতিশয়, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতির শান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। ভূতবিদ্যা—দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস পিতৃগণ, পিশাচ, নাগ, এবং গ্রহ প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপসৃষ্ট মনুষ্যদিগের নিমিত্ত শান্তিকর্ম্ম, বলিহরণাদি গ্রহশান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৫। কৌমারভৃত্য (ধাত্রী-বিদ্যা)। পশু পালন, ধাত্রীর স্তন্য দুগ্ধের দোষশোধন এবং দুষ্ট গ্রহ সমুত্থিত ব্যাধি সমূহের শান্তির উপায়, এই অংশে বর্ণিত আছে।

৬। অগদ তন্ত্র (বা বিষ চিকিৎসা)। সর্প, কীট, মাকড়শা, বৃশ্চিক, ইন্দুর প্রভৃতির বিষ নিরূপণ, বিবিধ বিষসংযোগজ্ঞান এবং সর্পাদি দষ্ট ও বিবিধ বিষোৎপন্ন রোগ সকলের শান্তির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৭। রসায়ন তন্ত্র—বয়স্থাপণ, আয়ু মেধা ও বল বর্দ্ধণ এবং রোগ হরণ প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

৮। বাজীকরণ—অল্প, দুষ্ট অশুদ্ধ ও ক্ষীণ শুক্রের আপ্যায়ণ উপচয় প্রভৃতির উপায় এই অংশে বর্ণিত আছে।

প্রচলিত সুশ্রুত, চরক, হারীত, বাভট, ভাবপ্রকাশ চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে আয়ুর্ব্বেদে শারীর-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান, শরীরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধনির্ণয় শুক্রশোণিত-সম্বন্ধ নির্ণয়, শুক্র পরীক্ষা, আর্ত্তব (ঋতু শোণিত) পরীক্ষা, নাড়ীবিজ্ঞান, নেত্রপরীক্ষা, জিহ্বা পরীক্ষা, মূত্রপরীক্ষা, মলপরীক্ষা, গর্ভরক্ষা, শিশুপালন, স্তন্যদুগ্ধ-পরীক্ষা প্রভৃতি ধাত্রী-বিদ্যা, দিনচর্য্যা ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি যাবতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনির্ণয়, রোগোৎ-পত্তির কারণ, রোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়, ধাতু ও বলাবল পরীক্ষা, ধাতুর ক্রিয়া, দেশ

কাল পাত্র ভেদে খাদ্য ও ঔষধাদির নির্ণয়, জল বায়ু প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয়। উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা, দ্রব্য নিরূপণ, দ্রব্য-গুণ ও ক্রিয়া, মিশ্রদ্রব্যের গুণ, সংযোগ প্রয়োগ বিজ্ঞান, বিষ নিরূপণ, দ্রব্য গ্রহণ ও ঔষধ প্রস্তুতের নিয়ম, শরীরের সহিত ঔষধের এবং ঔষধের সহিত ব্যাধির সম্বন্ধ নির্ণয়, বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইবার উপায়, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া, শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত দেহের পরীক্ষা, অস্ত্র চিকিৎসা, বিবিধ প্রকার অস্ত্র ও যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, রোগানুসারে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী, বন্ধন বিরেচন, পিচকারি প্রয়োগ প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম, স্বেদবিধি, অগ্নিপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ, জলৌকাবিধি, শৃঙ্গ প্রভৃতি নানা যন্ত্রযোগে রক্তমোক্ষণ প্রণালী, রাসায়নিক ক্রিয়ার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্র নির্ণয়, ধাতু প্রভৃতির জারণ মারণের নিয়ম, সূপ-শাস্ত্র প্রভৃতি চিকিৎসোপযোগী অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে॥

এই আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন মতের চিকিৎসা প্রণালী প্রবিষ্ট হইয়াছে—

১। বৈদিক চিকিৎসা।—ব্রহ্মসংহিতা, আত্রেয় সংহিতা, সুশ্রুত, চরক, হারীত সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পাচন, তৈল, ঘৃত, অবলেহ প্রলেপ প্রভৃতি প্রাচীনতম ঔষধাদি বৈদিক চিকিৎসা সম্মত।

২। তান্ত্রিক চিকিৎসা—শিবোক্ত তন্ত্রাদিতে যে সমস্ত চিকিৎসা প্রণালী, বটিকা রস সংযুক্ত ঔষধ প্রভৃতি বর্ণিত আছে তাহাই তান্ত্রিক চিকিৎসা সম্মত। অতি-পূর্ব্বে (বৈদিক সময়ে) কেবল তৈল ঘৃত পাচন প্রভৃতি দ্বারাই চিকিৎসা করা হইত। সুশ্রুত, চরক, হারীত প্রভৃতি গ্রন্থ, কেবল ঔষধাদিতেই পূর্ণ। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তন্ত্র সম্মত বটিকা ও রস সংযুক্ত ঔষধাদি ব্যবহৃত হয়।—

৩। অবধূত চিকিৎসা।—ঘেরণ্ড সংহিতা যোগতরঙ্গিণী গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ, গহ্বলনাথ প্রভৃতি অবধূতবরদিগের ঔষধাদি, অঙ্গুরীয় ধারণ, মাদুলী ধারণ প্রভৃতি এবং সন্যাসী প্রদত্ত ঔষধাদির অধিকাংশ অবধূত চিকিৎসা সম্মত।

৪। পশ্বাদি চিকিৎসা—অশ্বায়ুর্ব্বেদ গজায়ুর্ব্বেদ গবায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ ও তদুক্ত ঔষধাদি পশু চিকিৎসা সম্মত।

৫। Simila Semilicus Curantur সমঃ সমং শময়তি অথবা বিষস্যবিষমৌষধং প্রভৃতি মতকে যদি হোমিওপ্যাথিক মত বলা যায়, তবে আয়ুর্ব্বেদমতেও অনেক রোগেই প্রায় হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা বিদ্যমান আছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিদান স্থানের উপশয়ে প্রচ্ছন্নভাবে হোমিওপ্যাথিক মতের লক্ষণাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, মন্ত্রাদিচিকিৎসা প্রভৃতি বৈদিক চিকিৎসার অন্তর্গত সুতরাং এই সমস্ত চিকিৎসাকে আর স্বতন্ত্র মতের চিকিৎসা বলা যায় না।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধান রাখেন না তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে, পাশ্চাত্য

চিকিৎসা শাস্ত্রের যতদূর উন্নতি হইয়াছে সে তুলনায় আয়ুর্ব্বেদ অনেক অসম্পূর্ণ। তাঁহাদের মতে শারীর বিদ্যা (Anatomy) এবং অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কিছুই নয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন সংহিতাগুলি দেখিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

আয়ুর্ব্বেদে যে সকল বিষয় আছে আমরা উপরে তাহার একটী অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছি। তদ্দ্বারাই জানা যায় চিকিৎসোপযোগী সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই আয়ুর্ব্বেদে নিবেশিত আছে। ধন্বন্তরি প্রভৃতি অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত ঔরভ্র প্রভৃতি কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে আর্য্যগণ অস্ত্রচিকিৎসা ও শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের এতদ্বিষয়ক জ্ঞানের নিকট তাহা কোনমতেই হীন নহে।

সুশ্রুতমতে আর্য্যচিকিৎসকগণ শবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে শারীরস্থানের উপদেশ দিতেন। যাহারা শবচ্ছেদ না করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন তাঁহারা কৃতান্ত স্বরূপ। ডাক্তার ওয়াইজ তৎকৃত "Hindu System of Medicine" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে "আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরস্থান যথানিয়মে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অস্ত্রচিকিৎসকগণ যুদ্ধকালে, নৃপতিদিগের সঙ্গে রণক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং অস্ত্রবিদ্ধ সৈন্যদের অঙ্গে পটি বান্ধিয়া রক্তস্রাব নিবারণ, অস্ত্রাদি বাহির করণ প্রভৃতি চিকিৎসা করিতেন।—বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন চিকিৎসা বিদ্যা ও রসায়ণ বিদ্যা এই উভয় বিদ্যাতেই হিন্দুগণ অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল ও নানারূপ ঔষধি প্রস্তুত করিতে জানিত। ধাতুসেবন করিয়া পীড়া আরোগ্য করা তাহারাই প্রথমে আবিষ্কার করে। হিন্দুদিগের অতি পূর্ব্বকালেই ১২৭ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ছিল ও তাহারা নারীর গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিতেও পারিত। বসন্ত রোগ নিবারণার্থ টীকা দেওয়া ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে।"(১১) অতি পূর্ব্বকালেই তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার নিমিত্ত যে সমুদয় অস্ত্র ও যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এত উন্নতির পর সংখ্যাতে অধিক হইলেও একেবারে নুতন রকমের যন্ত্রাদি বড় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই।—আর্য্যগণ অতি পূর্ব্বকালেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে জানিতেন। এই বিদ্যাবলে তাঁহারা পারদকে এত নির্দ্দোষ করিয়া (রসসিন্দুর কজ্জলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া) প্রায় সমস্ত রোগেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন যে সেরূপ কোন দুষ্কর কৌশল আজ পর্য্যন্তও কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এদেশীয় চিকিৎসকগণ পারদ

---

১১ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস ৫৭ পৃষ্ঠা।

ব্যবহার করিলে কোনও ভয়ের কারণ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারদের ব্যবহৃত পারদে অনেক প্রকার বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। অতিপূর্ব্বকালেই হিন্দুগণ গন্ধকদ্রাবক প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রাবক প্রস্তুত করিতেন। তাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে নানা প্রকার ধাতু জারণ ও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন।

তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আধুনিক চিকিৎসা পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়ই যেরূপ বিস্তরিত রূপে বর্ণিত, এক্ষণকার প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে অনেক বিষয়েই সেরূপ বাহুল্য বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু টীকাকার প্রভৃতির মন্তব্য পাঠ করিলে সে ত্রুটীও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। আধুনিক আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থাদি অল্প বুদ্ধি চিকিৎসকদিগের নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণও অল্পের মধ্যে চিকিৎসক হইতে পারিয়া বহু বিস্তীর্ণ সংহিতা প্রভৃতির অধ্যয়ণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই জন্যই এক্ষণে প্রাচীন সংহিতা গ্রন্থগুলি প্রায় লোপ পাইবার মধ্যে গিয়াছে। প্রচলিত গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়াও আমরা বলিতে পারি, ভারতীয় আর্য্যগণ আয়ুর্ব্বেদরূপ যে সুপ্রকাণ্ড বৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক একটি শাখা হইতে এক একটী কলম লইয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এক একটী বৃক্ষ গড়াইয়াছেন মাত্র। অথবা আয়ুর্ব্বেদের এক একটী ফটোগ্রাফির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা এক একখানি বড় চিত্রপট চিত্রিত করিয়াছেন। শাখায় যে উপাদান, কলমে তদপেক্ষা অধিক কিছুই থাকে না। ফটোগ্রাফে যাহা থাকে তদবলম্বন করিয়া যে চিত্রপট আঁকা যায় তাহাতেও তাহাই থাকে। চিত্রপটের সমুদয় অবয়বই ফটোগ্রাফে পাওয়া যায়, তবে সূক্ষ্মদৃষ্টি না থাকিলে সকলে ফটোগ্রাফির সমুদয় অংশ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাঁহার ক্ষমতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে তিনি ফটোগ্রাফ দেখিয়াই একখানি বড় চিত্রপট আঁকিতে পারেন। যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি আয়ুর্ব্বেদের এক একখানি ফটোগ্রাফ অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে একটী কথাতে দশ রকম দৃষ্টান্ত দিয়া, একখানি শুভ্র বসনে শতটী ফুল আঁকিয়া বিস্তৃতরূপে চিত্রিত করিলে, অন্য উপাদান ব্যতীত, কেবল তদ্দ্বারাই এক একখানা প্রকাণ্ড চিত্রপট অঙ্কিত করিতে পারিবেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্পর্কে একেবারে নিরক্ষর নহেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে বিশদ ও বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিলে অনেক স্থলে আয়ুর্ব্বেদের একটী শ্লোক অবলম্বনেই শত পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি পুস্তক লেখা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণালী অনুসারেই নানা দৃষ্টান্ত ও নানা মত সংগ্রহ করিয়া বিস্তারিতরূপে লেখা কর্ত্তব্য। নচেৎ মুনিদিগের সেই সারকথা গুলি আর এক্ষণে দুই এক কথায় আধুনিক লোকদিগের মস্তিষ্কে ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

বাল্যবিবাহ।

মুখে যে যাহাই বলুন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের দেশে আজকাল ধর্ম্ম, সমাজ, ও রাজনীতি বিষয়ে যে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় আন্দোলনের বাহুল্যই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বহু লোককে কোন বিষয়ে আন্দোলন করিতে দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে তাহারা সেই বিসয়টি বেশ বুঝিয়াছে অথবা সম্যক রূপে বুঝিতে এবং অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে—অন্ততঃ সে বিষয়ে তাহাদের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের ইহা একটী ধ্রুব সত্য যে কোন বিষয়ে সাধারণের মন আকৃষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে উন্নতি কেবল সময়সাপেক্ষ—উপযুক্ত সময়ে হইবেই হইবে। প্রোটেষ্টাণ্ড ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন, ফরাশী বিপ্লবের পূর্ব্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি শত শত উদাহরণ দ্বারা এই ঐতিহাসিক সত্যটী প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে আজকাল যে ধর্ম্ম সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আন্দোলন হইতেছে ইহা অবশ্যই দেশের পক্ষে একটী কল্যাণকর চিহ্ন। নিম্নদর্শী লোকে এখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী ম্যাট্‌সিনী বালকের চীৎকার, সমাজিক আন্দোলনকে বাতুলের প্রলাপ, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনকে বুড় উপন্যাস লেখকের নুতন খেয়াল ইত্যাদি যাহাই বলুন না কেন এগুলি যে দেশের পক্ষে শুভ চিহ্ন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

শিশু দৌড়াইতে পারে না বলিয়া তাহার প্রথম হাঁটিবার চেষ্টাকে বিদ্রূপ করা, তাহার শত শত পদস্খলন দেখিয়া ব্যঙ্গ করা, যুক্তি সিদ্ধ নহে। হাঁটিতে না শিখিয়া কেহ দৌড়াইতে পারে নাই—পদস্খলিত না হইয়া কেহ হাঁটিতে শিখে নাই। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "Nine falls make a rider" নয়বার না পড়িলে কেহ ঘোঁড়-সোয়ার হইতে পারে না—এ কথাটী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু যে কোন আন্দোলনই করা যাউক না কেন উহাতে সম্পূর্ণ এক-দেশ-দর্শিতার ভাব থাকিলে তদ্বিষয়ে সম্যক উন্নতি অসম্ভব। কোন প্রশ্নের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দিকের তর্ক উত্থাপিত হইলেই তাহার দোষ গুণ সম্যকরূপে বুঝিয়া তদনুসারে কার্য্য করা যায়। আরও, কোন অনুষ্ঠানের প্রতিরোধ না থাকিলে তদ্বিষয়ে অনুষ্ঠান কর্ত্তাদেরও সম্পূর্ণ উৎসাহ আকৃষ্ট হয় না। এই জন্যই উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানগুলির কৃতকার্য্যতা কতক পরিমাণে রক্ষণশীল

সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের সুচারু কার্য্যকারিতার বিশেষ কারণ এই যে তথায় রক্ষণশীল (Conservative) সম্প্রদায় ও উন্নতিশীল (Liberal) সম্প্রদায় সর্ব্বদাই প্রায় সমপ্রভাব। ফ্রান্সের রক্ষণশীল সম্প্রদায় অতি হীন বীর্য্য; উন্নতিশীল সম্প্রদায় সর্ব্ব বিষয়ে চিরকালই একেশ্বর। তাহার বিষময় ফল হইতেই ফ্রান্সে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ গতিমাত্রেরই নিয়ামক regulator থাকা ভাল—না থাকিলে অনেক সময় নিজের গতিতে নিজেই হুচট খাইতে হয়। রোমের একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি বলিয়াছিলেন 'রোমের এখন দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল কারণ রোমের বীরত্বে বাধা জন্মায় এরূপ জাতি আর রহিল না'। তিনি বাস্তবিকই একজন পাকা রাজনীতিজ্ঞ।

আমার এতগুলি বৃথা কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে আমাদের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই প্রায় এইরূপ যে তাঁহাদের মতের ভিন্ন মত কেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মূর্খ, old class, fool ইত্যাদি ঠাওরাইয়া রাখেন। এমন কি, তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন না। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবহার 'সাম্প্রদায়িক গোড়ামি' মাত্র। কোন প্রশ্নের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে যাহাই বলুক উপযুক্ত তর্ক থাকিলে তাহাকে বিদ্রূপ না করিয়া তাহার কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা ও তাহার প্রত্যুত্তর থাকিলে তাহা দেওয়ার চেষ্টা করাই প্রকৃত নীতিজ্ঞের কার্য্য।

আমি সে দিন কোন এক সুহৃদ্‌সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সমিতির সভ্যগণ সকলেই শিক্ষিত। সমিতির উদ্দেশ্য দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার দূরীকরণ। দেশের কুরীতি ও কুসংস্কার বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবার অবিবাহ, মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি আসিয়া পড়ে, এবং এই গুলির উচ্ছেদই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতিতে ইহার প্রত্যেকগুলির অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইল। কিন্তু কেহই ইহার কোনটীর পক্ষে একটী কথাও বলিলেন না। তন্মধ্যে দুই একজন প্রচলিত দুই একটী রীতির স্বপক্ষে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু হাস্যাস্পদ হওয়ার ভয়ে তাহারাও নির্ব্বাক্ রহিলেন। বোধ হয় অধিকাংশ সমাজসংস্কারক সভাতেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে; নচেৎ মালবারির পত্রোত্তরে রাজেন্দ্রলাল বাবু যা দুই এক কথা বলিয়াছিলেন তজ্জন্য খবরের কাগজ ওয়ালারা তাঁহার উপর এরূপ খড়্গহস্ত হইবেন কেন?

অদ্য আমরা বাল্যবিবাহ প্রথার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি পাঠকগণ বাল্যবিবাহের কোন গুণ আছে ইহা শুনিয়াই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া এই খানেই পড়া বন্ধ করিবেন না। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে—'বাল্যবিবাহ' বলিলে আমরা দেশে

এখন সচরাচর যে বয়েসে বিবাহ হয় তাহাই বুঝি, অর্থাৎ মেয়েদের ১০ হইতে ১৪ ও ছেলেদের ১৬ হইতে ২২ বৎসরের মধ্যে বিবাহ।

বাল্যবিবাহের দোষ কীর্ত্তন কারীগণ বাল্য-বিবাহের প্রধানতঃ যে সমুদায় দোষ উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

তাঁহারা বলেন বাল্য-বিবাহ দ্বারা বালক দম্পতী সম্বন্ধে এই কয়েকটী অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

১। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নী বাছিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং অনেক সময় মনোমত পতি বা পত্নী না হওয়ায় রাসায়নিক অসম্মিলনের ন্যায় দম্পতীর মধ্যে কোন দিনই একতা জন্মিতে পারে না।

২। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে পতি বা পত্নীর কর্ত্তব্য বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পতি পত্নীর প্রতি এবং পত্নী পতির প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হয় না। তজ্জন্য পরিশেষে অনেক সময় পতি পত্নীমধ্যে অপ্রণয়ের কারণ হইয়া উঠে। ক্রমে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে এবং কালে দম্পতীর সুখ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

৩। বাল্য-কালে বিবাহ হইলে বালক পতি ও বালিকা পত্নী উভয়েরই শরীর সঙ্গে সঙ্গে মনও শীঘ্র রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি সম্যক বিকাশ পায় না; তাহাদের শরীর ও মনের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়; এবং তাহারা শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য-জীবন ত্যাগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করে।

৪। বাল্য বিবাহের দরুণ দম্পতী শীঘ্রই সংসারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। এবং বাল্যকাল হইতেই সংসারের সুখে দুঃখে লিপ্ত হওয়ায় তাহাদের জ্ঞানোপার্জ্জন-ও জীবনের কর্ত্তব্যাদি শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে।

উপরের লিখিত অনিষ্ঠগুলি স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্বন্ধেই ঘটিয়া—থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বামীর পক্ষে আরও দুইটী অনিষ্ঠ ঘটে:—

৫। বালক স্বামী আশৈশব এক গলগ্রহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে কখনই সম্যক উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না। ধনসঞ্চয় তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠে; কিন্তু আমাদের স্বীয় যত্নদ্বারা স্বীয় উন্নতি সাধন পক্ষে ধন-সঞ্চয় একটী প্রধান সহায়।

৬। অনেক বালক স্বামী অভিভাবকের মৃত্যুর পর সংসারে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ যোগাইতে অক্ষম হইয়া চিরকাল দুঃখে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় হয়ত আত্মহত্যাও করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যক্তি বাল্যকালে বিবাহিত না হইলে সম্ভবতঃ বিবাহ নামক উচ্চ অঙ্গের বাবুগিরিটীর প্রতি একবার লক্ষ্যও করিত না এবং কোন রকমে সুখে সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত।

স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর পক্ষেও—আর দুইটী প্রধান অনিষ্ট লক্ষিত হয়:—

৭। আশৈশব একজনের অধীন থাকিয়া তাহার মন যোগাইয়া কায করিতে করিতে স্ত্রীগণের মনের স্বাধীন ক্রিয়া একেবারে লোপ পায়। তাহারা একটী যন্ত্র বিশেষ হইয়া পড়ে। "যেমনি করাও তেমনি করে, যেমনি চালাও তেমনি চলে।"

৮। আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই সুতরাং বিবাহিতা শিশু-বালিকারা অনেক সময় বিধবা হইয়া—ইহ জীবনে সমস্ত সুখ হারায়। বালদম্পতীর সন্তান সন্ততি সম্বন্ধেও একটী ঘোরতর অনিষ্ট লক্ষিত হয়। এ অনিষ্টটীর গুরুত্ব অতি অধিক, কারণ ইহার উপর সম্পূর্ণ-রূপে জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।

৯। বালদম্পতীর সন্তানগণ সাধারণতঃ দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় ও ক্ষীণমনা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়। এই সন্তানগুলি অনেক সময়ই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বাঁচিয়া থাকিলেও অনেক সময় কেবল অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে থাকে। ফলতঃ কোন জাতি মধ্যে অধিক দিন বাল্য বিবাহের রীতি প্রচলিত থাকিলে সে জাতি শেষে শারীরিক ও মানসিক লিলিপট্ (Lilliput) ময় হইয়া উঠে।

১০। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এখন অযথা লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। বাল্য বিবাহে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়। তাহাতে আবার লোক গুলি সবল ও সুস্থকায় হয় না। সুতরাং খাইবার জন্য মুখ বাড়ে, কিন্তু কাজ করিবার জন্য হাত বাড়ে না। ইহাতে জাতীয় দরিদ্রতা ও দুর্দ্দশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এ গুলি ছাড়া বাল্যবিবাহের আরও কতকগুলি আনুষঙ্গিক দোষের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে গুলির গুরুত্ব অতি অল্প বলিয়া বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাল্য বিবাহ বিরোধীগণের এই সমুদায় তর্কের যুক্তি কত দূর তাহা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, উপরে লিখিত অনিষ্ট গুলি নিবারণের জন্য তাঁহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিতে বলেন তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অনিষ্ট গুলি নিবারিত হয় কি না, এবং সে গুলি নিবারিত হইলেও উহা দ্বারা নূতন কোন প্রকার অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি না। বাল্যবিবাহ বিরোধীগণ অনেকে বলেন রাজকীয় কোন আইন বা সামাজিক কোন বিধি দ্বারা যাহাতে বাল্যবিবাহ রহিত হয় তাহা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ কোন উপায় দ্বারা বাল্যবিবাহ নিবর্ত্তিত করিলে তাহাতে বাল্যবিবাহের অনিষ্ট নিবারিত হয় কি না এবং নূতন কোন অনিষ্ট আবির্ভাব হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার কারণ কি তাহা অগ্রে দেখাউচিত। অসভ্য সমাজে প্রায়ই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই। আমাদের অসভ্য পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যেও বোধ হয় বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না। আদিম আর্য্যদিগের মধ্যে যে বাল্য বিবাহের রীতি ছিল না তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তবে আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ কোথা

হইতে আসিল ? অববোধ প্রণালী সম্বন্ধে আমরা অনেকটা মুসলমানদের দৌরাত্ম্য, মুসলমানদের অনুকরণ, ইত্যাদির দোহাই দিয়া রেহাই পাইতে পারি, কিন্তু এ বিষয়ে সেই "দুরাচার ম্লেচ্ছ" দিগের স্কন্ধে অণুমাত্রও দোষ চাপাইবার উপায় নাই। বরং মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব্বে বাল্য-বিবাহের রীতি ছিল না—আমাদের দেখাদেখিই শেষ তাহারা কতকটা শিখিয়াছে। তবে এ কুপ্রথাটী কোথা হইতে আমাদের দেশে প্রবেশ করিল ? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে রাজকীয় আইন বল আর সামাজিক বিধিই বল আপনা আপনি দেশে কখনই প্রচলিত হয় না। দেশে কোন অভাব বর্ত্তমান থাকিলে তন্নিবারণার্থেই এগুলি সৃষ্ট হয়। দেশে ডাকাইত না থাকিলে ডাকাইতদিগকে শাস্তি দিবার আইন হইবে কেন ? গোমাংস ভক্ষণে ভয়ানক অনিষ্ট না দেখিলে তৎ বিরুদ্ধে সামাজিক কোন বিধি প্রচলিত হয় না। বস্তুতঃ সমাজ আপনিই আপনার রোগের চিকিৎসা করে। সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা হইল কি কোন অভাব হইল, তখন দুই একটী করিয়া লোকের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্রমে সমাজের অধিকাংশ লোকে যখন তজ্জন্য ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে—তখন সকলেই তন্নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন করে। যদি সমাজের অধিকাংশ লোকে একরূপই উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ক্রমে সে উপায়টী সামাজিক রীতি হইয়া দাঁড়ায়, ও সময়ে তৎসম্বন্ধে নিয়মাদিও বিধিবদ্ধ হয়। এইরূপেই সমুদায় সামাজিক রীতির ও সামাজিক বিধির সৃষ্টি। বাল্য বিবাহের অনেক অনিষ্ট দেখিতেছি বলিয়াই আজ আমরা ইহার বিরুদ্ধে এইরূপ চেঁচাচেচি করিতে বসিয়াছি। যখন বাল্য বিবাহ দ্বারা সমাজ উৎশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে তখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবেই যাইবে ; কোন শাস্ত্রীয় বিধিরই ক্ষমতা থাকিবে না যে বাল্য বিবাহ বজায় রাখে। উপরের যুক্তিটী যদি সত্য হয় তবে অবশ্য সমাজের কোন অভাব দূরীকরণার্থেই দেশে প্রথম বাল্য বিবাহের বিধি প্রচলিত হয়। বোধ হয় মনু-আদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। মনু মেয়েদের বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে বড় কড়াকড় নিয়ম করিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে অনেক বাল্য বিবাহ বিরোধীগণ মনুর বাক্যটী যে কেবল 'পুস্তকের কথা' প্রকৃত দেশের প্রচলিত রীতির কথা নহে ইহা প্রতিপন্ন কারবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি পুরাণ হইতে সেকালে অনেক বয়েসে যে সকল মেয়েদের বিবাহ হইয়াছিল তাহাদের এক তালিকা দেখাইয়া থাকেন। কুমারসম্ভব পাঠের কালে পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদিগকে "স্তনৌ তথা প্রবৃদ্ধৌ" ইত্যাদি শ্লোকটী মুখস্থ করিতে বলিয়া থাকেন কারণ পরীক্ষার প্রশ্ন থাকিতে পারে যে 'কালিদাসের সময় যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না তদীয় গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ দাও'। কিন্তু এইরূপ তর্কের দৌড় আমি তত‍টা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেকালে দুই

একটী মেয়ের যুবতী অবস্থায় বিবাহ হইত, অথবা সেরূপ বিবাহ হইলে কেহ দোষ মনে করিত না—ইহা দ্বারা তখন দেশে বাল্য বিবাহ দিবার রীতি ছিল না একথা কিপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল ? বরং পুরাণাদি পাঠে ইহাই জানা যায় যে আদৌ বাল্যাবস্থায় বিবাহের রীতি ছিল না, পরে দুই একটী বাল্য বিবাহ হইত কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যুবতী বিবাহ, আর পরে যুবতী বিবাহের সংখ্যা অল্প, বাল্য বিবাহই অধিক, এবং সর্ব্বশেষে হিন্দু রাজত্বের শেষকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বাল্য বিবাহ, যুবতী বিবাহ আদবে নাই, অথবা নিতান্ত দোষনীয়। এইরূপে দেখা যায় যে সমাজ ক্রমশই বাল্য বিবাহের দিকে অগ্রসর হইয়াছে ও এই রীতিটী প্রচলিত করিয়া লইয়াছে। বাল্যবিবাহের কোন না কোন প্রকার আবশ্যকতা থাকাতেই উক্ত রীতিটী এই প্রকারে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বোধ হয় আর্য্যগণ শীতপ্রধান দেশ হইতে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিবার পর তাহাদের বালক বালিকাগণের তরুণ বয়সেই বিবাহের আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হয়। সমাজও ক্রমে ক্রমে বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়া সামাজিক সামঞ্জস্য স্থির রাখিতে যত্নবান হয়। কাজে কাজেই এখন দেশে বাল্যবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যদি সমাজের স্বতঃচেষ্টা ব্যতীত কোন প্রকার আইন অথবা তদ্রূপ কোন বিধি দ্বারা কোন প্রকার হাতগড়া উপায়ে (artificial means) বাল্যবিবাহ প্রথা রহিত করা যায় তবে পূর্ব্বোক্ত অহিতাচরণ গুলি পুনর্ব্বার দেশে আবির্ভূত হইবে কি না তদ্বিষয়ে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলন-কারীগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। বাল্যবিবাহ জোর করিয়া উঠাইয়া দিলে দেশে গুপ্ত প্রণয়, আর্থিক সম্বন্ধ, পরিত্যক্ত সন্তানাদি এবং আরো অনেক প্রকার অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িবে কি না এটা কি বিশেষ ভাবনার কথা নহে।

আর একটী বিষয়ে বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনকারীগণের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। কোন একটী হাতগড়া উপায়ে বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিয়া সমাজের এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না। স্বাধীনতা কথাটা ব্যবহার করিয়া আমি বড় মুস্কিলে পড়িলাম। আজকাল অনেকেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা করেন—কিন্তু কথার অর্থটার প্রতি বড় দৃষ্টি রাখেন না। দেশের রাজা স্বজাতি হইলে দেশবাসী স্বাধীন ; বিজাতি হইলে তাহারা 'অধীন' এ বিশ্বাস অনেকেরই আছে এবং সেই জন্য হয়ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাল্য বিবাহের সঙ্গে স্বাধীনতা অধীনতার সম্পর্ক কি ? 'স্বাধীনতা, অধীনতায় ঠিক দুইটী ভিন্নার্থবোধক বিপরীত অবস্থাকে বুঝায় না। 'স্বাধীনতা' 'অধীনতার' ন্যূনাতিরেক আছে। কোন দেশ অল্প স্বাধীন কোন দেশ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীন, কোন দেশ আরও অধিক স্বাধীন ইত্যাদি। ইচ্ছা-

স্বরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে রাজকীয় বাধা যে দেশে যতকম সেই দেশ তত স্বাধীন। স্বজাতি রাজা হইয়াও দেশসুদ্ধ লোককে হাতে পায় বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, আর বিদেশীয় রাজাও অনেক বিষয়ে প্রজাকে স্বাধীনতা দিতে পারেন। এমত অবস্থায় প্রথম দেশকে স্বাধীন বলা ও দ্বিতীয় দেশ-কে অধীন বলা, কথা বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা মাত্র। সমাজের শৃঙ্খলা, শান্তি, ও উন্নতির জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে সর্ব্ব-বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া যায় না। কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। এই বাধা গুলিই দেশের 'আইন,' বিধি ইত্যাদি। সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা দ্বারা যে সমাজ (স্বীয় উন্নতি ও শান্তির পথ রোধ না করিয়াও) যত অধিক বিষয়ে সমা-জস্থ ব্যক্তিগণকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে দিতে পারে—সে সমাজ তত অধিক স্বা-ধীন। অর্থাৎ সে সমাজে ব্যক্তিগত স্বাধী-নতা Individual liberty যত অধিক সে সমাজ তত স্বাধীন। প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত রাজার জাতির কোন সম্পর্ক নাই। এই জন্যই নেপালিয়েরা স্বদেশী রাজার অধীনে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষা পরা-ধীন এবং ইটালীর রাজা ভিন্ন দেশীয় লোক হইলেও ইটালী স্বাধীন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যখন বলি নেপাল বা তুরস্ক স্বাধীন তখন বুঝিতে হইবে আমরা তথাকার রাজার কথা বলিতেছি, প্রজার কথা বলি-তেছি না। এখন বোধ হয় অনেকে বুঝিয়াছেন যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমষ্টি (অবশ্য সংখ্যা ও গুরুত্ব) উভয়ই বিবেচনা করিয়া সমাজের বা দেশের স্বাধীনতার পরিমাণ। এখন আমাদের দেশে সমাজস্থ ব্যক্তিগণের বাল্য-বিবাহ করা না করা এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। আইন দ্বারা বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু হরণ করা উচিত কি না তদবিষয়ে বিশেষ বি-বেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকায় সমাজের এতই অনিষ্ঠ হইতেছে যে এই স্বাধীনতাটুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই আব-শ্যক, কিন্তু বাস্তবিক কি বাল্যবিবাহ জনিত অনিষ্টের গুরুত্ব এতই অধিক? এমন অনেক বিষয় আছে যাহা বাল্য বিবাহের ন্যায় অনিষ্টকর কিন্তু কেহই সে সমুদায় বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন না। আমি একটী উদা-হরণ দিতেছি। কে না জানে আমাদের দেশের জমিদারগণ শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত বিমুখ। তন্নিবন্ধন তাহাদের শরীর ও মন নিতান্ত ব্যাধিগ্রস্থ থাকে; তাহাদের সন্তানসন্ততি ক্ষীণমনঃকায় হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের উচ্চতম অং-শের এই অহিতাচরণ দ্বারা সমাজের কতই অনিষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই অনিষ্ট নিবা-রণের জন্য এরূপ জমিদারগণ প্রত্যহ এত ঘণ্টা করিয়া সরকারী কারখানায় কাজ করি-বেন এরূপ আইন করা বোধ হয় কেহই যুক্তি সঙ্গত মনে করিবেন না। অবশ্য

আমি বাল্য-বিবাহ ও জমিদারদের শ্রমপরাঙ্মুখতা একই শ্রেণীতে স্থাপিত করিতে চাই না তবে এই মাত্র বুঝাইতে চাই যে বাল্যবিবাহের অনিষ্টের গুরুত্ব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আইন দ্বারা তদ্‌বিষয়ক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নহে। আজ কাল স্বাধীন বাণিজ্য, স্বাধীন মুদ্রা যন্ত্র, স্বাধীন শিক্ষা ইত্যাদি স্বাধীনতার দিন পড়িয়াছে এখন ব্যক্তিগত' এই স্বাধীনতা লোপ করিবার পূর্ব্বে মেয়েদের অধিক বয়েসে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে তাহা রহিত করিয়া স্বাধীন বিবাহ প্রবর্ত্তিত করার চেষ্টা করা উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে বয়সের কোন বাধা না থাকিলে যার ইচ্ছা সে নিজ সুবিধামত অল্প বা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে পারে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন অধিক বয়সে বিবাহিত হইবার বাধা রহিত করা ও বাল্যবিবাহের প্রথা রহিত করা একই কথা নহে।

এখন আমরা বাল্য-বিবাহ-বিরোধীগণের তর্কগুলির সমালোচনা করিব। এবং সেই সঙ্গে বাল্য-বিবাহ রহিত হইলে বর্ত্তমান কতকগুলি ইষ্টের যে ব্যাঘাত হইবে তাহাও দেখাইব অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের গুণগুলিও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১ম তর্ক। বাল্যবিবাহে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

আপাততঃ বোধ হয় বটে যে যুবক যুবতী মনোমত সহচর বাছিয়া লইতে পারে, বালক বালিকা তাহা পারে না; এবং তজ্জন্য যৌবনবিবাহ বাল্যবিবাহাপেক্ষা দম্পতীর পক্ষে অধিক সুখকর, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঘটে না। উপযুক্ত সহচর পসন্দ করিয়া লইবার ক্ষমতা যৌবন কালে জন্মায় না। মনুষ্যের বৃদ্ধ বয়সেই প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জ্ঞান জন্মে। যাহারা নিজে ভোগিয়াছে এবং অপরকে ভোগিতে দেখিয়াছে তাহারই কেবল বলিতে পারে যে কোন রূপ বিবাহের চরম ফল কি দাঁড়ান সম্ভব। যুবক প্রথম সংসারে প্রবেশ কালে সংসারের সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ। এবং কিরূপ সহচরী গ্রহণ করিলে চিরকাল সুখে কাটাইতে পারিবে সে বিষয়েও তাহার জ্ঞান অন্যান্য সাংসারিক জ্ঞানের ন্যায় স্বল্প। অনেক সময় অভিরঞ্জিত নাটক নভেল হইতে যুবক এ সম্বন্ধে জ্ঞান অথবা অজ্ঞানতা লাভ করে। যদিবা এ বিষয়ে কিছু মাত্র জ্ঞান জন্মে তাহা হইলেও স্বাভাবিক প্রেমেচ্ছা প্রথম উন্মুক্ত হইবার কালে তাহার বেগে তাহাদিগকে এরূপ অভিভূত করিয়াফেলে যে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়। যুবক এবং যুবতী সাধারণতঃ প্রথম যে সুন্দর বা সুন্দরীকে দর্শন করে তাহাকেই মন প্রাণ সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় পিতা মাতা সন্তানের স্বেচ্ছানুরূপ বিবাহ বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব্বকথিত অনুপযুক্ততার জন্য দম্পতী শীঘ্রই কষ্ট ভোগ করেন। আর পিতা মাতা বিবাহ বন্ধ করিতে পারিলেও সন্তান অতৃপ্তপ্রেমের জ্বালায় চিরকাল জ্বলিয়া মরেন। যৌবনবিবাহে যে প্রায়ই এইরূপ প্রথমে পিতা

মাতা আত্মীয়ের সহিত বিচ্ছেদ, পরে দম্পতীর নিজের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের চম্পট বিবাহের (Elopement Marriage) প্রাবল্য, প্রত্যাখ্যান, ব্যভিচার, ইত্যাদির মকর্দ্দমার আধিক্য দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ যুবক যুবতীর মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গঠিত হওয়ায় বিবাহের পর পূর্ব্বের গঠন ভাঙ্গিয়া উভয়ের মানসিক গঠনের একতা সম্পাদিত হওয়া প্রায়ই দুষ্কর। এবং তজ্জন্যই বিবাহের কিছুকাল পরে অর্থাৎ রূপতৃষ্ণা ও যৌবনমদ কথঞ্চিৎ শমিত হইলে অনেক স্থলে স্ত্রী পুরুষে অনৈক্য হইয়া উঠে। ক্রমে এই অনৈক্য ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়।

কিন্তু বাল্যবিবাহে বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে একপ্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে থাকে। তজ্জন্য যৌবনে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। উভয়ের মধ্যে একজনের কোন দোষ থাকিলে, অন্যজনে ছেলে বেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না। লোকে বলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সংতানকেও সুন্দর দেখায়, বাস্তবিকই সে কথা সত্য এবং সেই জন্যই বাল্য বিবাহের দম্পতীর আত্ম কলহ, যৌবনে বিবাহিত দম্পতীর আত্মকলহের ন্যায় বিষময় হয় না।

এদিকে বাল্য-বিবাহ প্রবীন পরিপক্ক-বুদ্ধি পিতা মাতা কর্ত্তৃক সংঘটিত হওয়াতে প্রায়ই দম্পতীর মধ্যে কোন প্রকার অনুপযুক্ততা থাকে না এবং তজ্জন্য যৌবনে দম্পতি মধ্যে কলহ হইবার বিশেষ কোন কারণও বর্ত্তমান থাকে না।

স্থূল কথা দম্পতীর সুখ ধরিতে গেলে বাল্য-বিবাহ যৌবনবিবাহ-পেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের জন্য বাল্য বিবাহের আরও একটী গুণ দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশে একান্নভুক্ত পরিবারের প্রথা প্রচলিত। এ প্রথা শীঘ্র যে উঠিয়া যাইবে এরূপ বোধ হয় না কারণ অনেকে এখনও ইহার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রী আসিয়াই কখনও স্বামীর পিতা মাতা ভাই বন্ধুকে স্বীয় পিতা মাতা ইত্যাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া উঠিতে পারে না। তাহার আচরণে তাহার মনের ভাব অবশ্যই কিছু না কিছু প্রকাশ হয়। সুতরাং স্বামীর আত্মীয়বর্গ নূতন বধূর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া যান। স্ত্রীও সেই কারণে স্বামীর আত্মীয়বর্গের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপে পরিবার মধ্যে ভয়ানক আত্মকলহের সূত্রপাত হয়। বাল্য-বিবাহিত স্ত্রী শ্বশুরালয়ে আসিলে সে ছেলে মানুষ বলিয়া স্বামীর আত্মীয়গণ তাহার কোন প্রকার আচরণেই প্রায় অসন্তুষ্ট হন না অন্ততঃ অনেকটা মাপ করিয়া লন। এবং তাহার প্রতি যত্ন ও ভালবাসা দেখাইতেও ক্রটী করেন না। সেও তাঁহাদিগকে পিতা মাতা ভ্রাতা ইত্যাদির স্থানীয় করিয়া লয়। এইরূপে পরস্পর

মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও প্রণয় স্থাপিত হয়। বাস্তবিক যৌবনবিবাহ ও একান্নভুক্ত পরিবার কখনই এক সমাজে একত্র প্রচলিত থাকিতে পারে না।

২য় তর্ক। বাল্যবিবাহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে অসম্মিলনের কারণ হইয়া উঠে—ইত্যাদি—

এই তর্ক প্রথম তর্কের একটী শাখা মাত্র। এবং তাহার যে উত্তর দেওয়া গিয়াছে এ সম্বন্ধেও প্রায় সেই উত্তর দিলেই চলে। ছেলেবেলা হইতে একত্র থাকায় স্বামী স্ত্রীর চরিত্র এবং স্ত্রী স্বামীর চরিত্র শিক্ষা করিতে বেশ সময় পায়। সুতরাং যৌবন কালে তাহারা পরস্পরের মন যোগাইয়া কাজ বেশ করি[illegible] ক্ষম হয়। এ বিষয়েও বাল্য-বিবাহ যৌবন বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩য় তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

অনেক সময় বাল্য-বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন দুষ্ট হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে দোষটা বাল্য-বিবাহের না বালদম্পতীর অভিভাবকগণের তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

শাস্ত্র সম্মত বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলে সম্ভবতঃ 'নৈমিত্তিক' বাল্য-বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। কিম্বা আরো নানা রূপ মন্দ ফল জন্মাইবে এবং তজ্জন্য বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকা অবস্থায় বালক বালিকার মন ও শরীর রুগ্ন হওয়ার যেরূপ কথা ছিল তখনও প্রায় সেইরূপ হইতে থাকিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বোর্ডিং স্কুল ও কালেজের ছেলেদের যেরূপ চরিত্রের কথা শুনিতে পাই তাহা হইতে আমাদের দেশের বাল্যকালে বিবাহিত ছেলেদের স্বভাব সহস্রগুণে ভাল। যদি বল অভিভাবকগণ যত্ন লইলেই এ সকল নিবারিত হইতে পারে, আমি বলি অভিভাবকগণ যত্ন লইলে বাল্য-বিবাহেও কোন হানি হইতে পারে না?

৪র্থ তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতী উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশের বিবাহিত ছাত্রেরা—কি ইংলণ্ডের অবিবাহিত ছাত্রদের অপেক্ষা শিক্ষা বিষয়ে কম পটুতা ও যত্ন দেখাইয়া থাকে? বরং দেখা যায় অনেক ছেলে যাহারা নিজে পাঠব্যয় কুলাইতে অনক্ষম তাহারা শ্বশুরের সাহায্যে মানুষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এরূপ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে ছেলেটা বিবাহে মাটি হইয়া যায়। 'বৌ' ধরেই 'বই' ছাড়ে। "এদিকে মা লক্ষ্মীও ঘরে এলেন ওদিকে মা সরস্বতীও বিদায় হইলেন"। অন্য পক্ষে বৌএর মুখ ছোট হইবে, বৌকে গঞ্জনা দিবে এইরূপ ভয়ে ছেলেরা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া বেশ উন্নতি দেখাইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক নহে? বাঙ্গালার ছাত্র জীবন যদি কেহ বিশেষ করিয়া [illegible]চনা করিয়া থাকেন তিনি

অবশ্য আমার সহিত একমত হইবেন। আর প্রকৃত পক্ষে বিবাহ করিয়া ছেলে মাটি হওয়া অনেকটা অভিভাবকগণের গুণে ঘটিয়া থাকে।

বালিকাগণের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় অনেক সময় তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত কারণ স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনাস্থা, বাল্য বিবাহ নহে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ তর্ক। বাল্য-বিবাহে ধন-সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বাল্যকালে বিবাহিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি।

এ অনিষ্টগুলিও কতক পরিমাণে অভিভাবকগণের ত্রুটীতে ঘটিয়া থাকে। যে অভিভাবক পুত্রকে এরূপ বিত্ত দিতে না পারেন যে তদ্দ্বারা সে সম্মানে পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে, সে অভিভাবকের পক্ষে পুত্রকে বাল্য বিবাহ দেওয়া অপরিণামদর্শীর কার্য্য। কিন্তু অজ্ঞ লোকে নির্ব্বুদ্ধিতায় যে অনিষ্ট ঘটায় তাহা নিবারণ জন্য একেবারে বাল্যবিবাহ রহিত করিয়া ধনী ও বিবেচক পিতা হইতে পুত্রের বিবাহের এই স্বাধীনতা হরণ করা কি যুক্তি-সঙ্গত ?

আবার এইরূপ ঘটনাই অধিক সময় দেখা যায় যে অবিবাহিত পুরুষ নিতান্ত অমিতব্যয়ী, ধন সঞ্চয় করিতে আদবেই সক্ষম নহে। বিবাহ করিয়াই যেন তাহাদের মতি ফেরে, সর্ব্ব বিষয়ে বেশ মনোযোগী হয়, ও ধনসঞ্চয়ে যত্নবান [illegible] রোজ-দিগের অবিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত পুরুষদের চরিত্র যাহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এবিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। যত দিন বিবাহ না করিবে তত দিন যেন ইংরাজ পুরুষের কেন্দ্র স্থির হয় না। মতিগতি নিতান্ত যেন ছড়ান থাকে। বাল্য-বিবাহিত স্বামীকে প্রায়ই এরূপ দোষে দোষী দেখা যায় না। সুতরাং অনেক সময় ধনসঞ্চয়ের পক্ষে বাল্য-বিবাহ প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়া থাকে।

৭ম তর্ক। বাল্যবিবাহে স্ত্রীদিগের মনের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। আমাদের সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এটা মঙ্গল কি অমঙ্গল ঠিক বলা যায় না। সমাজে রীতিমত এরূপ কোন উপায় নাই যাহা দ্বারা স্ত্রীলো[illegible] এখন স্বাধীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে। তাহাদিগকে কাহার না কাহার গলগ্রহ হইতে হইবেই হইবে। এরূপঅবস্থায় স্বামীর (অথবা অভিভাবকের) সহিত সর্ব্ব বিষয়ে এক মত থাকাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়। স্ত্রীলোকের মনের স্বাধীন ভাব আছে এরূপ কথা শুনিতে বড় মধুর বটে কিন্তু সমাজের বর্ত্তমানাবস্থায় বড় শুভ নহে। যখন Fox এবং Burke এর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি [illegible] বিদেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভিন্ন ম[illegible] [illegible]ওয়ায় চিরকালের বন্ধুত্ব ভুলিয়া ফেলেন [illegible]খন অতি নিকট সম্বন্ধ ঘরাও কথায় আমাদের 'বাবু' ও 'ঠাকুর' পুনঃ পুনঃ ভিন্ন মত হইলে যে তাহাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হইবে ইহা বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ [illegible] স্ত্রী মতি গতি

মন প্রাণ স্বামীতে অর্পণ করিয়াছে (কথা গুলা একটু তলাইয়া বুঝিবেন—অর্থাৎ যে স্ত্রী সর্ব্ব বিষয়ে স্বামীর অধীন হইতে ও নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ করিতে শিখিয়াছে) সেই স্ত্রীই আমাদের আদর্শ সতী। সেই আমাদের 'গৃহ লক্ষ্মী'। দ্রৌপদীর কতকটা স্বাধীন মত ছিল—সেই জন্যই 'অহল্যা দ্রৌপদী' ইত্যাদি শ্লোক থাকিলেও আমরা তাঁহাকে সতীত্বের জন্য বড় মন খুলিয়া ভক্তি করিতে প্রস্তুত নহি। আর সীতার কি না স্বাধীনতা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার নাম শুনিবা মাত্রই আমাদের অন্তরাত্মা যেন গলিয়া আইসে।

৮ম তর্কে উত্থাপিত অনিষ্ট নিবারণার্থ বাল্যবিবাহ রহিত করার ফল কিছু মাত্র নাই। বরং তজ্জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা কর।

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রসূত সন্তান ও ক্ষীণকায় হয় ইত্যাদি।

আমাদের দেশের পশু পক্ষী গুলির সন্তান, বৃক্ষ লতাদির ফলও অতি অল্পবয়সে হইতে দেখা যায়। এবং সে গুলিও প্রায়ই কৃশকায় ও অপূর্ণ। কেনা দেখিয়াছে তিন বছরের নারিকেলের গাছে বেশ গুটী ধরে, কিন্তু ফলে পরিণত না হইতে হইতেই শুকাইয়া যায়। এরূপ হওয়ার কারণ কি? আমাদের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদির মধ্যেও কি বাল্যবিবাহ প্রবেশ করিয়াছে? বস্তুতঃ আমাদের দেশে অল্প বয়সে সন্তান হওয়া ও সন্তান ক্ষীণকায় হওয়ার বাল্য বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য কারণও থাকা সম্ভব।* আর বাল্যবিবাহের এ সম্বন্ধে কোন দোষ থাকিলেও দোষের গুরুত্ব এত অধিক নহে যে তজ্জন্য বাল্যবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত।†

আমাদের দেশের লোককে সবল ও পূর্ণকায় করিতে ইচ্ছা হইলে বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা কর। যাহাতে অন্তর্জাতিক বিবাহ (inter marriage) প্রচলিত হয় তজ্জন্য যত্নবান হও। আর বিবাহের ক্ষেত্রের আয়তন বর্দ্ধিত হইলে এখন অনেক সময় দায়ে ঠেকিয়া যে সমুদায় নিন্দনীয় বাল্য বিবাহ ঘটিয়া থাকে তাহার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। বাল্য বিবাহ রহিত করিয়া বিবাহের সম্বন্ধে নূতন একটী অধীনতা সৃষ্টি করা অপেক্ষা বিবাহের স্বাধীনতা আর একটু বর্দ্ধিত [illegible]তে চেষ্টা কর। অধীনতা শৃঙ্খল পরা অ[illegible]া স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হও। তাহা হইলেই লোকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিজের [illegible]ুঁজিয়া লইতে যত্নবান হইবে এবং ক্ষেত্র [illegible] থাকায় অনেক পরিমাণে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইবে।

১০ম তর্ক। বাল্যবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

---

* সম্ভব থাকিলেও বাল্যবিবাহ না হইলে বাল্যকালে সন্তান জন্মিবার আর আশঙ্কা থাকে না।

† ইহা হইতে বাল্যবিবাহের দোষের আর কি অধিক গুরুত্ব হইতে পারে বুঝিতে পারি না। ভাং সং

এ তর্কটী বস্তুতঃ বড় ঠিক নহে। এ বিষয়ে স্বভাব একটী সুন্দর উপায় দ্বারা নিজের প্রভাব বজায় রাখেন। দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান, যে স্ত্রীর দীর্ঘ বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় তাহার কোন দুই সন্তানের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষা দীর্ঘ। আবার যে স্ত্রীর অধিক বয়সে সন্তান হয় সে যত বয়স পর্য্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম, যে স্ত্রীর অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হয় সে তত বয়স পর্য্যন্ত সন্তানোৎপাদনে সক্ষম নহে। এইরূপে বাল্যবিবাহিতা স্ত্রী ও যৌবনে বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান সংখ্যা প্রায় গড়ে সমান। এই জন্যই আমাদের দেশের মহিলাগণের প্রসূত সন্তানে‍র সংখ্যা গড়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশীয় মহি গণের প্রসূত সন্তানের সংখ্য অপেক্ষা আধক নহে. আমাদের দেশে ; অল্প বয়স্ক সন্তানের মৃত্যু সংখ্যা f নধিক দৃষ্ট হয়। তাহাতেও লো‍ সংখ্যার বৃদ্ধি সংযত হয়। অনেকে বলেন এরূপ মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বাল্য বিবাহ। তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল-স্ত্রীর অল্প বয়সে প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান হইতে যুবতী স্ত্রীর প্রসূত সন্তানদ্বয়ের বয়সের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর হওয়ায় উভয়ের সন্তানই প্রায় একরূপ সবল ও সুস্থকায় দৃষ্ট হয়। এজন্য বোধ হয় আমাদের দেশে শৈশব মৃত্যুর আধিক্যের বাল্য-বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য কারণ আছে। যাহা হউক এ বিষয়ে বাল্য বিবাহের কোন বিশেষ দোষ থাকিলেও যাহাতে অল্পবয়সে সন্তান না হয় তদ্রূপ চেষ্টা করিলেই সে দোষ নিরাকৃত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেই প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকার দুইখণ্ডে প্রকাশ করিলে বিষয়টী সম্যক্‌রূপে আলোচনা হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য সমুদায় বিষয়ই আমাকে সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে আইন দ্বারা বাল্য-বিবাহ রহিত করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট না করিয়া যাহাতে যৌবন বয়সে রমণীগণের বিবাহে কোন সামাজিক দোষ না থাকে, ও যাহাতে অসমবর্ণ ও অসমজাতি বিবাহ দেশে প্রচলিত হইতে পারে তৎ- f । যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর বাল্য- 'হের দোষগুলি যাহাতে সাধারণে বেশ বুঝিতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে অবস্থানুসারে যে যেরূপ সুবিধা বিবেচনা করিবে সে তদনুসারে বিবাহ করিতে সক্ষম হইবে। অনেকে হয়ত বাল্য-বিবাহের দোষটুকু ত্যাগ করিয়া তাহার গুণটুকু গ্রহণ করিয়াও বাল্য বিবাহ করিতে সক্ষম হইতে পারে।

ইদানীং আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের দেখাদেখি এক সম্প্রদায় লোক আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাহাদের সংখ্যাও বিরল নহে তাঁহারা স্বাধীন বিবাহেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা স্বাধীন প্রণয় Free love প্রচলিত

করিতে যত্নবান। তাঁহারা বলেন সভ্য সমাজে স্বাধীন প্রণয়ই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বলিতে গেলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া যৌবন বিবাহ প্রচলিত করাই শ্রেয়। কারণ একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যৌবন বিবাহ প্রচলিত হইলে স্বাধীন প্রণয় শীঘ্রই প্রচলিত হওয়ার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীরসিকলাল সেন।

সমস্যা।

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাজের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই—মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ জুটিয়াছে।

সমাজ যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না, যখন ডান পা একটি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁ পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব। কিম্বা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই—তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ নামক যে মাকড়সার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে আমাদের আসমানগামী মতের ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা-আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠে না—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল সে কাজে আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ

ভাল কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে বাল্য-বিবাহ উচিত কেহ বলিতেছে অনুচিত, কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল কেহ বলে অমঙ্গল, আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা যায় না—কোথাও বা ভাল কোথাও বা মন্দ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীনকালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার সাম্য ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্খা, রুচি, ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজ-সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উঁচু-নীচু অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে জলের মত একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয়ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্ব্বল ছিল, কর্ম্মঠ ছিল কি অলস ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে। সেই জন্য বাঁ কাণ এক শোনে ডান কাণ আর শোনে, তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড় আঙুল নড়িয়া উঠিল, এক করিতে আর হয়।

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ বাপে বেটায় এক প্রকার জাতি ভেদ হইয়াছে! যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ নাই,সেখানে কোন কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদরাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দু-সমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বল পূর্ব্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে একদিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই হইতেছে। বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজিশিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন বাল্য-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গল জনক—ইহাতে সন্তান দুর্ব্বল হয়, অল্প বয়সে বহু-

পরিবারের ভারে সংসার সাগরের অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযম পূর্ব্বক নিজের ও দেশের দূর মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহ কর্ম্মের নানাবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছেন। আপিষের অন্নের ন্যায় প্রত্যূষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান' হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে—চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ,বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতিমত 'ক'নে' আকারে তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জুটিবে না—তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিক বয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মতও হইবেন না। অথচ বহু দিন অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে বলিবেন স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সে কি আর শিক্ষা? গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া, এমন কি এণ্ট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে? শত শত বৎসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কাজ নহে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বাল্য বিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করা যায়?

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি অথচ বাল্য বিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অধিক বয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্র গঠনের পূর্ব্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্ব্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গেল তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইংরাজি শিক্ষাসত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা

শের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামী'

জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকের চরম-গতি, পরম-মুক্তির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দুষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ব। এককালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ একাকার হইয়া আসিতেছে। এখন বড় ভাইকে ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা, এমন কি, পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই অথবা দ্রুতবেগে করিতেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই অভাব কি মন হইতে শিথিল হইয়া আগেকার বউরা শাশুড়িকে করিত এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করে? শাশুড়ির প্রতি যে কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায় পূর্ব্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন এখনও তাঁহারা সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্ব্বক সেই বাহ্য অনুষ্ঠান অলবম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া দারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা-বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমত বিসর্জ্জনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠা-স্থল। এখন সাম্যনীতি সমাজে বন্যার মত আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্য্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে মতভেদও তত বাড়িতেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবন যাত্রার প্রণালীও মতে মিলে না, তবে আর বেশী দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ান শুনান রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজ কাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যেদিকে যাইতেছে তাহারই উপযোগী পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়?

কিন্তু যতদিন একান্নবর্ত্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে, যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা তোমার মমতা ও সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোন ক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারে সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সন্তানেরা মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথার সত্যমিথ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী কোন্টা নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্য্যের তৃষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয়, তবে, বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখাইতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।" এই জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজন বিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রী পুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক-একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে। এই জন্য আজ কাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেলগাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর

এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায় তাহা হইলে সমাজ নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধপথা সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান, নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহলও জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার এক্জিবিশনে যত পুরনারী সমাগম হইয়াছিল, বিশবৎসর পূর্ব্বে ইহার শিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবলপ্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভান করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবেই—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ্য রক্ষা কর আর না কর সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের ভদ্র বেশ পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি বহু যত্নে সম্বরণীয় সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয় অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভন ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান' অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচক্কা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজননিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত

ভদ্র বঙ্গ-সমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

এক দল লোক আছেন তাঁহারা আধা-আধি রকম সমাজ সংস্কার করিতে চান। ভারতীর পঞ্চম খণ্ডে "একচোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কার কার্য্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধে লিখিত একটি উদাহরণের পুনরুল্লেখ করা যাক। অনেকে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, অথবা সমাজশাসন লঙ্ঘন করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে অপারক, কিন্তু বৈধব্য ব্রতাচরণে যে সকল কঠোর নিয়ম আছে সে সকল তাঁহারা দূর করিতে চান। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় এবিষয়ে তাহাদের সংশয় নাই কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। তাঁহারা নিজের পরিবারেও হয়ত এই মত কিয়দংশে প্রচলিত করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। যদি বিধবাদিগকে বিধবা রাখাই শ্রেয় জ্ঞান কর তবে তাহার কঠোর উপায়গুলিও অবলম্বন কর। বিধবাদিগকে অকারণে পীড়ন করিয়া কেবল মাত্র দানব সুখ লাভ করিবার জন্য সমাজ নিষ্ঠুর খেয়াল অনুসারে এই সকল কঠোর নিয়মের সৃষ্টি করে নাই। বৈধব্য-ব্রত রক্ষার পক্ষে উপযোগী বলিয়াই অগত্যা এই সকল কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়াছে। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ছাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজনিয়মের সহিত রফা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানাদিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামির কার্য্য। যদি কোন সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা নির্ব্বিচারে বাল্যবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধপ্রথা ভাঙ্গিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্ম্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবার বিশেষে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না। পরিবার বিশেষে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে কিন্তু সকল পরিবারে নাই। স্ত্রীবিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বলপূর্ব্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউন না কেন তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইন পূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থা নির্ব্বিচারে বিবাহার্থিনী

বিধবা মাত্রেরই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্যজনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। অতএব এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ারতমি গোঁড়ামি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ সংস্কারের প্রতি মন দাও। বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে ভুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গু-দেহ জড়াইয়োনা।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বের প্রশ্নে ফিরিয়া আসি—সমাজে সামাজিক শাসনেরই বা কোন কোন বিষয়ে আর ব্যক্তিগত স্বাধীনতারই বা কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য থাকা উচিত?

কেহ যদি রাস্তার মধ্যে কোন একজন মাননীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অপমান করিয়া কথা বলে অথবা কোন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রহার করে, তাহা হইলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকে তাহাকে কি বলিবে? সে সকল লোকের যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে তবে তাহারা উক্ত ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করিবে অথবা অন্য প্রকারে দণ্ড দিবে। কোন প্রধান কর্ম্মচারী যদি তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি গর্ব্বিত ব্যবহার করেন কিম্বা অনুচিত কর্কশতা দেখান তবে সমাজের লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? তাঁহার নিন্দা করিবে, তাঁহাকে মর্য্যাদানুযায়ী আদর করিবে না। কোন ব্যক্তি যদি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে লোকে তাহাকে কি করিবে? তাহাকে বিশ্বাস করিবে না তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবে। কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীলোকের প্রতি যথোচিত সম্মান না দেখায় কিম্বা কোন স্ত্রীলোক যদি তাহার স্বাভাবিক মর্য্যাদা রাখিয়া না চলে তবে সমাজে সে ব্যক্তিকে বা সে স্ত্রীলোককে কি করিবে? সভ্য সমাজে সুশিক্ষিত সমাজে সে ব্যক্তি কিম্বা সে স্ত্রীলোক নিন্দার পাত্র হইবে। এই সকল উদাহরণ হইতে একটী এই সাধারণ নিয়ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যেরূপ কার্য্যে সমাজের অমঙ্গল হইতে পারে আর যেরূপ কার্য্যে সমাজের আপাতত অমঙ্গল না হইলেও সমাজে সুনীতির শাসন শিথিল হইতে পারে ও তন্নিমিত্ত ভবিষ্যতে অমঙ্গল সম্ভাবনা, সামাজিক শাসন দ্বারাই সেরূপ কার্য্যের দণ্ড বিধান হয়। আমরা যদি সকল পক্ষ বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলেও সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে উক্ত নিয়ম ভিন্ন আর কোন নিয়ম যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। যে কার্য্যদ্বারা সমাজের অমঙ্গল হইতে পারে অথবা সমাজের মধ্যে

সুনীতির বন্ধন শিথিল হইতে পারে, আইন দ্বারা সে কার্য্যের নিরাকরণ করা কঠিন হইলে কিম্বা পরামর্শ যোগ্য না হইলে সামাজিক শাসন দ্বারা তাহার নিরাকরণ হওয়া আবশ্যক। এইত দেখিলাম সামাজিক শাসনের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম, এখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন নিয়ম আছে কি না? আমি যদি রাত্রে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া দিনমানের অধিকাংশ সময় নিদ্রা যাই তবে লোকে আমায় কি বলিবে? লোকে যদি আমায় সচ্চরিত্র বলিয়া জানে, তবে আমাকে বিশেষ কিছুই বলিবে না। আমি দেখি যে অন্য লোকের মস্তকের কেশ দীর্ঘ হইলে তাহার কতক অংশ কাটিয়া ফেলে, কিন্তু আমি যদি তাহা না করি আমি দীর্ঘ কেশ ধারণ করি, লোকে তাহা হইলে কি আমার নিন্দা করিবে? বোধ হয় না, আমাকে একটু অসাধারণ বলিয়া মনে করিবে মাত্র। আমি যদি আমার ভৃত্যকে আমার অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিতে দিই, আমি যদি আমার পালিত কুকুরকে উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, উৎকৃষ্ট বসন, উৎকৃষ্ট শয্যা দিই সমাজ কি তাহা হইলে আমায় সেরূপ কার্য্যে বাধা দিবে? কখনই না। তুমি যদি তোমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর আর অপর অর্দ্ধ দ্বারা সাধারণের কোন উপকার কর, সাধারণের ব্যবহারে আসিতে পারে এমন একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেও, সমাজে তাহা হইলে তুমি প্রশংসার পাত্র হইবে না নিন্দার পাত্র হইবে? অবশ্য প্রশংসার পাত্র। এই সকল উদাহরণ হইতে আমরা এই নিয়ম বাহির করিতে পারি;—যেরূপ কার্য্যের ফলাফল * কেবল তাহার কর্ত্তারই ভোগ করিতে হইবে যেরূপ কার্য্যে সমাজের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, সে রূপ কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা উচিত। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রয়োগ সম্বন্ধেও এই নিয়মে আসিয়া উপস্থিত হই। সামাজিক শাসনের উদ্দেশ্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ সাধন করা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির স্বকীয় সুখ সাধন করা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যদি সুখ সাধন হয় তবে তাহা হইলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সে সুখের কিছু অংশ পাওয়ার সম্ভাবনা—আবার সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি অন্যের ক্ষতি না করিয়া স্বস্ব সুখ অন্বেষণ করে, তবে সমাজস্থ সমুদয় ব্যক্তির সুখী হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যখনি সমাজ এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে আসে—যখনি এই অনধিকার চর্চ্চায় প্রবেশ করে—তখনি আপনার অমঙ্গল কুড়াইয়া আনে, তবে, সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে যখন অতি গূঢ় নিকট সম্বন্ধ, রহিয়াছে তখন সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যে বিরোধ

---

* এস্থলে 'কেবল' কথাটী স্থূলঅর্থে বুঝিতে হইবে। সূক্ষ্ম বিবেচনায় মনুষ্য এমন কোন কার্য্য করিতে পারে না যাহার তরঙ্গ সমাজের অন্য কোন ব্যক্তিকে যাইয়া লাগিবে না।

ভাব উপস্থিত হইলে মঙ্গল সম্ভাবনা নাই, অতএব এই দুয়ের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্য রাখিয়া আমাদের চলা আবশ্যক আর সে নিমিত্ত যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আধিপত্য কিছু সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে তাহাও ভাল। যেমন যদি এরূপ দেখা যায় যে সমাজের কোন একটী বিশেষ শুভ উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ কেশ ধারণ করা আবশ্যক তাহা হইলে যাহাদিগের দীর্ঘ কেশ ধারণ করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহাদিগেরও সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত সে অনিচ্ছা দমন করা উচিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সামাজিক শাসন ন্যায়পথে চলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া চলিবে। গৃহস্বামী যতক্ষণ তাঁহার মর্য্যাদা রাখিয়া চলেন ততক্ষণ গৃহস্থিত পরিজন বর্গ তাঁহার সম্মান করে, রাজা যতক্ষণ প্রজার হিতকামনায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, প্রজারা ততক্ষণ তাঁহাকে ভক্তি করে, সূর্য্য যতক্ষণ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে ততক্ষণই পৃথিবী তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিবে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্তপথে ধাবমান হইবে। সেইরূপ যতক্ষণ সামাজিকশাসন তাহার ন্যায্য পথে চলিবে, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খায় কার্য্য করিবে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার সহিত মিত্রতা রাখিবে—আর যে দণ্ডে যেক্ষণে সামাজিক শাসন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিবে সে দণ্ডে সেক্ষণে উহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ সম্প্রদায় তাহার স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে সামাজিক শাসনের সাহায্যে সমাজে কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করে, তখন সমাজস্থ প্রত্যেক মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যই সে নিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।

অন্যায় সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন—যখন কোন স্বার্থপর ব্যক্তি কিম্বা সম্প্রদায় সামাজিক শাসনকে কুপথে চালায় তখনই যে কেবল সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হয়, এমত নহে। অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায় যে সমাজের পূর্ব্বের কোন অবস্থায় কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন সে নিয়মগুলি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই ছিল—এখন অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন সে সব নিয়মে সমাজের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, অথচ দীর্ঘ অভ্যাসের এমনই প্রভাব যে সে সকল নিয়ম এখনও সমাজের মনোরঞ্জন করিতেছে। এখনও সামাজিক শাসন সে সকল নিয়মের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। এরূপ স্থানেও সামাজিক শাসন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। কিন্তু যে স্থলে সামাজিক শাসন সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অপ্রিয় পাত্র হইয়া পড়িয়াছে, সে স্থলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

সংগ্রাম করা সহজ—আর যেস্থলে সামাজিক শাসন সমাজের অপকারী হইয়াও তাহার হৃদয়মনে আধিপত্য করিতেছে সেস্থলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরূপ সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের অনুরোধে অপকারী সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ পাওয়া অতিশয় আবশ্যক। কুসংস্কারাপন্ন সমাজে পুরাতন অনুপযোগী পন্থার পরিবর্ত্তে নূতন উপযোগী পন্থা প্রবর্ত্তিত করা সহজ নহে, কিন্তু তাহা হইলেও অন্ততঃ কেবল একটী আদর্শ দণ্ডায়মান করিবার উদ্দেশে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করিতেই হইবে,—নহিলে সে দেশের কখন উন্নতি হইতে পারে না।

প্রবন্ধটির আয়তন বড় বাড়িয়া পড়িয়াছে, যাহা হউক প্রবন্ধটি শেষ করিবার আগে, সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে পরিণামে কি সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত হার্বর্ট স্পেন্সরের মতটি বলিয়া লই। তিনি বলেন যে কালক্রমে সমাজের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে যে তাহার নিজের কার্য্যক্ষেত্র অতিক্রম না করিয়া যে সকল বাসনা সফল করা যাইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তির সেই সকল ভিন্ন অন্য কোন বাসনা থাকিবে না, আর কার্য্যের যে সকল প্রতিবন্ধক প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মান্য করিয়া চলিবে সে সকল ভিন্ন সমাজে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নিয়ম থাকিবে না। অর্থাৎ সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহা কি প্রকারে হইবে। উত্তরে আমরা তাঁহাকে বলিব যে মনুষ্য পরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের শরীর ও মন এই দুয়ে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন চলিতেছে আর এই পরিবর্ত্তন দ্বারা মনুষ্য তাহার নিজের অবস্থা চতুস্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লইতেছে। দিন যায় রাত্রি আইসে, মনুষ্য কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রামার্থ নিদ্রা যায়, গ্রীষ্ম যায় শীত আইসে, মনুষ্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্থূল বস্ত্র পরিধান করে, মিত্র যাইয়া শত্রু আসিল, প্রসারিত ভ্রূ যুগলের পরিবর্ত্তে মনুষ্য কুঞ্চিত ভ্রূ ধারণ করিল, শীত প্রধান দেশের লোকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিল অথবা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকে শীত প্রধান দেশে আসিল, উভয়ের অভ্যাস, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিবর্ত্তন দেখা গেল; ধর্ম্ম গোঁড়া পিউরিটানদের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ডে আমোদপ্রিয় দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব আসিল, ইংরেজরা ভণ্ডামি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচার প্রিয় হইল। মুসলমান রাজত্বের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইল, বঙ্গবাসীগণ পারস্যভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মনুষ্য তাহার নিজের অভ্যাসসমূহকে চতুস্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত ঐক্য করিয়া লয়। যতদিন পর্য্যন্ত কোন

বিষয়ে বাহিরের অবস্থা এক থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত মনুষ্যের ভিতরের অবস্থাও, সে বিষয়ে মনুষ্যের মনের গতিও এক থাকে, বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হউক, মনুষ্যের মনের গতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। তবে কেন সময় সময় এরূপ দেখা যায় যে বাহিরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অথচ মনুষ্যের অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে কেবল সময়ের অল্পতা বা মূর্খতা বা গোঁড়ামি বা ভণ্ডামির জন্য। কিন্তু প্রকৃতি বড় কঠিন জননী, তাহার যে সন্তান চতুষ্পার্শ্বস্থ ঘটনাবলীর সহিত স্বীয় জীবন ঐক্য করিয়া লইতে পারে সেই সন্তানই তিষ্ঠাইয়া থাকে আর যে সন্তান তাহা পারে না সে বিলয় প্রাপ্ত হয়, সে অকালে কালকবলে পতিত হয়। মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান প্রশ্ন এই যে কি প্রকারে আমরা প্রত্যেকে অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষণে না আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, কি প্রকারে চলিলে আমিও সুখী হইতে পারি আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণও সুখী হইতে পারে, আমরা সকলেই জ্ঞাতসারেই হউক অজ্ঞাতসারেই হউক এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যাপৃত রহিয়াছি, দিবারাত্র এই প্রশ্নের অনুশীলন করিতেছি। দিবারাত্র সমাজ ও ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের উৎযোগ হইতেছে। সমাজ ক্রমাগত ব্যক্তির উপর আধিপত্য করিতেছে ব্যক্তিও সমাজের উপর লক্ষ্যভাবেই হউক আর অলক্ষ্য ভাবেই হউক প্রভুত্ব করিতেছে, সমাজকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। আমি তোমাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতেছি, তোমরাও আবার কোন কোন বিষয়ে আমার কথা শুনিয়া চলিতেছ, আমার ইঙ্গিত অনুসারে কার্য্য করিতেছ। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অবশেষে যে সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে তাহা কেবল দর্শন শাস্ত্রের স্বপ্নমাত্র নহে।

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।
বি, এস্, সি, লণ্ডন।

উপকথা।

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি
গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।

বসিয়া আঁধার ঘরে
বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন
এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।

উড়ন্ত মেঘের মত
ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজ পুত্র অবহেলে
কোন্ দেশে যেত চলে
কত নদী কত সিন্ধু পার!
সরোবর ঘাট আলা
মণি হাতে নাগ বালা,
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কত দূরে
কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা
কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে
চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব
একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।

বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা
না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া
শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা,
জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি
মেঘ রাজ্য গেছে টুটি
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে
বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হয়ে প্রাণপণ
করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙ্গে যায়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সিন্ধু-কাহিনী।

ভাই—,

তুমি আমাকে আমার বোম্বাই প্রবাসের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ কিন্তু কি লিখি কোথায় আরম্ভ করি তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। প্রথমে কোন এক নূতন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে অনেক নূতন ছবি চ'খে পড়ে—নূতন ভাব মনে উদয় হয়। লোকদের চালচলন রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে এদেশের নূতনত্ব নাই—আমি এখানকার একজন প্রাচীন বাসেন্দার মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বিশ বৎসর ধরিয়া আমি এ প্রেসিডেন্সিতে কাজ করিতেছি, ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছি। জন্মভূমিই যে আপনার দেশ তাহা নহে, যে প্রদেশে জীবনের অধি-

কাংশ ও সারভাগ কাটাইয়াছি, যে লোকদের মধ্যে এত কাল বাস করিয়াছি ও যাহাদের কার্য্যে আমার শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি ব্যয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের প্রান্ত ভাগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি--সেই দেশ ও লোকদিগকে আপনার বলিয়া বরণ করাই স্বাভাবিক। আমি ত বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি—এ দেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত—তাই মনে হয় যেন নূতন কিছুই লিখিবার নাই, সকলি পুরাণো কথা। তবে এখানে দেখিয়া শুনিয়া আমার যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহা আগড়ম বাগড়ম বকিয়া যাইতে পারি--তা যদি তোমার ভাল লাগে।

ভাষা অনুসারে এ প্রেসিডেন্সি সামান্যতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিন্ধু দেশ। শেষ থেকে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুদেশের কথা পাড়া যাক্। সিন্ধুদেশ ব্রিটিষ রাজপরিবারের নবোঢ়া বধূ—ইহা ব্রিটিষ রাজ্যভুক্ত হইবার পর এখনো অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয় নাই। ম্যাপে দেখিলে এ প্রদেশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মনে হয় না—পঞ্জাবের অঙ্গ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মধ্যে মধ্যে সিন্ধুদেশকে পঞ্জাবের সহিত যোগ করিবার প্রস্তাবও শুনা যায়, কিন্তু বোধ করি সিন্ধিদের তাহা ইচ্ছা নহে—তাহারা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে সুখে আছে। এ দেশের ভাষা সিন্ধি। মারাটী গুজরাতীর সঙ্গে তাহার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়—সংস্কৃতই এ সকল ভাষার আদি-জননী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহার লিখন পদ্ধতি উর্দ্দু—সংস্কৃত মূলক নহে। অক্ষর অনায়াসে দেবনাগরী হইতে পারিত—সিন্ধি ভাষায় যতশব্দ আছে নাগরীতে তাহা সহজে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।—কতকগুলি অতিকঠোর শব্দ আছে তাহার মধ্যে কেবল কোন রূপ রেখা কিম্বা বিন্দুর প্রয়োজন। আমরা যেমন ড ও ড় র মধ্যে বিন্দু দিয়া প্রভেদ নির্দ্দেশ করি, কতকগুলি সিন্ধি-অক্ষর সম্বন্ধে সেইরূপ কোন সঙ্কেত ব্যবহার করিলেই হইল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, দেবনাগরীর পরিবর্ত্তে উর্দ্দু অক্ষর কেন চলিত হইল? ইহার উত্তর, সরকারের হুকুম। যখন ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করে তখন সেখানে লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। বনিকদের হিসাবপত্রে এক প্রকার নাগরীর অপভ্রংশ ব্যবহৃত হইত কিন্তু তা ছাড়া বর্ণাক্ষরের প্রচার ছিল না। যখন ব্রিটিস আদালত সকল স্থাপিত হইল তখন কোর্টের একটা ভাষা ঠিক করা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরের সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। এই সময়ে কোন্ এক মহাপুরুষের মনে হইল যে উর্দ্দুই উপযুক্ত অক্ষর—ক্রমে তাহাই প্রচলিত হইল। আমি যখন সিন্ধি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাষা শিখিতে যত না কষ্ট হউক্ তাহার লেখা অক্ষর লইয়া তাহার সহস্রগুণ গোলযোগ উপস্থিত হইত। উর্দ্দু হাতের লেখা পড়িয়া উঠা সহজ নয়—দেবনাগরী হইলে কেমন সহজে লিখিতে পড়িতে শিখিযাম। সিন্ধি শিখিবার সময় এই অক্ষর

প্রণেতার উপর কতবার আমার মনের ঝাল ঝাড়িয়াছি তাহার ঠিক নেই—মনে করিয়াছি—আঃ এই আনাড়ীর হাতে না গিয়া যদি শর্ম্মার হাতে সিন্ধি অক্ষর চালাইবার ভার থাকিত!

এখানে যত দেশ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সিন্ধু দেশ আমার চক্ষে বিশেষ নতুন ঠেকিয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে উহার ভাব গতিক অনেক ভিন্ন। প্রথমতঃ বর্ষার অভাব। নদী, নালা, খালের জল হইতেই প্রায় সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ইন্দ্র বর্ষণ করেন না—পৃথিবীই স্বীয় নীর দিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন। বৃষ্টি হয় না বলিয়া পাকা ঘর বাড়ি নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যক হয় না, যেমন তেমন খড় মাটীর ঘর বাসযোগ্য করিয়া নিতে পারিলেই হইল। কালে ভদ্রে যদি কখন ইন্দ্রদেবের প্রসাদে বর্ষার আধিক্য হয় অমনি শুনা যায় সহরের অর্দ্ধেকবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। সিন্ধুদেশের আবহাওয়ায়,বিশেষতঃ উত্তর অঞ্চলে, শীতোষ্ণের আতিশয্য। যেমন ঠাণ্ডা তেমনি গরম। গ্রীষ্মকালে ছাতের উপর কিম্বা বাহিরে খোলা জায়গায় শয়ন করিলেও পাখার আবশ্যক হয় ও জলসিঞ্চন করিয়া বিছানায় প্রবেশ করিতে হয়। শীতকালে তেমনি বিপরীত ঠাণ্ডা, ঘরের ভিতরেও অগ্নিসেবন ব্যতীত চলেনা। সিন্ধুদেশে প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য বিরল। ভাগ্যি সিন্ধুনদী আছে তাই রক্ষা, নতুবা এদেশ মানুষের বাসযোগ্য হইত কিনা সন্দেহ। আমরা যখন হাইদ্রাবাদে ছিলাম তখন সিন্ধুনদী আমাদের একমাত্র বেড়াইবার স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে গিয়া বায়ুসেবন করা আমাদের নিত্য নিয়মিত কার্য্য ছিল। মরুভূমির মধ্যে যেন সেই একমাত্র আরামের স্থান বোধ হইত আর মধ্যে মধ্যে নদীর উপর নৌকা করিয়া বেড়ান যাইত। সিন্দু নদীর ভাব অনেকটা গঙ্গার মত—গঙ্গানদীর ন্যায় প্রশস্ত। ইহা দেখিলে আমার দেশ মনে পড়িত, মনে হইত যেন গঙ্গার বুকের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সিন্দু নদীতে পল্লা বলিয়া একরকম মাছ পাওয়া যায়, তাহা আমাদের ইলিস। জেলেরা কলসী ভাসাইয়া মজার রকমে এই মাছ ধরে। এ মৎস্য অতীব সুখাদ্য বলিয়া প্রখ্যাত। আমার একজন সিন্ধি চাকর ছিল তাহার কাছে এক গৎ শুনতাম মনে আছে—

পল্লা মচ্ছী খানা
সিন্দ মুলুক ছোড়কে নহি যানা।

নদী ও খালের তট প্রদেশে ভিন্ন অন্যত্রে গাছ পালা প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দ্দিকে, বালুময় ক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে। এই সকল স্থানে উটের উপর দিয়াই গতিবিধি ও এদেশে উট অনেক কাজে লাগে। জলের কল—তেলের ঘানি উট দিয়াই চালিত হয়! উটই মরুসাগরের জাহাজ। সমুদ্রের উপর যেমন জাহাজের দোলা খাইয়া আনাড়ী নাবিকযাত্রীর ওষ্ঠাগত প্রাণ হয় তেমনি যাহার অনভ্যাস উষ্ট্র-বাহকের ঝাঁকানিতে তাহার রক্ত-দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। শিক্ষিত উট, ভাল মাহুৎ, অভ্যস্ত

আরোহী এই তিন একত্র হইলে উটে চড়ায় আরাম আছে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এক বিষয়ে মরুভূমির উপযোগিতা তোমার সহজে মনে হইবে না। তাহা বলি শুন। বালির উপর সহজে পায়ের দাগ বসে—ইহা চোর ধরিবার এক উৎকৃষ্ট উপায়। আমি যখন শীকারপুরে কাজ করিতাম তখন গরুচুরি মকদ্দমা রাশি রাশি আমার কাছে আসিত। পশু হরণ সিন্ধিদের এক রোগ। এমন দিন নাই যে ঘোড়া, গরু, উট, মেষ, মহিষ প্রভৃতি লুঠের মকদ্দমা উপস্থিত না হইত। কিন্তু তাও বলি 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।' গ্রামে গ্রামে যে সব চৌকীদার আছে তাহাদের নাম 'পগী'। পদচিহ্ন দেখিয়া চোরামাল গ্রেপ্তার করা তাহাদের কাজ। মনে কর কোন এক গ্রাম হইতে একটা উট চুরী গিয়াছে। অমনি সেই গ্রামের পগী অপহৃত-উটের পদচিহ্ন ধরিয়া চোরের সন্ধানে বাহির হইল। সেই পদ-চিহ্ন যদি সে তাহার সমীপবর্ত্তী গ্রামে দেখাইয়া দিতে পারে তাহা হইলেই তাহার দায়িত্ব হইতে সে খালাস। তারপর শেষোক্ত গ্রামের উপর জবাবদিহি পড়িল। এই গ্রামের লোকেরা পগী সঙ্গে করিয়া সেই চিহ্ন ধরিয়া বাহির হয়—এইরূপে চোরের আড্ডায় গিয়া চোরামাল ধরিতে পারিলে তাহাদের পরিশ্রম সার্থক। আশ্চর্য্য এই যে অনেক স্থলে এই উপায়ে চোরামাল ধরা পড়ে—পগীরা এ কাজে এমনি নিপুণ যে প্রায় তাহারা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে না। তাহাদের দক্ষতার প্রমাণ চোরামাল হস্তগত হওয়া—মাল ধরা না পড়িলে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। অনেক সময় পদ চিহ্ন দেখাইয়া তাহারা অন্য গ্রামের লোকদের উপর অপরাধ চাপাইয়া আপনারা দোষমুক্ত হইতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বিজ্ঞ বিচারকের কাছে ওরূপ প্রযত্ন সফল হয় না।

শীকারপুরের নামে মনে পড়িল যে সিন্ধুদেশ শীকারের এক প্রশস্ত স্থান। স্থানে-স্থানে যে বনজঙ্গল আছে সেখানে হরিণ, বরাহ, নেকড়েবাঘ প্রভৃতি বনজন্তু পাওয়া যায়। কোন কোন জলাভূমিতে নানা পক্ষী পাখালীও দৃষ্টিগোচর হয়। আমি মাঝে মাঝে শীকারে বাহির হইতাম কিন্তু বড় বাঘ কখন দেখি নাই—একবার আমার সামনে একটা হায়েনা আসিয়াছিল। সিন্ধিরা সকল রকম বাঘকেই 'সিংহ' বলে। কিন্তু আসল পশুরাজ সিংহ এ সকল বনে দৃষ্ট হয় না। আমাদের দেশের কেঁদো বাঘ Royal Tiger এখানে আছে কি না সন্দেহ। এই সকল শীকার করিতে গেলে অনেক কুলি সংগ্রহ করিতে হয়। শীকারীগণ বন্দুক-হস্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া বসেন, কুলিরা এক চক্র বাঁধিয়া হাঁকাহাকি ডাকাডাকি আরম্ভ করে। সেই চীৎকার ধ্বনিতে যত জীবজন্তু, শস্ত্রধারী শীকারীদের দিকে ধাবিত হয়—এই অবসরে যার যেমন সুবিধা বন্দুক ছুড়িয়া শীকার আদায় করিতে হয়। যে বনে ব্যাঘ্র সঞ্চরণ করে, সেখানে হয় কোন বৃক্ষের উপর কিম্বা উচ্চ মঞ্চের উপর বসিয়া বাঘ মামাকে প্রতীক্ষা

করিতে হয়। সিন্ধীরা অত্যন্ত শীকার-প্রিয়, শীকারপুরে থাকিতে মধ্যেমধ্যে প্রায়ই আমার শীকারের সঙ্গী জুটিত। একবার আমরা দলেবলে মঞ্চর নামে একটা বৃহৎ সরোবরে শীকার করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বুনো হাঁস প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী পাওয়া যাইত। আমরা এক একবার বোটের উপর হইতে শীকার করিতাম। মঞ্চরে একজন বৃদ্ধ সিন্ধী আমাদের যথোচিত আতিথ্য করিয়াছিল—আমরা বেস আমোদে ছিলাম। একবার মনে আছে আমরা একটা জায়গায় চকা-চকির ঝাঁকের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সংস্কৃত কাব্যে চকা চকির কথা পড়িয়া তাহাদের সঙ্গে এমন সখ্যবন্ধন হইয়া গিয়াছে যে গুলি ছুঁড়িতে হাত উঠিল না। সে বেচারীদের মধ্যে গুলি চালাইতে গিয়া 'মা নিষাধ প্রতিষ্ঠাং ত্বং' আকাশবাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার অন্তরাত্মাকে দগ্ধ করিল। সে যাহা হউক, আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করে চখা-চখির বিচ্ছেদ বর্ণনা কতদূর সত্য। তাহা বাস্তবিক ঘটনা অথবা আমাদের সংস্কৃত কবিদের কল্পনা মাত্র। সত্যই কি বিধাতার এমনি কঠোর নির্ব্বন্ধ যে সন্ধ্যা হইলেই চখা-চখী বিযুক্ত হইবে—চখা যদি এ পারে থাকে চখী ও পারে গিয়া বসিবে। চখা বলে—'চখ্বী মই আঁউ' চখী উত্তরদেয় 'নহী নহী চখ্বা।' আবার চখ্বী বলে 'চখ্বা মই আঁউ?' চখা উত্তরদেয় 'নহী নহী চখ্বী' এইরূপে কি সমস্ত রাত্রি গত হয়?

আমি কি করিতেছি—শীকার হইতে কবিতায় গিয়া পড়িলাম। আবার পক্ষ সংযত করিয়া নিম্নদেশে অবতরণ করা যাক। ইংরাজেরা সিন্ধুদেশ অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাহা আমীরদের রাজ্যছিল। আমীরেরা বড়ই শীকারভক্ত ছিল। তাহাদের হাতে রাজ্য থাকিলে এতদিনে সিন্ধুর সমস্ত প্রদেশ 'শীকার গাঁ'য়ে পরিণত হইত। কথিত আছে তাহাদের এমন কঠোর শাসন ছিল যে রক্ষিত-বনের কেহ একটা বরাহ বধ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। এখন আর সে কাল নাই। এই আমীরদের রাজ্যের খয়েরপুর এখন অবশিষ্ট আছে—আলিমোরাদ তাহার রাজা। তদ্ব্যতীত আমীরদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এক্ষণে কেহ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে কাজ করিতেছেন কেহ বা পেন্সন ভোগ করিতেছেন। এক জন মীর সাহেব আমার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কখন কখন শীকারে যাইতাম। তিনি শীকারে বিলক্ষণ মজবুত—উড়ন্তপক্ষী তাঁহার গুলি খাইয়া পড়িত। এই মীর একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। একটা খুনী মকদ্দমাতে তিনি একবার এক কারখানা করিয়া বসিয়াছিলেন। মকদ্দামা সেসনে কমিট হইলে যে সকল জিনিশ প্রমাণ স্বরূপ নথির সঙ্গে পাঠাইতে হয়—যাহাদের এদেশের চলিত ভাষায় 'মুদ্দামাল' বলে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমান মাজিষ্ট্রেট মৃত ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সেসন কোর্টে কাটা-মুণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া সেসনজজ ক্রোধান্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই অতি বুদ্ধির কাজ ক-

রিয়া বেচারী মীরসাহেব ভারি বিপদে পড়িয়াছিলেন।

সিন্ধুবাসী অধিকাংশ মুসলমান। এসব দেশে যেমন হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান ও-দেশে তেমনি মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু। হিন্দুদের আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণে গঠিত। তাহারা আমিষ-ভক্ষণ ও সুরাপানে পরাঙ্মুখ-নহে। 'আমিল' নামে হিন্দুদের প্রধান জাতি কায়স্থ—তাহাদের বেশভূষা ও শ্মশ্রুল মুখশ্রীতে মুসলমানের সঙ্গে প্রভেদ বুঝা দুষ্কর। প্রথমে যখন সিন্ধু-হাইদ্রাবাদে আমার কর্ম্ম হয় তখন হিন্দুদের কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তি আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। আমরা এক সঙ্গে এক মেজে বসিয়া পানভোজন করি--তাহাতে আমার কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইল। কেন না হিন্দুদের ওরূপ জাতেজাতে মেলামেশা সচরাচর দেখা যায় না। শেষে উহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। হাইদ্রাবাদে এক ব্রাহ্মসমাজ আছে, ন—রায় একজন উৎসাহীব্রাহ্ম ও সমাজের এক প্রধান নেতা। তাঁহার যত্নে কতক জন সাহসী-যুবা দলবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ হিন্দুসমাজের কি পক্ষে গজা-হস্ত হইয়াছেন—মাঝে মাঝে দুই দলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহারা সাহস করিয়া আমার সঙ্গে একাসনে আহার করিয়াছিলেন তাঁহারা যে সামাজিক শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন তাহা নহে। শুনিলাম তাহার জন্য তাঁহাদের নাকি শেষে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

মুসলমানদের রাজত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানেই অবরোধ প্রথার কড়াক্কড় নিয়ম দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশে তাহাই দেখিলাম। স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরেই রুদ্ধ—সূর্য্য চন্দ্রও তাহাদের রূপ দেখিতে পায় না। চন্দ্রের কথা ঠিক হইল কি না জানি না কিন্তু ইহা সত্য যে অন্তঃপুরে সূর্য্যদেবের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি কতমাস ওদেশে ছিলাম কোন ভদ্র সিন্ধি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। ন—রায় মহাশয় ঘন ঘন আমাদের কাছে আসিতেন—আমার সঙ্গে একত্রে বসিয়া আহারাদি করিতেন কিন্তু তাঁহার পরিবারের মধ্যে কখন আমাদিগকে আমন্ত্রণ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে হইল। মহাত্মা মিশ কার্পেন্টার যখন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন আমরা সিন্ধু দেশেই ছিলাম। তিনি হাইদ্রাবাদে আমাদের বাটীতে কতক দিন বাস করিয়াছিলেন। সিন্ধিরা তাঁহার আতিথ্য সৎকারের জন্য অনেক করিয়াছিল। স্কুলের ছাত্রেরা মিলিয়া এক নাটক অভিনয় করিল, তাহাতে এক কবিতা পঠিত হয়—তার ধুয়া মিশ মেরি কার্পেন্টার—তাহা যেন এখনো আমার কর্ণে আসিয়া বাজিতেছে। মিশ কার্পেন্টারের উপর সিন্ধিদের এমন ভক্তি, এত আদর, এত যত্ন যে ন—রায় মহাশয় তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার সদ্ভাবের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। যে অন্তঃপুর এমন আটে ঘাটে

বদ্ধ যে আমার স্ত্রীও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহার মধ্যে একজন ইংরাজ মহিলাকে ডাকিয়া অভ্যর্থনা করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নহে। আজ তবে এইখানে শেষ করি—আর এক সময় বোম্বাই সহরের বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভালবাসা।

এ জগতে মনুষ্যের ভালবাসা অপেক্ষা মূল্যবান্ আর কি আছে? ইহা দীন দরিদ্র কাঙ্গালের নিকটও যেরূপ মূল্যবান্ ও আদরের সামগ্রী ধনমানশালী সসাগরা ভূখণ্ডের অধিশ্বরের নিকটও সেইরূপ; ধনমানে ইহার বিশেষ তারতম্য হয় না, তবে ব্যক্তিভেদে ও হৃদয়ভেদে কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে মাত্র। ভালবাসার মূল্যাধিক্য হেতুই সাধারণত লোকে ইহাকে অমূল্য বলিয়া থাকে। ইহার মূল্য নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। এবিষয়ে যিনি যত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন তিনি ততই দুর্গম অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তখন ভালবাসা স্বার্থপরতায় এমন জড়াইয়া ঢাকা পড়িয়া যায় যে তাঁহার মানব-চক্ষু আর কাচ হইতে হীরক চিনিয়া লইতে পারে না, কাচকেই হীরক বলিয়া ভ্রম করিয়া ফেলে। জল ভাগ করিতে প্রয়াস পাইয়া ছুরিকা নিক্ষেপ করিলে যেরূপ ছুরিকাটিই তরঙ্গে ডুবিয়া যায় জল ভাগ করা হয় না, ভালবাসা ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও সেইরূপ আমাদের মন ভাবের তরঙ্গে ভাসিয়া যায় আমরা তাহাকে আর ধরিতে পারি না, সে আমাদের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ভালবাসা যেমন তেমনই থাকে তাহার কিছুই ভাগ করা হয় না। তবে যেমন তড়িৎ দ্বারা জলের উপাদান দুইটি প্রকাশ পায় সেইরূপ ভালবাসার তড়িৎ যাঁহাদের নিকট পরিচিত আছে তাঁহাদের মনের মধ্যে ভালবাসার উপাদানগুলিও সেইরূপ বিকাশ পায়। কিন্তু ভালবাসার তড়িৎ আমাদের নিকট পরিচিত নাই বলিয়া কি আমরা তাহার মূল্য কিছু পরিমাণেও বুঝিতে সক্ষম হইব না? এ সংসারে তাহার কার্য্য ও ক্ষমতা দেখিয়া কি কিছুই বুঝিব না? ছার অর্থের মোহে কি চিরকালই নিদ্রিত থাকিব? আমরা সাধারণত কি প্রকারে দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধার করিয়া থাকি? তাহার কার্য্যকারিতা ও উপকারিতা দেখিয়াই আমরা তাহার মূল্য নিরূপণ করি। তবে ভালবাসার বিপুল মহিমা স্থাপন করিতে হইলেও আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। যদিও আমরা ইহার উপকারিতা সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে না পারি তথাপি যে টুক পারি সেই টুক লইয়া দেখিলেও আমরা ইহার অতুল মূল্য ধারণা করিতে সক্ষম হইব। এ সংসারে ভালবাসার ন্যায় প্রভাব কাহার? ইহার ন্যায় উপকারক কে আছে? পৃথিবীতে অর্থের ক্ষমতা বিপুল বটে, অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সকল

সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ করা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ভালবাসার সহিত পার্থিব সুখের প্রতিকৃতি এই অর্থ কি তুলনাতেও আনিতে পারে? মান মর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য যাহা দিতে পারে না ভালবাসা তাহা দিয়া হৃদয় পুরাইতে পারে; সুধু ভালবাসা থাকিলেই মনুষ্যের অন্তরে শান্তি বিরাজ করে, কারণ সুখ ত আর অর্থে নহে সুখ মনে। দেখাগিয়াছে রাজাধিরাজেরা এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর একাধীশ্বর হইয়াও যথার্থ সুখভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলেন। নহুষতনয় যযাতি সহস্র বর্ষকাল বিষয়সুখ ভোগ করিয়াও ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তিনি যে সুখের কল্পনায়-বিষয়ভোগে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন সে সুখের কণামাত্রও পান নাই, বরং উপভোগ-বর্দ্ধিত সুখস্পৃহায় আকুল হইয়া দিন দিন অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। অবশেষে পুত্রগণকে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখের অসারত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তিনি জরা গ্রহণ করিলেন। রাজা যদি প্রজাদিগের ভালবাসা না পায়েন কিংবা তাহাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায় স্নেহ না করেন তাহা হইলে কিছুতেই তিনি সুখী হয়েন না। তাঁহার-সেই-অর্থের মায়া তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না; মায়ার ঘোর ভাঙ্গিবার পর তিনি "হা হতো হস্মি" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, কিছুতেই আর শান্তি আনন্দ উপভোগ করিতে পায়েন না। সেই নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্বকালের প্রাতঃস্মরণীয় প্রজাবৎসল নৃপতিগণ কখনও বিষয় সুখে মুগ্ধ থাকিতেন না। কর্ত্তব্য মনে করিয়াই রাজকার্য্য সমাধান করা ও প্রজাদিগকে যথার্থ সন্তানের ন্যায়, স্নেহের সহিত পালন করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, রাজছত্রটি উপলক্ষ মাত্র। প্রজা-বৎসল রামচন্দ্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রজা সন্তুষ্টির নিমিত্ত বিনা অপরাধে পতিব্রতা প্রিয়তমা জানকীকেও বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

এক জন নিতান্ত দরিদ্রকে যদি তুমি ভালবাস আর ভালবাসিয়া একমুষ্টি অন্ন দাও তাহাতে সে যত সন্তুষ্ট হইবে ও মনে শান্তি পাইবে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ দান করিলেও সে তত আপ্যায়িত হইবে না। অর্থপিশাচ, কঠোর মনুষ্যের অশান্তি-পূর্ণ হৃদয়ও ভালবাসার শান্তিবারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধতা অনুভব করে। একজন অভিমানী ব্যক্তি অপরের নিকট দয়ার পাত্র হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন কিন্তু ভালবাসা পাইলে তিনি তোমার চরণে লুটাইতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। যে কুপথে গমন করিতেছে সে কাহারও কথায় মন দিবে না; কিন্তু তাহাকে অযথা তিরস্কার না করিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া, ভাল বাসিয়া কেহ কিছু বলিলে সে তাহা সলজ্জভাবে শুনিবে আর কিছুকাল তাহার সহিত থাকিয়া উপদেশ দিতে পারিলে কুপথ হইতে সুপথে আনিতেও অধিক বিলম্ব হইবে না। ভালবাসা পাইলে লোকে সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়। পৃথিবীর ক্লেশ যতই দুঃসহ হউক না কেন

হৃদয়ের বন্ধু পাইলে তাহা মন হইতে মুছিয়া যায়। ভালবাসা পাইলে মন একবারে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া অপরে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহার দুঃখেই তাহার দুঃখ তাহার সুখের উপরই তাহার সুখ নির্ভর করে।

কেহ যদি ভালবাসা একজন কি কয়েক জনের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবেই তাহার প্রিয়জনদিগের নিকট সে ভালবাসা বড় আদরের, কিন্তু প্রশস্তক্ষেত্র বিস্তৃত হইলেও ভালবাসার অনাদর হইবার কারণ দেখি না।

ইহাতেই অর্থের সহিত ভালবাসার আর এক বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। অর্থের বিনিময়ে যাহা পাই তাহাই আমাদের থাকে, অর্থ আর আমাদের থাকে না, তাহা চলিয়া যায় আর ফিরে না। কিন্তু ভালবাসার পক্ষে তাহা ঘটে না, ভালবাসা ফুরায় না, তুমি যতই ভালবাস, তোমার ভালবাসা ততই বাড়িয়া উঠে আর তাহার সহিত ভালবাসিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। লোকে বিদ্যার কথায় বলে "ইহা যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে"। কিন্তু বিদ্যাপেক্ষা ইহা ভালবাসাতেই অধিক খাটিয়া থাকে। একজন পণ্ডিতকে চিরজীবন যদি বালকদিগকে বর্ণপরিচয় করাইতে হয়, তাহা হইলে কি আর তাহার বিদ্যা বৃদ্ধি পায়, না ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু ভালবাসায় তাহা হয় না। আমাদের মনের মধ্যে ভালবাসার যে অনন্ত নির্ঝর বহিয়াছে কিছুতেই তাহা নিঃশেষ হয় না, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই আর আমাদের কিছুই ভাবনা থাকে না। আমরা সেই নির্ঝর হইতে ভালবাসার অনন্ত প্রবাহ পাইতে থাকি, তাহা আমাদের জীবন মরুকে প্লাবিত করিয়া বিশ্বজগতে উথলিয়া পড়ে। অনেকেই স্বীকার করিবেন যে যাঁহার হৃদয়ে সুখ ও শান্তির স্পৃহা অতিশয় বলবতী তাঁহার নিকট হইতে সুখ ও শান্তি অনেক দূরে পলায়ন করেন; যাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন তাঁহারা কিছুকাল বিষয়-সুখভোগের পর বুঝিতে পারিবেন যে ইহা কি মহৎ সত্য। এই মহৎ সত্য এত অধিক লোকে ঠেকিয়া চিনিয়াছেন যে জ্ঞানীরা, শুদ্ধ জ্ঞানীরা কেন অধিকাংশ লোকেই বোধ হয় আর ঠেকিয়া শিক্ষা পাইতে চাহিবেন না। ইহাও আর এক মহৎ সত্য যে যিনি সুখশান্তি পাইবার আশায় কোনও কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়েন না তিনিই যথার্থ শান্তি ও সুখলাভ করেন। মনুষ্য বিনা ঐশ্বর্য্যে বিনা মান-মর্য্যাদায়, বিনা যশে, কেবল মাত্র ভালবাসায় মন পূর্ণ করিয়াই মনের সুখে ও মনের শান্তিতে জীবনাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু ধন মান মর্য্যাদা যশ এ সকল পাইয়াও ভালবাসার অনাটন পড়িলে, পরের দুঃখে মন গলাইতে না পারিলে সুখ শান্তি বা আনন্দ তাহার কিছুই থাকে না, আর এ সকলের অভাব পড়িলে মনুষ্যের জীবন মরুভূমির ন্যায় হইয়া উঠে। এই মহৎ সত্যটি কাহারো নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল সকলেরই নিকট পরিচিত আছে। সকলেই জানেন যে ধনমানে সুখলাভ মনুষ্যের অদৃষ্টে ঘটে না কিন্তু তাহা যথার্থ কি কারণে ঘটেনা তাহা হয়ত সকলে তলাইয়া বুঝেন না। তাঁহারা যখন দেখেন এ সংসারে সুখ পাইলেননা তখন তাঁহারা সুখস্পৃহা ত্যাগে যে যথার্থ সুখ পাইবেন তাহা মনেও ভাবেন না; তাঁহারা মনে করেন যে এ পৃথিবীতে সুখ নাই তবে যত কাল মায়ার ঘোরে থাকেন তত দিনই সুখ, নিদ্রাভঙ্গের পর যে কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করেন সেইটা কেবল পৃথিবীর নিত্য দুঃখ এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা যত দিন পারেন আত্মীয় বন্ধুদিগকে মায়ার পিঞ্জর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ব্যস্ত হয়েন। তাঁহারা

যথার্থ সুখের পথ ছাড়িয়া হৃদণ্ড মায়াসুখ পাইবার জন্য লালায়িত হন; আর এই ঘোরের মধ্যে থাকিয়া জীবনের মহদুদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। এই অসার পার্থিব সুখে যখন আমাদিগকে যথার্থ সুখী করিতে পারে না,সে সুখ যখন মহাদেবের ন্যায় আরাধনার বশবর্ত্তী নহে বরং আগ্রহ সহকারে ধরিতে যাইয়া হারাইয়া ফেলি, তখন এই মায়াবিনী মরীচিকা ধরিবার জন্য দৌড়িবার প্রয়োজন কি। এই মায়াবিনী রাক্ষসীকে ছাড়িয়া যাহাতে মন যথার্থ সুখ শান্তিলাভ করিতে পারিবে সেই পথে ধাবমান হওয়া কি আমাদের উচিত নহে।

যে কখনও ভালবাসা পায় নাই যে যথার্থ এ সংসারের—সংসারী, সে অপরকে শীঘ্র ভাল বাসিতে অগ্রসর হইবে না; তাহার পাষাণের ন্যায় নিশ্চল সেই স্বার্থপর হৃদয় হইতে সে এক বিন্দুও সুখানুভব করে না, কেবল নিজেকে ভাল বাসিয়া বাসিয়া ফাঁপাইয়া তুলে। কিন্তু ভালবাসার অমোঘ ঔষধে পাষাণও কোমল হয়, অসাড়ও জীবন্ত হয়। তাহাকেও ভালবাস, ভাল বাসিয়া, মহাজনগণের নিঃস্বার্থকীর্ত্তি জলন্তমহিমায় অবিরত তাহার কাছে কীর্ত্তন কর, তাঁহাদের পবিত্র মূর্ত্তি বার বার তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত কর, দেখ তাহাকেও স্বার্থের পথ হইতে ফিরাইতে পার কিনা? যে সংসারে ডুবিয়া রহিয়াছে তাহাকেও পার্থিব সুখের অস্থায়িত্ব বুঝাইতে পারিলে সে অধিক দিন সংসারের ঘোরে থাকিবে না, সে কিছু দিন পরে অপরকে ভাল বাসিতে শিখিবেই শিখিবে। অপরকে ভাল বাসিতে গিয়া এক জনের প্রেমে আবদ্ধ হইলেই যে ভালবাসার উদ্দেশ্য সাধিত হইল, আমি তাহা বলি না, ইহাতে জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করা হয় না। জীবনের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে একজন অপর একজনের প্রেমের ঘোরে নিদ্রিত থাকে। তোমার বিবেচনা করা উচিত যে তুমি এ বিশ্বজগতের একটি কণা মাত্র, আর সেই কণাকে বিশ্বজগত হইতে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া মনে করা কি অজ্ঞানতা নহে। বিবাহ কর আর নাই কর, জীবনের এই মহদুদ্দেশ্য কখনও ভুলিও না, কখনও তোমার মন হইতে অপসৃত হইতে দিও না, তা হইলে আমরা পশু পক্ষীদের হইতে উচ্চ কিসে? জগত মণ্ডলের কর্তৃত্বের উপযুক্ত কি সে? ভালবাসাকে যখন কেবল তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে সীমাবদ্ধ কর তখন সে ভালবাসাকে, ভালবাসা বলা যায় না তাহা তোমার সেই অসার পার্থিব-সুখের সোপান মাত্র। এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব-সুখ অন্বেষণ করিয়া অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা এই জগৎ-মণ্ডলকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা কি অধিকতর গৌরবজনক নহে। তাই বলিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি ঘৃণা কি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে বলি না। তোমার কর্ত্তব্য তাহাদের ভালবাসা ও সতত তাহাদের সুখসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখ, কিন্তু নিজপরিবারকে ভাল বাসিতে গিয়া যেন এই বিশ্বপরিবারকে মন হইতে অপসৃত করিয়া দিও না। এইরূপ ভালবাসিতে পারিলে, মনকে স্পৃহাশূন্য করিতে পারিলেই পবিত্র সুখ বিনাঅন্বেষণে তোমার হৃদয়াধীন হইবে, শান্তি—অবিমিশ্র, পূর্ণ, স্বর্গীয়শান্তি তোমার অন্তরে সতত বিরাজ করিতে থাকিবে। এই ভালবাসাই যথার্থ ভাল বাসা; ইহাই এই অনিত্য জগৎ মধ্যে একক স্থায়ী, স্বার্থত্যাগ ও আত্মদানই ইহার অনন্ত সোপান। এই সোপান দিয়া আরোহণ করিলেই মনুষ্য যথার্থ মনুষ্য নামের যোগ্য হয়, যথার্থ পৃথিবীকে জয় করে, যথার্থ ঈশ্বরের গুণগান ও প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া এই অস্থায়ী জগতেও ঈশ্বরের শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া যায়।

শ্রী—শর্ম্মা।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা জানা।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

সম্প্রতি আরবিং বিসপ ও ষ্টুয়ার্ট কাম বারল্যাণ্ড নামে দুই ব্যক্তি ইয়োরপে মনের-কথা বলার ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ কাল এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ইয়োরপ এত যত্নশীল যে উৎসাহ দিবার অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন, কামবরল্যাণ্ডের, এবং জার্ম্মানিতে সম্রাট স্বয়ং সপরিবারে, বিসপের, অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাঁদের দু জনেরি মনের কথা বুঝিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু ইহাঁরা দু জনে মনের কথা বুঝিবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিসপ বলেন তিনি বিনা শরীর স্পর্শে, ইন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে মনের কথা ধরিতে পারেন, মাংসপেশীর অবস্থান্তর (muscular movements) লক্ষ্য করিয়া তিনি মনের কথা বলেন না। কামবরল্যাণ্ড বলেন তিনি মাংশপেশীর সূক্ষ্ম অবস্থা-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াই মনের কথা বলিতে পারেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি মাংশপেশী-পাঠ করেন, (reads muscle) মনের কথা পড়েন না, আর শরীরের সংস্পর্শে না আসিয়া অন্য উপায়ে মনের কথা বলিতে পারা তাঁহার মতে একেবারে অসম্ভব। (he denies that any one can read thought otherwise than by noting muscular movements.) কিন্তু কামবরল্যাণ্ড যে সকল ঘটনা সাধিত করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা কোন কোন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে ও সকল ঘটনাকে মাংশপেশী-পাঠ বলা যায় না, মনের কথা পড়াই বলিতে হইবে।

তা যাই কেন বলা হউক না, ঘটনাগুলি যে খাঁটি তাঁহার মধ্যে যে প্রতারণা কিছুমাত্র ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তের জন্য একটি ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি।

একবার একটি প্রকাশ্য সভায় কামবরল্যাণ্ড মন গুণিতেছিলেন। গ্রাণ্ট আলেন (নলজের পাঠকগণ ইহাঁর সহিত বিশেষ পরিচিত) এইরূপ ক্ষমতায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেন, তিনি পরীক্ষার জন্য একখানি রুটি মনে করিয়া তাহা দূরে একটি বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিতে পাঠাইলেন, এখন অ্যালেনের এই মনের জিনিসটি কামবরল্যাণ্ডকে বাহির করিয়া দিতে হইবে। রুমাল দিয়া তাঁর চোখ বন্ধ হইলে তিনি অ্যালেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে রাস্তায় একটি বাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অ্যালেন তখন ঠিক সেই বাড়ীর কথাই ভাবিতে ছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন ঐ বাড়ীতেই রুটি রাখা হইয়াছে. কিন্তু আসলে সে বাড়ীতে রুটি ছিল না, সে হিসাবে কামবরল্যাণ্ডের গণনা ঠিক হইল না। কিন্তু এই ভুলই কি মন জানার পক্ষে অধিক প্রমাণ দিতেছে না। কামবরল্যাণ্ড যদি কোন উপায়ে আগে হইতে ঠিক বাড়ীটি জানিতেন তাহা হইলে কি আর ঐ ভুলবাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইতেন, কামবরল্যাণ্ড যে কোন প্রতারণা অবলম্বন করেন নাই—ইহা হইতে তাহাও যেমন বোঝা যাইতেছে, তাঁহার মনের কথা পাঠের ক্ষমতারও তেমনি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল ইহাই নহে, সেই বাড়ীর কাছে থামিবামাত্র অ্যালেনের মনে হইল—'কামবরল্যাণ্ড এখন কি করিবে? ঘণ্টা বাজাইয়া লোক ডাকিবে না দ্বারে আঘাত করিবে?' আশ্চর্য্য এই কামবরল্যাণ্ড যেন অ্যালেনের এই সূক্ষ্ম সন্দেহটি পর্য্যন্ত বু-

ঝিতে পারিলেন, তিনি দুইই করিলেন এক-বার ঘণ্টা বাজাইলেন, একবার দরজায় আঘাত করিলেন। কেবল হাতটি স্পর্শ করিয়া মাংসপেশীর অবস্থা-বৈলক্ষণ্য যদি এতদূর বুঝা যায় যাহাতে এই ক্ষুদ্র সন্দেহটি পর্য্যন্ত অন্যে ধরিতে পারে, তাহা হইলে এই মাংসপেশী-পাঠ কি অল্প বিস্ময়জনক!

প্রকটার বলিতেছেন কেবল হাতের স্পর্শে এইরূপ সূক্ষ্ম সন্দেহ প্রকাশ করিবে ইহা মনে করা যায় না, যদি তাহা হয় ত মন জানা হইতে মাংসপেশীর কার্য্য জানা আরো অধিক আশ্চর্য্যের। তিনি বলেন যখন বিনা সংযোগে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে পদার্থের উপর পদার্থের কার্য্য চলিতেছে, তখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা মনের কথা চালিত হইলেই বা তাহার অস্বাভাবিকত্ব কোথায়? তবে ইহা আমাদের নিকট রহস্যময় মাত্র, কিন্তু দূরদূরান্তরস্থিত পদার্থের উপর পদার্থের কার্য্য ইহা হইতে সমধিক রহস্যময়।*

প্রকটার বলেন যে বিসপ ও কামবরল্যাণ্ড দুজনেরই মনের কথা বুঝিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা দুজনে উহার বৈজ্ঞানিক কারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তবে আপনাদের পসারের জন্য যিনি যেরূপ বলা সুবিধাজনক ভাবিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। বিসপ বলেন ইন্দ্রিয়ের বিনা-সাহায্যে তিনি মনের কথা বুঝিতে পারেন, কামবরল্যাণ্ড ভাবিলেন উহা না বলিয়া তিনি যদি বলেন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি মনের কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে লোকে তাহার সরলতায় আরো সন্তুষ্ট হইবে, এবং ইহাতেই তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইতে পারিবেন, ইহা ছাড়া বাস্তবিক যে কামবরল্যাণ্ড তাহার ক্ষমতার যথার্থ কারণ জানেন তাহা নহে। †

প্রবন্ধটির কায়া বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, নহিলে উপরের মত আরো অনেক দৃষ্টান্ত আমরা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা নাই পারিলাম, তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যে সকল ঘটনা উদ্ধৃত

* Whether thought-reading without contact would be supernatural, I may remark that it would only be mysterious, not supernatural nor would it be anything like so mysterious as the action of matter on matter without contact, instantaneously over distances of hundreds of millions of miles. No man who admits—as every man of science must—that law of attraction which is the most stupendous mystery known to science yet rejects the idea that this great law of nature is not a natural law, need regard the idea of thought transference as involving aught of the supernatural. The influence of matter on matter without contact is at least as great a mystery as would be the influence of mind on mind at a distance.

† I think neither Mr Bishop nor Mr Cumberland has the slightest idea how they do what they undoubtedly can do. Each possesses a remarkable power of interpreting the thoughts of others. Each knows the power to be fitful and variable. Neither can make sure of success in any given attempt; yet each has met with some successes which cannot reasonably be interpreted as due to mere chance. Each has formed a tolerable idea of the unscientific credulity and of the equally unscientific incredulity of the public. One has thought it well to play on the former quality, the other seems it better to play on the latter. But as to a real idea of the nature of the power each feels he possesses, neither one nor the other has any whatever.

হইয়াছে তাহাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট, অধিক প্রমাণের আর আবশ্যকই বা কি? তবে যাঁহারা ইহাতেও মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কিছুই পাইবেন না, আর দুই এক টি কেন আর শত সহস্রটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলেও তাঁহাদের সংশয় দূর হইবার নহে। এইখানে মিশ ফক্সের একটি গল্প মনে পড়িল—তিনি শুনিয়াছিলেন একবার সার উইলিয়ম হ্যামিলটন, একটি আশ্চর্য্যজনক অঙ্ক-ফল বাহির করিয়া সে কথা সার জর্জ এয়ারিকে বলেন, এয়ারি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "না তাহা হইতে পারে না"—উইলিয়ম বলিলেন, নিশ্চয়ই ইহা এইরূপ,আমি পাঁচ মাস ধরিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।" এয়ারি বলিলেন 'কিন্তু আমি যে পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ বিষয়ে ভাবিতেছি' তবুত কিছুই দেখিতে পাইলাম না"।

এরূপ গল্প একটি আদটি নয় অনেক আছে। সূর্য্য কলঙ্ক দেখিয়া যখন গ্যালিলিও সে কথা বলেন তখন সিনার বলিয়াছিলেন তাহা গেলিলিওর চক্ষের কলঙ্ক সূর্য্যের কলঙ্ক নহে।

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া মানুষের ইন্দ্রিয়াতীত কোন অজ্ঞাত শক্তি আছে, ইহাতে আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না। মনের কথা চালনা যে এই শক্তির ফল আমরা মোটামোটি ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এ শক্তির সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষ কোন কারণ নির্দ্দেশ করেন কি না এইবার দেখা যাউক।

এ সম্বন্ধে এখনো যে তাঁহারা কোন বিশেষরূপ সিদ্ধান্তে পহুছিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, অনেকে অনেক প্রকার আনুমানিক কারণ মাত্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে নাইনটিন্থ্ সেনচুরির সম্পাদক মস্তিষ্ক রেণু তরঙ্গাঘাত (ব্রেন ওয়েব থিয়রি) নামক যে মতটি এ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তন করেন তাহা এইখানে প্রকাশ করা যাইতেছে।

এ মতে, যেমন বায়ুতরঙ্গে শব্দ উৎপত্তি, ইথারতরঙ্গে আলোক উৎপত্তি, তেমনি মস্তিষ্করেণুর কম্পনতরঙ্গে মনের কথা চালিত হইতে পারে এইরূপ অনুমিত। সিদ্ধান্তটি এইরূপে গঠিত হইয়াছে—

প্রথম, ইহা ধরা কথা, মস্তিষ্কের কোন কার্য্য হইতে গেলেই ইহার মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য ঘটে, অর্থাৎ যা একই কথা, একটি আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়, ইহা ধরা কথা, কঠিন তরল বাষ্পীয় সকল রূপ পদার্থের মধ্যে ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থিত থাকিয়া উহাদের পরস্পরকে সংযুক্ত করিতেছে।

এই দুইটি ধরা কথা হইলে, চিন্তার সময় মস্তিষ্কের অণুবিকম্পন দ্বারা ইথার তরঙ্গায়িত হইবে ইহাও ধরা কথা। এবং তাহা হইলেই একটি মাথার চিন্তাতরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র মস্তকে প্রবেশ করিবে।

প্রত্যেক চিন্তাশালী মস্তিষ্ক এইরূপে একটি চিন্তাতরঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া চারিদিকে চিন্তার তরঙ্গ বিক্ষেপ করিতেছে, এখন এই তরঙ্গ যখন এক অতি সূক্ষ্ম, উ বিশেষ রূপ অনুভূতি-শক্তি-বিশিষ্ট মস্তিষ্কে আসিয়া আঘাত করে, তখন তাহাতে সে চিন্তার ছাঁচ উঠিবার আশ্চর্য্য কি?

যেমন সকল কাগজে ফোটোগ্রাফির ছাঁচ পড়ে না, একরূপ বিশেষ অবস্থাতে যখন সে কাগজ আলোকতরঙ্গ ধারণে সক্ষম হয়, তখন সেই ধারণশীল অবস্থায় মাত্র সে কাগজে অন্য জিনিসের ছায়া উঠে। শব্দতরঙ্গ কত শত জিনিসের মধ্য দিয়া নিস্তব্ধে চলিয়া গিয়া একটি বিশেষ রূপ গঠনের জিনিসে মাত্র শব্দ উৎপাদন করে,তেমনি কোন একটি ধারণশীল মস্তিষ্কেই মাত্র অন্য মস্তিষ্কের

চিন্তাতরঙ্গের ছাঁচ উঠিতে পারে। ইহাই মস্তিষ্করেণুতরঙ্গমত (brain wave theory)।

ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার অদৃশ্য-জগৎ নামক পুস্তকেও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন" আমরা যখন যাহা কিছু ভাবিনা কেন, ভাবিবার সময় আমাদের মস্তিষ্কের অণুর গতি হয়, এবং এইরূপ কল্পনা করিতে পারি, যে কোন না কোন প্রকারে এই অণুতরঙ্গ জগৎময় ব্যাপ্ত হয়।

ব্যাবেজও এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তিনি বলেন, "যদি প্রত্যেক কম্পনের সূক্ষ্ম-ফল দেখিবার আমাদের ক্ষমতা থাকিত ত প্রত্যেক অণুর ভিতর আমরা কত সংলিপ্ত ঘটনা দেখিতে পাইতাম।"

ইহা কল্পনা করিতে গেলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, সেই ক্ষুদ্রতম আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতম চিন্তাটি পর্য্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অক্ষয়ভাবে বিরাজ করিতেছে! যদি আমরা পড়িতে জানিতাম প্রতি অণুর পাতায় পাতায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ইতিহাস জ্বলন্ত-অক্ষরে পড়িতে পারিতাম! এ পুস্তকের যিনি লেখক তাঁহার মহিমাকে ধন্য! ! !

অজ্ঞাত-মানসিকশক্তির অস্তিত্বে বৈজ্ঞানিক ক্রুকশের অকাট্য বিশ্বাস। বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তিনি চিন্তাচালনার সত্যাসত্য নির্ণয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ইহার সহায়তায় তিনি অজ্ঞাত মানসিক শক্তির প্রমাণ লাভ করেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া বলিতেছেন, যে "মানুষের এমন একটি শক্তি আছে যাহার বলে বিনাস্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, না ছুঁইয়া কোন জিনিস নড়ান যাইতে পারে, না ধরিয়া ভারী জিনিস শূন্যে ঝুলান যাইতে পারে, এবং প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে।"

স্পষ্ট আলোকে তিনি এই সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার জন্য অন্ধকার আবশ্যক হয় নাই। এ সম্বন্ধে একবার কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি তাহার এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, "এই সকল ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; এবং ইহা গোপন করিয়া রাখিলে আমার কাপুরুষতা প্রকাশ হয়। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আমি নিজে দেখিয়াছি, এবং পুনঃপুনঃ পরীক্ষার দ্বারা তাহা আমার কাছে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে।"

ক্রুকশ বলেন—"এই যে ইন্দ্রিয়াতীত-শক্তি আমরা দেখিতে পাই, আত্মার অস্তিত্বই ইহার কারণ, এবং একমাত্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হয়।"

ইহাতে জড়বাদের মূলে সজোরে আঘাত পড়িতেছে, আত্মা বলিয়া আমাদের ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র কিছু আছে তাহা পদার্থবাদীরা স্বীকার করিতে চান না, তাঁহারা বলেন—মনই বল, আর আত্মাই বল, যাহা বল সকলি ইন্দ্রিয় সমূহের একটি কার্য্যমাত্র, সুতরাং যাহা কার্য্য তাহা কারণের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লোপ পাইবে।" এখন ইন্দ্রিয়ের নিয়মাতীত, জড় বিজ্ঞানের আয়ত্ত বহির্ভূত, যদি কোন মানসিক ঘটনা দেখা যায় তাহা হইলে ত একথা ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় উড়িয়া যায়।

এখন স্রোত ফিরিয়াছে, কেবল আমাদের দেশে নহে, ইয়োরপেও বুঝি নূতন যুগের অভ্যুদয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়াতীত মানসিক শক্তির সম্ভাবনায় পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস করিলে ইয়োরোপে তিনি হাসির পাত্র হইয়া পড়িতেন, লোকে ভাবিত তিনি তবে বিজ্ঞানের ধার কিছুই ধারেন না! এখন সে কাল নাই অল্প দিনের মধ্যে সমাজে এ সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ এখন নিজেই মানসিক শক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণে যত্নশীল হইয়া-

ছেন। এই খানে অধ্যাপক ব্যারেটের বক্তৃতা হইতে একটু স্থূল অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধটি আপাততঃ শেষ করি। তিনি বলিতেছেন—৩০বৎসর পূর্ব্বে মেশমেরিজম, টেবিল নড়া, প্রভৃতিতে বিশ্বাস দেখিলে লোকে তাহা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব বলিয়াই স্থির করিত, তার পর যখন বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে এক এক জন করিয়া স্বকীয় পরীক্ষার ফললাভ করিয়া ইহার পক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে হাস্যকর যুক্তি বাহির হইতে লাগিল। তাঁহারা তখন,হাতুড়ে বৈজ্ঞানিক, অর্দ্ধশিক্ষিত, খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করিতে জানেন না, কিম্বা রয়েল সোসাইটির ফেলো নন, যদিইবা ফেলো হইয়া থাকেন ত নেহাত দৈবক্রমে হইয়াছেন, ইত্যাদি রূপে সম্ভাষিত হইতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ শুদ্ধ ধরিয়া টান পড়িতে লাগিল—যেমন কেবল আমেরিকাতেই এ সকল ব্যাপার হয়,কিম্বা ইহা কেবল আমেরিকা বা ইংলণ্ড,কি ফ্রান্স কি ইটালি, কি রুসিয়া, কিম্বা এইরূপ কোন অর্দ্ধশিক্ষিত দেশেই হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের দেশে অর্থাৎ জর্ম্মানিতে এরূপ হয় না।” (জর্ম্মানিতে ভ্রমণকালে একজন জর্ম্মণ আমাকে এইরূপ বলিয়া ছিলেন)।

যাহা হউক সময় পরিবর্ত্তন হইয়াছে এইরূপ যুক্তি যে একেবারে লোপপাইয়াছে, তাহা যদিও মনে হয় না, তবে এখন, এইরূপ যুক্তির ফল হওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।”

হুগলির ইমাম বাড়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার।

ক্রমে বেলা হইল, মুন্না হৃদয়ের ভার হৃদয়ে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্মে উঠিয়া গেল, মসীম বাহিরে চলিয়া গেলেন। রোজ যেরূপ কাজ কর্ম্ম করে মুন্না সে দিনও সেইরূপ করিল—সন্ধ্যা হইলে রোজ যেরূপ পিতাকে বসিয়া খাওয়ায় তেমনি হাসি মুখে তাঁহার কাছে বসিয়া, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া, আদর করিয়া খাওয়াইল, হাসির মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তের জন্য কেবল মুন্না অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িতেছিল, গল্পের মাঝে মাঝে, মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল, একটি মাত্র ছোট খাট নিশ্বাস কে-জানে কেমন সহসা বাহির হইয়া পড়িতেছিল মাত্র। মুন্নার পিতা সেই হাসির ছটার মধ্যে গল্পের উচ্ছ্বাসের মধ্যে লুক্কায়িত অশ্রু জল দেখিতে পাইলেন— তিনিও অব্যক্ত ভাবে হৃদয়ে একটি যাতনা লইয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন। মুন্না নির্ব্বোধ সরলাবালা ভাবিল—তাহার পিতাকে সে আজ ফাঁকি দিয়াছে তিনি তাহার অসুখ ধরিতে পারেন নাই,—এই ভাবিয়া তাহার মন কতকটা নিশ্চিন্ত রহিল। পিতাকে খাইয়াইয়া আবার মুন্না তাহার শয়ন কক্ষের বাতায়নে আসিয়া বসিল। বিকালেই চাঁদ উঠিয়াছিল—আবার তাহা ডুবিয়া গেছে, পরপারে গাছের রাশির মধ্যে অন্ধকার ভীষণ ভাবে মূর্ত্তিমান হইয়াছে, রাশি রাশি খদ্যোতিকা মালা সেই আঁধার কায়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গা স্বপ্নমোহে মহান আকাশ, অগণ্য নক্ষত্র রাশি, আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিয়া, আহ্লাদের হাসি হাসিয়া, সে হাসি, সে স্বপ্ন বাহি

রের স্বপ্ন জগতে সত্য বলিয়া ছড়াইয়া ঘুম ঘোরে বহিয়া যাইতেছে। বালিকা মুন্না সেই নিশীথের ঘুমন্ত আঁধারময় প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তখনও মুন্না শয়ন করিতে গেল না। তৃতীয় প্রহরও যায় যায়, তখন বাহিরের নৃত্য গীত চীৎকার থামিয়া পড়িল, সলেউদ্দীনের বন্ধু বান্ধবেরা একে একে গৃহে গমন করিল, তাঁহার বিলাস মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি সেই ঘরেই নীচে মসলন্দের উপর বিশ্রাম শয়ন করিলেন। এই সময় মুন্না অতি ধীরে ধীরে সভয়ে সঙ্কোচে পা ফেলিয়া একখানি ক্ষাণ ছায়ার মত সেই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। সলেউদ্দীন অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে তাহা দেখিলেন বলিলেন "কে এ ও—"মুন্নার মুখে কথা ফুটিল না, সেই যে দুপুর বেলা হইতে মুন্না সমস্তক্ষণ ধরিয়া কিরূপে, কেমন করিয়া, স্বামীকে কি কথা বলিবে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, এখন তাহা সমস্ত ব্যর্থ হইল, একেবারে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল—প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিতে লাগিল, চোখে কেমন জল আসিতে লাগিল, মুন্না কেন যে এখানে আসিয়াছে, আসিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না,—ভাবিল ফিরিয়া যাই,—তাহাতেও যেন পা সরে না,—ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া মুন্না পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সলেউদ্দীন এ দিকে নেশার ঘোরে সপ্তম স্বর্গে উঠিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল স্বর্গের একটি ছবি বুঝি তাহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছে,—কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে উঠিতে গেলেন—পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন, চক্ষু বুজিয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, বুঝি বা ভয় হইল চোখ খুলিলে আর দেখিতে পাইবেন না। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট কথায় যাহা বলিলেন, তাহার অর্থ এই "অয়ি স্বর্গের আলোক, এস আমার হৃদয় আলোকর।"

মুন্না বুঝিল স্বামী ভুল বুঝিয়াছেন মুন্নার তখন কথা ফুটিল—ধীরে ধীরে বলিল, "আমি মুন্না"—সলেউদ্দীনের স্বর্গ হইতে রসাতলে যেন দারুণ পতন হইল,—অর্দ্ধচোখ খুলিয়া তাহার দিকে আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "মুন্‌ননা—তুমমি—ক্যা—আ ন" মুন্না কেন এখন কি বলিবে, সে যে নিজেই তাহা ভুলিয়া গেছে। এই সময় মসীম গৃহের বারান্দায় মুন্নার চোখের সমুখে একবার দাঁড়াইয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সলেউদ্দীন তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। মসীমকে দেখিয়া মুন্নার নিস্তেজ প্রাণে যেন বলে। সঞ্চার হইল, যে কথা স্বামীকে বলিতে আসিয়াছে তাহা বলিবেই বলিয়া স্থির করিল—প্রাণপণে হৃদয়ে বল আনিয়া মুন্না বলিল, "একটি কথা আছে,' সলেউদ্দীন আগেকার ভাষায় বলিলেন, "কথা ঢের শুনিয়াছি, আবার সকালে শুনিব, এখন কেন।"

সকালে তিনি যত কথা শুনিবেন তা মুন্নাই জানে, প্রায় সমস্ত রাত মজলিসে কাটাইয়া সমস্ত দিন তাহার ঘুমাইয়া কাটে, তাহার পর অপরাহ্নে উঠিয়া বেশ বিন্যাস করিয়া আবার আসরে নামেন—কথা কহার অবকাশ ত পড়িয়া আছে। মুন্না ইহা হইতে কোমল উত্তর প্রত্যাশা করে নাই, তথাপি মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তার পর স্বামীর নিকট আসিয়া একখান ছবি তাহার কাছে রাখিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, আবার মুখ বাধিয়া গেল, এত সঙ্কল্প সকল টুটিয়া পড়িল। সলেউদ্দীন কাঁপা কাঁপা হাতে ছবি উঠাইয়া লইলেন, ঢুলুঢুলু নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অমনি জগতের যত রাগ তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল, তিনি নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া আগ্নে-

কার অপেক্ষা স্পষ্ট কথায় বলিলেন, "কোথায় পাইলে ?" মুন্না ধীরে ধীরে বলিল, "মসীম কিনিয়া আনিয়াছেন।" তিনি আরো জ্বলিয়া গেলেন, তিনি জানিতেন সে ছবি একখানি মাত্র জগতে ছিল তিনি পাইয়া গিয়াছেন, সেরূপ ছবি আর যে কোথাও কিনিতে মিলিবে ইহা কক্ষনোই হইতে পারে না, তাঁহার দেয়ালের ছবি যে কেউ চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র তাঁহার সংশয় রহিল না, স্খলিত সুশ্রাব্য নানারূপ ভাষায় সকালবেলায় সেই চোরের ঘাড় ভাঙ্গিবার বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। মুন্না সাহস করিয়া অনেক বার ল যে "না তাঁহার ঘরের ছবি য় নাই, সে যেখানকার সেই খানে চাহিয়া দেখিলেই সে ছবি দেখি বেন"। কিন্তু মুন্নার কথা কে শোনে, কক্ষণ পর্য্যন্ত সে কথায় তাঁহার বিশ্বা না, শেষে একবার চোখ খুলিয়া দে ল চাহিয়া দেখিলেন সত্যই সে ছবি সেই নেই আছে। কিন্তু রাগটা তখন অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে সহজে নিভিবার নয়, বাঁকাচোরা কর্ক্কশ-স্বরে বলিলেন "তুমি কে ? এ এ ছবি দেখাও, যা—আও,—চাই না, দেখতে চাই না।"

এতক্ষণ ভাল করিয়া মুন্নার কথা ফোটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার মুন্না থামিয়া পড়িতেছিল, স্বামীর নির্দ্দয় বাক্যে হৃদয় ভেদ করিয়া রুদ্ধউৎস ফুটিয়া বাহির হইল, মুন্নার মুখ ফুটিল, মুন্নার সাহস বাড়িল, মুন্না ধীরে ধীরে বলিল 'আমি তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিতে আসি নাই। আমি দাসী, প্রভুকে আজ মিনতি করিয়া; চরণ ধরিয়া যে কথা বলিতে আসিয়াছি তাহা না বলিয়া যাইব না। একবার সংসার পানে চাহিয়া দেখ। দেখ ইচ্ছা করিয়া দিন দিন আপনার সর্ব্বনাশ কিরূপে টানিয়া আনিতেছ, আমি তাহা বই আর কিছু চাহি না। নিজের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি না। সংসারের ধনরত্নে আমি সুখী হইব না। ঈশ্বর জানেন আমি নিজের জন্য ইহাতে এক বিন্দুও ভাবি না। কিন্তু ধন না থাকিলে তোমার কি হইবে।" এক নিঃশেষে কথা গুলি বলিয়া যেন মুন্না শ্রান্ত হইয়া পড়িল, সমস্ত বল যেন তাহার নিঃশেষিত হইয়া গেল, নিস্তব্ধে ব্যগ্র ভাবে কেবল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। এই মাতালঅবস্থায় ও সকল কথা স্বামীর মাথায় প্রবেশ করিতে পারে কিনা তাহা মুন্না ভাবিল না, হয়ত বা মুন্না জীবনে স্বামীর সজ্ঞান অবস্থা দেখে নাই, সুতরাং সজ্ঞান ও অজ্ঞান অবস্থায় যে বিবেচনা শক্তির কিরূপ প্রভেদ হয় তাহাই বা সে স্পষ্ট বুঝিত না, সেইজন্যই বা এ কথা তাহার মনে উদয় হইল না। কিন্তু সলেউদ্দীনের মাথায় অতগুলা কথাই প্রবেশ করিল না, তিনি কেবল শুনিলেন—"ধন আর রত্ন, ধন আর রত্ন" কিছু পরে ভাঙ্গা কথায় বলিলেন, "জাহাঁন্নব ! ধন রত্ন যদি খোয়াইতাম অতরত্ন তোমার গায়ে কেন ? তোমার ঐ অলঙ্কার আগে যাইবে, তবে আমার ধন ফুরাইবে।"

অবসন্ন ম্রিয়মান বালিকা দারুণ আঘাতে সবল হইয়া, অশ্রুহীন নেত্রে অটলপদক্ষেপে আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট গম্ভীর স্বরে বলিল "স্বামিন্ এ অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন কি? আমার মত দুখিনীর আবার সাজ সজ্জা কি? হৃদয় শুকাইয়া যাইতেছে, বাহির সাজাইয়া কি হইবে? আমি নিজের সুখের জন্য অলঙ্কার পরিনা,—যদি ইহা দেখিতেও তোমার কষ্ট হয়, সে কষ্টটুকুও আমি তোমাকে দিতে চাহি না—নাথ। তোমার কষ্ট ঘুচাইতে আমি হৃদয় পাতিয়া রাখিয়াছি, তবে কি এ সামান্য অলঙ্কার খুলিতে আমার দুঃখ হইবে? ইহা তোমার পরে যে কাজে লাগিবে, এখনও সেই কাজে লাগুক, আমার গায়ে ইহা বৃথা পড়িয়া আছে।"

মুন্না বলিতে বলিতে অলঙ্কার গুলি স্বামীর সম্মুখে খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। সলেউদ্দীনের নেশা যেন অনেকটা ছুটিয়া গেল, তিনি অবাক হইয়া সেই তেজস্বিনী মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন, মুন্না যখন চলিয়া গেল, তাহার মনে একটি অশান্তির ভাব, আসিয়া পড়িল। কিন্তু পারস্য রাজবংশীয় সলেউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ ভাব হওয়া বিষম দুর্ব্বলতা, তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া আর দু এক বোতল ম   ানিতে বলিলেন।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সম   াচনা।

বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য প্রণালী।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকাল অ্যাসিষ্টাণ্ট শ্রীঅমূল্যনারায়ণ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে বিবাহ, সন্তান-উৎপাদন ইন্দ্রিয়-সংযমন, স্ত্রীলোকদিগের ব্যাধি প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় পর্য্যালোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা একটু অপরিস্ফুট হইলেও গ্রন্থখানি অতি উৎকৃষ্ট, বঙ্গীয় যুবক যুবতী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকার অনেক বিষয় যেরূপে বুঝিয়া, যেরূপ ভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়, পুস্তকখানি পড়িলে গ্রন্থকারের প্রতি ভক্তি জন্মে। গ্রন্থকারের পরামর্শ সকলে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য সফল করুন এই আমাদের আন্তরিক বাসনা।

শরৎকুমারী, অথবা (আদর্শ বঙ্গ মহিলা।)

শরৎকুমারী লেখকের নিকট আদর্শ-মহিলা হইতে পারেন—কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাঁর আদর্শ-চরিত্র খুঁজিয়া পাইলাম না।

ক্রমোত্থান—পুষ্প।

বর্ত্তমান সংসার যে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঈদৃশ সুসম্বদ্ধ জগদাকারে সমুৎপন্ন হয় নাই—ধীরপদে অগণিতকাল অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের সমুন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে ইহা এক্ষণে একটি অবিনাশী বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে ক্রমোত্থান যেরূপ অচল অথচ কঠোর সত্য, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেও ক্রমোত্থান একটি অমোঘ ও অনতিক্রমণীয় নিয়ম। দৃশ্যমান জগতের কোন একটি পদার্থ লইয়া সাদৃশ্যের শৃঙ্খলা যোজনা করিতে করিতে আদিম কালের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানের পরিস্ফুট, সম্বদ্ধাবয়ব, জটিলবিকাশ-সমন্বিত পদার্থটি ভূতকালের অপরিস্ফুট, অসম্বদ্ধ ও সরলবিকাশ-বিশিষ্ট পদার্থটির সঙ্গে সমসূত্রে বদ্ধ। বর্ত্তমানের এই দৃশ্যতঃ বিভিন্ন আকারের ও ধরণের বস্তুটি আদিমকালীন অযত্ন-প্রসূত, আদিমকালোচিত শোভাশালী স্বতন্ত্র আকারের সেই জাতীয় বস্তুর সঙ্গে একই রক্তমাংসে বিজড়িত। কালের দূরত্ব, অবস্থার শাসন যদিও আকারগত ও স্বভাবগত পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে, তথাপি সূক্ষ্মদর্শীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে মূলগত সাদৃশ্য অপনয়ন করিতে পারে নাই। অক্ষয় কীর্ত্তিবান ডারউইন অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করিবার পূর্ব্বেও তদীয় পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকেরা এই সাদৃশ্য শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই জীবরাজ্য ও উদ্ভিদ রাজ্যের শ্রেণীভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা মহাত্মা ডারউইনের প্রদর্শিত প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন বাদের আলোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি রহস্যান্ধকারজড়িত প্রকৃতির মধ্যে এই দৃশ্যতঃ সাদৃশ্য-শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়াই অনেক বিষয়ে এতদূর অভ্রান্তভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য বর্ত্তমানে তাঁহাদের প্রখর ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

উদ্ভিদরাজ্যেই হউক বা প্রাণীরাজ্যেই হউক, এই শ্রেণীবিভাগ একটি অতি রমণীয় অধ্যেতব্য বিষয়। এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি ও বংশের উন্নতিমূলক অভ্যুদয়ের পরিবর্ত্তন সম্ভূত সোপান পরম্পরার অনুসন্ধান করা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়তম অংশ। সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই উভয় বিষয়েই কতক পরিমাণে অভিজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ক্রমশ জ্ঞানের সীমাকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। এক্ষণে একজন প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পান কি কি পথ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের প্রাণী-

রাজ্য বা উদ্ভিদরাজ্য সমুদ্ভূত হইল। কেমন একটি অসীম শৃঙ্খলে অতি আদিম কাল হইতে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অদৃশ্য ভাবে উদ্ভিদ ও জীব শ্রেণী বর্ত্তমানের অভ্যন্তর দিয়া অপ্রতিহত গতিতে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির সমুদায় পদার্থই ক্রমোত্থানের অধীন। ইহার অপরিহার্য্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা কিম্বা আণুবীক্ষণিক একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু পর্য্যন্ত জগতে আসিতে পারে নাই। তবে আমাদের চিত্তবিমোহনকারী কোমল ফুল এ সাধারণ বন্ধনীর বহির্ভূত হইবে কেন? কোন অলৌকিক ক্রিয়াবলে অথবা প্রকৃতির অতীত কোন অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে পুষ্প বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া অনুপম লাবণ্য-ছটায় সুবিমল সুগন্ধের বিস্তারে এবং অতুল্য কোমলতা ও স্নিগ্ধতার আধার হইয়া জন-মন-হরণ করিবার জন্য সাম্যপূর্ণ প্রকৃতির একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যবস্তুরূপে আনীত হয় নাই। যে অনতিক্রমণীয় "বিবর্ত্তন-বিকাশ"-চক্র জীবরাজ্য এবং উদ্ভিদ রাজ্য শাসন করিতেছে সেই ক্রমোত্থানের নিয়ম-প্রণালী পুষ্পরাজ্যের মধ্যেও প্রচলিত। সেই বিবর্ত্তন বিকাশ ইহাদেরও ব্যবস্থাপক। পুষ্পস্থ তরুলতার কোন একটি জাতি (genus) অবলম্বন করিয়া তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বংশের (species) তরুলতার পুষ্প বিকাশ আলোচনা করিলে আমরা অনেকগুলি প্রাকৃতিক বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। এই বিশেষ নিয়মগুলি পুষ্প রাজ্যের মধ্যেই বদ্ধ। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা সেই নিয়মগুলির আলোচনা করিব।

ক্রম-বিকাশের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে আদৌ অতি সামান্য, সরল, অসম্বদ্ধ আকার হইতে উহা যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, ক্রমে ততই, জটিলতাময়-বিকাশে পরিণত হয়। অশক্ত হইতে দৃঢ়; সদৃশ হইতে অসদৃশ; স্বাতন্ত্র্য হইতে সংযোগ; সম হইতে বিষম;—ইহাই ক্রমোত্থানের মূল নিয়ম। আরম্ভকালে, সকল বস্তুর গঠনই সাদাসিদে মোটামুটি ধরণের। যতই সময় যায়, যতই অবস্থার পর অবস্থান্তর আসিয়া পড়ে, ততই অবস্থানুসারে মঙ্গলকর-আকারগত জটিল পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। কুম্ভকার যেমন এককালেই সুরঞ্জিত, সুগঠিত, সুদৃশ্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে পারে না;—প্রথমে প্রতিমাকে 'একমেটে', তাহার পর দুমেটে, তদনন্তর কৌশলপূর্ণ তুলিকা বিন্যাসে সে প্রতিমাকে সুন্দর মোহিনী মূর্ত্তিতে পরিণত করে, প্রকৃতি কুম্ভকার তাহার নিজের অগণিত প্রতিমা গড়িবার সময় ঠিক এই রূপ নিয়ম অবলম্বন করে। ক্রমোত্থানের অমোঘ ধর্ম্মই এই। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সকল প্রাকৃতিক পদার্থই একমেটে অবস্থায় ছিল। ঈদৃশ একমেটে অর্থাৎ আদিম পদার্থের প্রধান প্রধান অংশগুলি অতি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে অবস্থান করে। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি অসম্পূর্ণ বা ডৌল বিহীন হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক অংশটি অতি পরিষ্কাররূপে অথচ সহজে সমুদয় হইতে

বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমতার কারণ, অংশ-সংযোগ অগ্রগামী অবস্থার চিহ্ন। কোন জাতীয় উদ্ভিদ বা জন্তুর অধস্তন স্তর হইতে যতই উপরের দিকে অগ্রসর হই, ততই অংশ-স্বাতন্ত্র্যের অভাব পরিদর্শন করি। একটি অঙ্গ হয়ত অপরটির সহিত মিশিয়া যাইয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। হয়ত একটি অঙ্গ বিকাশই পায় নাই। হয়ত একটি এমনি রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। ঈদৃশ আকার পরিবর্ত্তনে নানারূপ প্রকারভেদ (Varieties) সমুদ্ভূত হয়। এবং এই সমুদয় কালে আদিম বনিয়াদ হইতে এত স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে যে সহজ দৃষ্টিতে বা সহজ বুদ্ধিতে আদিতম্ বংশ এবং দূরতম প্রকারভেদে যে কোন মূলগত সাদৃশ্য আছে ইহা বিশ্বাস হয় না। ক্রমোত্থানের এই মূল নিয়ম সম্মুখে রাখিয়া আমরা এক্ষণে পুষ্পরাজ্যের বিশেষ নিয়মগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বীজের অন্তর্গত সাদৃশ্যানুসারে উদ্ভিদ-বেত্তারা সমুদয় পুষ্পময় তরুলতাকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া থাকেন; এক-বীজ-পত্রক ও দ্বি-বীজ পত্রক * এক-বীজ-পত্রক উদ্ভিদ শ্রেণীর পুষ্পের প্রত্যেক অঙ্গ তিন সংখ্যা বাচক, অর্থাৎ প্রত্যেক পুষ্পের তিনটি বৃতি, (ফুলের রঙ্গিন দলগুলির নীচে পাতার ন্যায় সবুজ কতকগুলি যে দল থাকে তাহাকেই বৃতি বলা হইল) তিনটি দল, তিন বা তিনের গুণনীয়ক কোন সংখ্যার পুং-কেসর ও স্ত্রীকেসর ক্রমাংশে আবর্ত্তাকারে অবস্থান করে। দ্বি-বীজ পত্রক পুষ্প পঞ্চম সংখ্যাবাচক, অর্থাৎ ইহার পাঁচটি বৃতি, পাঁচটি দল, পাঁচটি পুংকেসর পাঁচটি স্ত্রী-কেসর। উভয় শ্রেণীর পুষ্পসম্বন্ধে ইহাই সাধারণ নিয়ম, অন্ততঃ প্রত্যেক শ্রেণীর আদিমতম ধরণের পুষ্পে ইহাই পরিলক্ষিত হয়। কোন একটি জাতির অন্তর্ভূত অগণ্য বংশ এবং প্রকারের মধ্যে কোনটি আদিম ইহা মোটামুটি জানিতে হইলে উপরিউক্ত সংখ্যার পরীক্ষা প্রয়োগ করিতে হয়। অর্থাৎ যে বংশের ফুলে আবর্ত্তগুলির সংখ্যা-সাদৃশ্য পরস্পরের সহিত মিলিয়া যায়, যাহার কোন অংশ লুপ্ত বা সংযুক্ত হয় নাই, তাহাই অনেকটা আদিম। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাক।

মনে কর দ্বিবীজপত্রক দুটি ফুলের মধ্যে একটির সমায়তনের পাঁচটি হরিৎ বৃতি, উজ্জ্বল বর্ণের পাঁচটি পাবড়ি, পাঁচটি ক-রিয়া দুই কি তিন বা ততোধিক থাক পুং-কেসর এবং উহাদের মধ্যে থাকে থাকে অনেকগুলি (ঠিক পাঁচের গুণনীয়ক কোন

* যে সকল বীজের উপরস্থ কঠিন আবরণের অর্থাৎ খোসার অভ্যন্তরের শাঁস-টুকু খোসা ছাড়ান গমের মত অবিভক্ত থাকে তাহারাই এক বীজ-পত্রক। যে গুলির শাঁসটুকু ছোলা কলাইয়ের মত দুই অংশে বিভক্ত তাহারাই দ্বি-বীজ পত্রক। প্রথম অঙ্কুরণ কালে এই শাঁসই পত্ররূপে পরিণত হয়, এই জন্য ইহাকে বীজ-পত্র স্বরূপ বিবেচনা করা হয়। গম এবং তৎ-সদৃশ সমুদয় বীজ এক-বীজ-পত্রক; আর ছোলার ন্যায় বিভক্ত শাঁস যুক্ত বীজ মাত্রই দ্বিবীজ-পত্রক।

সংখ্যার না হইতেও পারে) স্ত্রী-কেসর বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল আবর্ত্তের সকল অংশগুলিই পৃথক রূপে ও অতি স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কোন বিভাগের কোন অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশ বা অবিকাশ, লোপ বা সম্মিলন হয় নাই। আর অপরটির হয়ত পাঁচটি হরিৎ পাবড়ি অসমান, কিম্বা হয়ত পাঁচটির স্থলে চারটি হইয়াছে, হয়ত বৃতি ও পাবড়ির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দুই একপ্রকারের হইয়া গিয়াছে। কিম্বা হয়ত পুংকেসর ও স্ত্রীকেসর সম্বন্ধে অপর কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এরূপ স্থলে শেষোক্ত পুষ্পটি প্রথমোক্তটি অপেক্ষা অনেকটা যে অগ্রগামী অবস্থায় তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। কেননা অংশ-স্বাতন্ত্র্য আদিমত্বের একটি প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু কোন একটি ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিভাগ গুলি পৃথক, কিম্বা সমায়তনের হইলেই যে সে ফুলটি আদিমতম বলিয়া ঠিক করিয়া লইব, তাহা হইতে পারে না। পুষ্পের আরো অনেকগুলি বিষয় দেখিবার আছে। একটি যেমন—বর্ণ। নানা বর্ণের ফুল আমাদের নয়ন মনকে সৌন্দর্য্যের মোহনে মোহিত করে। আর আমরা জানি পুষ্পের বর্ণ বিন্যাস আমাদের জন্য নয়। পুষ্পের নিজের বিশেষ উপকারের জন্য। সে উপকার কি তাহাও আমরা জানি। শ্যামল ও হরিৎ উদ্ভিদ্‌রাজির বংশরক্ষা। পাঠক, ফুলের উদ্দেশ্য বড় সামান্য নয়। পক্ব, পরিপুষ্ট বীজোৎপাদন করিয়া প্রকৃতির একার্দ্ধকে সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে। আমরা ইহাও জানি পুষ্প কেমন সুন্দর উপায়ে সেই মহৎব্রত সাধন করিয়া যাইতেছে। যদি তোমার হাতের গোলাপটি অমন গোলাপি বর্ণের কোমলতা ও স্নিগ্ধতাময় মনমোহনকারী গোলাপ না হইত; তুমি কি অত আদর করিয়া গোলাপকে বুকের উপর রাখিতে ইচ্ছা করিতে। কৈ তুমি ত একটি যেমন তেমন ফুলকে ওরূপ আদর কর না। যখন তোমার আমার বংশের পৃথিবীতে সূত্রপাত হয় নাই, তাহার হয়ত অনেক, অগণিত কাল পূর্ব্বে ফুল বর্ণ সুগন্ধ ও কোমলতা বিস্তার করিতে শিখিয়াছে। যে সকল অতিথিরা সেই প্রাচীন কালে পুষ্পদের দ্বারে আসিত এবং যাহারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইবার সময় অজ্ঞাতসারে একের রেণু লইয়া যাইয়া অপরকে দিয়া আসিত, * সেই উপকারী অতিথিদিগকে অধিকতর রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য পুষ্প অতুলনীয় নানাবিধ বর্ণের বিকাশ আরম্ভ করিয়াছে। তুমি হয়ত লাল রং ভালবাস; আমি সাদা রং ভালবাসি; তৃতীয় ব্যক্তি হয়ত ঈষৎ পীত বর্ণ পসন্দ করেন। এইরূপ হয়ত আমাদের প্রত্যেকেরই চক্ষের রুচি স্বতন্ত্র। সেইরূপ, যে সমুদয়

---

* পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরে পড়িলে ফুলের ভ্রূণ জন্মে। কীট পতঙ্গগণ ফুলে ফুলে কেশরে কেশরে উড়িয়া উড়িয়া পুংকেশরের রেণু স্ত্রীকেশরে আনিয়া কিরূপে পুষ্পের বংশবর্দ্ধন করে তাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীর গোলাপ নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতিথি পতঙ্গ পুষ্পরাজ্যে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহাদেরও সকলের রুচি, সমান নয়। কেহ কেহ খুব গাঢ় লোহিত রংয়ের পক্ষপাতী, কেহবা পাটল রং খুব পসন্দ করে, কেহ বা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ ভালবাসে, কেহ বা ধবধপে সাদা রংয়ের ফুল ভিন্ন অপর কোন বর্ণের দিকে ফিরিয়া চাহে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই পুষ্পকে নানা রকমের বর্ণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। নতুবা বংশ রক্ষা হয় না। গুরুব্রত সাধন করা হয় না। কীট পতঙ্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্যই পুষ্পরাজি বিচিত্র নানাবর্ণের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আছে। যে জাতীয় কীটপতঙ্গ দ্বারা যে বংশের ফুল নিষেকিত হয়, সেই কীট পতঙ্গের রুচি অনুসারে ফুল আপনাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। যদি ফুল অভ্যাগত উপকারী পতঙ্গের রুচি অনুসারে আপনার বেশ ভূষা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই জাতীয় তরুলতা অচিরে লুপ্ত-চিহ্ন হইবে। ভয়ানক সর্ব্বনাশের বিষয়! তাই ফুলেরা প্রাণপণ যত্নে কীট পতঙ্গের রুচি অনুসারে নানাবিধ বর্ণে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করে। কেবল বর্ণ-বিন্যাস নয়, বংশ বর্দ্ধনের সহায়তাকারীদিগের জন্য অনেক ফুল অনেক প্রকারের আকারগত পরিবর্ত্তনও সহ্য করিয়াছে। প্রকৃতির অভ্যন্তরে এমনি জীবন ধারণার্থ মহা সংগ্রাম অবিরাম চলিতেছে।

আমরা এক্ষণে দেখিতেছি সময়ে পুষ্পের গঠন-গত বা আকারগত পরিবর্ত্তন যেমন সংঘটিত হয়, তেমনি পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্যও ঘটিয়া থাকে। পুষ্পের ক্রমোত্থান আলোচনা করিতে গেলে পুষ্পের বর্ণবিন্যাসও একটি বিচার্য্য বিষয়। সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিতগণের সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি কোন প্রকারের বর্ণ আদিমত্ব-পরিজ্ঞাপক। সে বর্ণ সোণালি পীত রং। এককালে সমুদয় পুষ্পস্থ তরু, লতার সতেজ শাখায় সোণালি পীতবর্ণের ফুলই শোভা পাইত। এখন কোন উদ্যানে প্রবেশ করিলেই কত বিবিধ বর্ণের পুষ্প নয়ন-পথে পতিত হয়। কিন্তু তৎকালে এক পীত বর্ণ ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নয়নকে ভুলাইবার ছিল না। পীতই যে কেন আদিমতম রং হইল, প্রকৃতির তুলি কেন যে তখন অপর কোন রং ফলাইতে পারে নাই সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। প্রকৃতির অনেক খেলাই রহস্যময়!

সোণালি-পীত যেমন আদিমতম রং, প্রগাঢ়-নীল অতি অগ্রগামী অবস্থার রং। যদি কোন একটি জাতির গোড়ার বংশ অবলম্বন করিয়া তাহার অধুনাতন কোন বংশের বা প্রকারের ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখি, এমন অধুনাতন বংশ বা প্রকার যাহার ফুল নীল বর্ণ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে আদিম কালের সেই সোণালি পীত রং নিষেক-সহায়ক কীট পতঙ্গদের অনুরোধে যথাক্রমে শুভ্র, পাটল, ও বেগুণে রঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে নীলবর্ণে

পরিণত হইয়াছে। উজ্জলপীত উদ্ভিদরাজ্যে ক্রমোত্থানের প্রথমাবস্থার লক্ষণ; উজ্জ্বল-নীল ক্রমোত্থানের সমুন্নতাবস্থার লক্ষণ। কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে পুষ্পের বর্ণ-বৈচিত্র্য সমধিক পরিমাণে নিসেকসহায়ক কীট পতঙ্গদের রুচির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির মধ্যে এমন অনেক বংশের অভাব নাই যাহারা হয়ত বর্ণ সম্বন্ধে সেই আদিমতম সোণালি পীত বর্ণই বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু হয়ত অপরাপর বিষয়ে ক্রমোত্থানের সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সুনীল পুষ্প অপেক্ষাকৃত বিরল। অতি অল্প ৩ম পুষ্পই ঈদৃশ উচ্চতম অবস্থা পরিজ্ঞাপক নীলবর্ণ উদ্ভাবন করিয়া থাকে।

পুষ্পের বর্ণের মতন লিঙ্গভেদও আর একটি বিষয়। পুষ্প-ক্রমবিকাশে ইহাও একটি বিবেচ্য স্থল। কেন না আমরা দেখিতে পাই সকল ফুল এক লিঙ্গের নহে। কোনটি পুং কোনটি স্ত্রী কোনটি বা পুং স্ত্রী-উভয় লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক। যদি কোন একটি ফুলের সকল অঙ্গ অথবা অঙ্গের সকল বিভাগ অযুক্ত, স্বতন্ত্র, সমাকার ও সম-সংখ্যক হয় এবং যদি পুষ্পটি সোণালি পীত বর্ণেরও হয়, তাহা হইলেই সে ফুলটিকে আদিমতম বংশীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। ভিন্ন অঙ্গের অংশ নিচয়ের স্বাতন্ত্র্য যেমন আদিমত্বের একটি চিহ্ন, তেমনি লিঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ক্রমোত্থানের উচ্চতম অবস্থার লক্ষণ। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতন সাদৃশ্যই একমাত্র পথ চিহ্ন, যাহা অবলম্বন করিয়া তত্ত্বান্বেষীরা অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন তত্ত্বের আকর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। জীবরাজ্যে আমরা দেখি স্বতন্ত্র লিঙ্গ স্বতন্ত্র আধারে। উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত প্রাণী-রাজ্যে লিঙ্গ-স্বাতন্ত্র্য প্রবলতম ও প্রধানতম অবস্থা। অনুন্নত জীবে উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন একটি প্রধান লক্ষণ। আবার যাহারা আরো অনুন্নত তাহাদের মধ্যে লিঙ্গাদির ন্যায় জটিলতর ইন্দ্রিয়ের কোন চিহ্নই নাই। ঈদৃশ নিম্নতম শ্রেণীর জীবরাজ্যভুক্ত কীটাণুরা, পুনরুৎপাদনের সময় হইলে আপনারা দ্বিধা হইয়া একটির স্থলে দুইটি জীবাণু উদ্ভাবন করিয়া স্ব স্ব জীবন-লীলা সম্বরণ করে। ইহাদের বংশ বৃদ্ধি এইরূপেই হয়; জনন-ইন্দ্রিয়ের সহায়তার আবশ্যক করে না। কিন্তু জীব-রাজ্যের ঈদৃশ † নিম্নতম শ্রেণীর জীবের ন্যায় উদ্ভিদ আমরা দেখিতে পাই না। অন্ততঃ পুষ্পস্থ তরু, লতা, গুল্মের মধ্যে এমন কোন জাতি বা বংশ বা এমন কোন দূরতম একক প্রকার ভেদও নাই যাহাকে কোন প্রকারের জননেন্দ্রিয় বিহীন উল্লিখিত কীটাণুদের সদৃশ উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তবে অপুষ্পস্থ উদ্ভিদের পুনরুৎপাদন আলোচনা করিলে যদি উহার সদৃশ কোন প্রকারের উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা এক্ষণে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

† এরূপ উদ্ভিদ অনেক আছে ইহারা কীটাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র আকৃতির। যেমন, তাড়ির মধ্যে যে উদ্ভিদ থাকে।

জীবরাজ্যের ন্যায় উদ্ভিদরাজ্যেও একাধারে উভয় লিঙ্গের একত্র সংঘটন নিম্নতর অবস্থা পরিজ্ঞাপক। আদৌ সমুদয় ফুলই উভয়লিঙ্গ ছিল। মূল বংশ হইতে যতই শাখাবংশের উদ্ভাবন হইতে লাগিল, ততই ক্রমে ক্রমে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় আরম্ভ হইল। উভয়-লিঙ্গ হইতে প্রথম পরিবর্ত্তিত অবস্থা—একশিষফুলের কতকগুলি পুং কতক গুলি স্ত্রীং এবং কতকগুলি বা উভয়লিঙ্গ। তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় এক-শাখাতেই কোথাও বা একসঙ্গে কতক-গুলি পুং ফুল স্বতন্ত্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়, কোথাও বা দু-চারটি স্ত্রী ফুল আলাদা ফোটে কোথাও বা কতকগুলি উভয়লিঙ্গ ফুল ফুটিয়া থাকে। ক্রমে যখন আরো উন্নতঅবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন একই গাছের বিভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ পরি-জ্ঞাপক ফুল পুষ্পিত হয়। ইহাদের উভয়-লিঙ্গ-ফুল অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়ে। ক্রমশ পার্থক্যের দিকে গতি এত প্রবল হয় যে স্বতন্ত্র গাছে স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্প উৎপন্ন হয়। ঈদৃশ বৃক্ষ, লতা উদ্ভিদরাজ্যের অধিকতম উন্নত ও অগ্রগামী অবস্থাপরিচায়ক। আমাদের তাল, খেজুর এই শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ বৃক্ষ-লতার মধ্যে সমধিক উচ্চ শ্রেণীর; উদ্ভিদ রাজ্যে ইহারা এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে ইহাদের একই বৃক্ষে আর দুইলিঙ্গের ফুল মুকুলিত হয় না। কতকগুলি তালগাছে কেবল পুংফুলই উৎপন্ন হয়; আর কতকগুলিতে কেবল স্ত্রী ফুলই ফুটে। বোধ হয় আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের অনেকে অবগত নহেন যে, সচরাচর যাহাদিগকে চলিত কথায় বাঁঝা তালগাছ বলে সেইগুলি কেবল পুংফুল উৎপন্ন করে। আর যেগুলি ফলবান্ বৃক্ষ সেগুলিতেই স্ত্রী ফুল হয়। বাঁঝা গাছগুলিতে স্ত্রীফুল বা উভয়লিঙ্গ ফুল জন্মায় নাই বলিয়াই উহাদের ফল দেখা যায় না। এবং তজ্জন্যই উহারা বন্ধ্যা। উদ্ভিদরাজ্যের অতি অল্পঅংশই তাল বা খেজুরের সমান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি কোন জাতীয় পুষ্প আদিমতম ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখা চাই যে ইহার অঙ্গগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ অঙ্গ বা অঙ্গের কোন বিশেষ বিভাগ অপ্রকাশিত রহিয়াছে কি না; অথবা কোন অঙ্গ বা অঙ্গের কোন অংশ অপর কোন অঙ্গ বা কোন অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে কি না। যদি কোন অঙ্গের বা অঙ্গের কোন অংশের বিকাশ রুদ্ধ না হইয়া থাকে, যদি কোন অঙ্গ বা তাহার কোন অংশ অপর অঙ্গের সহিত অথবা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলেই আমরা স্থির করিব সেই ফুলটি অনেকটা আদিম বংশের। তারপর যদি দেখি সেই ফুলটি উজ্জল পীতবর্ণের অথবা অপর কোন রঙ্গের হইলেও যদি পাবড়ির কোন স্থানে এখনও পর্য্যন্ত পীতের আভা বিদ্যমান থাকে এবং ফুলটি উভয়লিঙ্গ পরিজ্ঞাপক কেসর সমন্বিত হয়; তাহা হইলে বুঝিব আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত অনেকটা ঠিক। কিন্তু এই সকল প্রমাণ হইতেই আমরা একবারে বলিতে

পারি না যে ইহাই আদিমতম বংশের ফুল। আরো একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে।—পুষ্পের গর্ভাধারের (Carpels) সংখ্যা। প্রথমাবস্থায় সকল ফুলেই অনেকগুলি পুং-কেসরের মতন অনেকগুলি স্ত্রীকেসর স্ব স্ব গর্ভ-কোষোপরি সমুন্নত হইয়া পৃথক পৃথক ভাবে পুং কেসরাবর্ত্ত মধ্যে বিরাজ করে। প্রত্যেক গর্ভকোষ এক একটি বীজের আধারস্থান হয়; একের অধিক বীজ কোন গর্ভকোষেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগ্রগামী অবস্থাপন্ন পুষ্পে আমরা দেখি যে এই স্বতন্ত্র, বহুল, গর্ভকোষগুলি একে একে মিলিয়া একটি যুক্ত গর্ভাধার হইয়াছে। এবং এই যুক্ত গর্ভাধারে অনেকগুলি বীজ একত্রে পরিপুষ্ট হয়। আদিমকালে একক বীজ-বিশিষ্ট বহুল অসংযুক্ত গর্ভাধার, আর অগ্রগামী অবস্থায় বহু-বীজ সমন্বিত একটি যুক্ত গর্ভকোষ। উভয় প্রকারের গর্ভকোষ একই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালের একক-বীজ বিশিষ্ট গর্ভকোষের সংখ্যার আধিক্য জন্য একটি ফুলেই অনেকগুলি বিচি জন্মাইত। আর অগ্রগামী অবস্থাপন্ন ফুলের যুক্ত গর্ভাধারে এককালে অনেকগুলি বীজই পরিপক্ক হয়। সুতরাং ঈদৃশ পরিবর্ত্তনে পুষ্প মূল উদ্দেশ্য হইতে দূরে যাইয়া পড়ে নাই। তবে এরূপ পরিবর্ত্তন আনিবার পুষ্পের কি আবশ্যক ছিল জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমরা প্রথমে মনে করিয়া লইতে পারি নিশ্চয়ই ঈদৃশ পরিবর্ত্তন পুষ্পের পক্ষে মঙ্গলকর। নতুবা কখনই এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইত না। বিবর্ত্তন-বিকাশের নিয়মের আদি ও পরিণাম মঙ্গল উদ্দেশ্য-পূর্ণ। এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরিবর্ত্তনে পুষ্পের কি হিত সাধিত হইয়াছে। পাঠক, যদি একটি যুক্ত গর্ভকোষ বিশিষ্ট ফুল লইয়া দেখ, দেখিবে একদিকে যেমন উহার স্বতন্ত্র গর্ভকোষগুলি পরস্পর মিলিয়া যাইয়া একটি যুক্ত-গর্ভ-কোষ উৎপন্ন হইয়াছে তেমনি বহুল স্ত্রী কেশরের স্থানে যুক্ত গর্ভ-কোষোপরি একটি মাত্র স্ত্রী-কেসর বিদ্যমান। এইরূপ পরিবর্ত্তন যে বিশেষ সদ্বিবেচনা মূলক তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন গর্ভকোষগুলি স্বতন্ত্র ও অসংলগ্ন ভাবে স্ব স্ব কেসর উন্নত করিয়া অন্তর-আবর্ত্ত-পূর্ণ করিয়া থাকিত, তখন অনেক সময়ে সমুদয় কোষগুলি বীজোৎপাদক হইতে পারিত না। পুষ্প-রেণু বিজড়িত পতঙ্গ পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিবার সময় প্রত্যেক ফুলের সমুদয় স্ত্রী-কেসরগুলিকে নিষেকিত করিতে পারিত না। যে ব্যস্ততার সহিত পতঙ্গেরা, মধুমক্ষিকারা পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ধাবিত হয়, তাহাতে কি কখন সুসাবধানে প্রত্যেক ফুলের অতগুলি স্ত্রীকেসরকে এককালে রেণুস্পৃষ্ট করা সম্ভব? এই জন্য অনেক কোষস্থ বীজ অপূর্ণ অপক্ক থাকিত। প্রয়োজনমত বীজ পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হইত না। কাজে কাজেই পুষ্প এমন উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল যদ্দ্বারা নিষেক-সহায়ক কীটদিগের সামান্যতম সাহায্যেই বহুল বীজকে পরি-

পক্ক ও পরিপুষ্ট অবস্থায় আনয়ন করা যায়। একটিমাত্র স্ত্রীকেসররেণু মর্দ্দিত হইলেই যুক্ত-গর্ভ কোষস্থ বহুল বীজের পরিপক্ক হওন অনায়াসসিদ্ধ ও সম্ভবপর হয়, ইহা অপেক্ষা সহজতর অথচ প্রচুর বিচক্ষণতাপূর্ণ পন্থা আর কি সম্ভব? তবে দেখ এ পরিবর্ত্তন পুষ্পের সম্বন্ধে কতদূর মঙ্গলকর।

আলোচনা করিতে করিতে আমরা পুষ্পরাজ্যের ব্যবস্থাপ্রণালীর প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান অংশ শেষ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমরা পুষ্পের ক্রমোত্থানের সমুদয় সোপানগুলিই একে একে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। পুষ্পের ক্রমোত্থানের এখনও অনেক বিষয় জানিবার অবশিষ্ট আছে। হয়ত উত্থান-মার্গের এমন অনেক সোপান রহিয়াছে যাহা এখনও পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। আমরা উপরে যে চারিটি নিয়মের উল্লেখ করিয়া আসিলাম সেগুলি কেবল সাধারণ নিয়ম। প্রধানতঃ ঐ চারিটি নিয়মই পরিদর্শন পথে পতিত হয়। আমরা যখন আরো গভীরতর মনোযোগের সহিত এবং গভীরতর অনুরাগ ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্রতম পদার্থ এই পুষ্পের—ক্রমোত্থান আলোচনা করিতে পারিব, তখন সম্ভবতঃ আরো অনেক নিয়মের বিকাশ দেখিতে পাইব। প্রাকৃতিক প্রত্যেক দৃশ্য বস্তুই প্রহেলিকাময়। এবং প্রহেলিকা-রাজি পরিপূরিত বিশ্ব-রঙ্গভূমিতে ক্ষুদ্র, অসহায়, মানবজ্ঞান প্রকৃতির হস্তে একটি সামান্যতম ক্রীড়াবস্তু-স্বরূপ।

উপসংহার করিবার পূর্ব্বে আমরা একবার প্রশস্ত ক্ষেত্রে আদিমতম ধরণের অসংযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট, অরুদ্ধ ও পূর্ণ বিকাশময়, একক বীজধানী বহুল-গর্ভকোষসমন্বিত, উভয় লিঙ্গের উজ্জ্বল পীতবর্ণের ফুলকে প্রথম স্তরে রাখি। আর সর্ব্বোপরি স্তরে লুপ্ত বা রুদ্ধ-অঙ্গ, ও যুক্ত-অংশ সমন্বিত, বহুবীজধারী যুক্ত-গর্ভকোষ বিশিষ্ট, সমুজ্জ্বল নীল বর্ণের, স্বতন্ত্র লিঙ্গের পুষ্পকে স্থাপন করি, এবং মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য স্তর, নানা-বর্ণের বিচিত্র গঠনের বিবিধ অবস্থাপন্ন পুষ্পরাশি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিষ্পন্দভাবে কল্পনা করি সেই প্রথম স্তর কত কত আদিম কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কত অসংখ্য অসংখ্য বৎসর, যুগ, শতাব্দী উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই স্তর উপর্য্যুপরি ক্রমোত্থানের অগণ্য সোপান উত্থান করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে! স্থান ও কালভেদে, অবস্থার তারতম্যানুসারে জল বায়ু ও শীতোত্তাপের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা হেতু ক্রম-বিকাশের কঠোর শাসনে কত বৈলক্ষণ্য, কত পরিবর্ত্তন কত বিপর্য্যয় সহ্য করিয়া উহা অলক্ষিত ভাবে এক সোপান হইতে পরবর্ত্তী সোপানে পৌঁছিতেছে! উহাদের আকারগত গঠনগত গুণ ও ধর্ম্মগত কত প্রকারের বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। আর সেই সমুদয় সোপান-রাজির মধ্যে পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক গতিতে, ক্রমবিকাশের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে বিধাতার অপ-

রিমেয় জ্ঞানের বিচিত্র লীলা প্রতিভাসিত। অবর্ণনীয় শোভাসৌন্দর্য্য, বর্ণ-বৈচিত্র্য-সম্পন্ন, এবং অসংখ্য নিত্য পরিবর্ত্তন-সম্ভূত প্রকৃতির এই সুবিশাল পুষ্পরাজি বিধাতার অনন্ত বিশ্বভাণ্ডারের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ; অনন্তজ্ঞানের একটি সামান্যতম বিকাশ মাত্র। পাঠক! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পুষ্পাক্রমবিকাশের এই কাল্পনিক রমণীয়-দৃশ্য একবার নিরীক্ষণ কর।

শ্রীপশুপতিচরণ রায়।

হুগলীর ইমামবাড়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ যাত্রা।

মতাহার আগা হুগলী সহরের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। ইঁহার আর কেহ নাই, একমাত্র কন্যারত্ন মুন্নাই ইঁহার সংসারের বন্ধন, হৃদয়ের সম্বল। অতি শৈশবে কন্যা মাতৃহীনা হইয়াছে সেই অবধি মতাহার আর বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিলে মুন্না পাছে পর হইয়া যায়—মুন্না তাঁহার বড় আদরের রত্ন, যতনের ধন। ক্রমে মুন্না যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার শৈশবের রূপগুণ বয়সের সহিত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, স্নেহময় পিতার মন ততই স্নেহের গর্ব্বে পূরিয়া উঠিতে লাগিল, আনন্দের উচ্ছ্বাসে উথলিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই আহ্লাদের মধ্যেও এমন রূপগুণসম্পন্ন স্বর্গীয় রত্ন কাহাকে সমর্পণ করিবেন—কাহার কণ্ঠে ইহা শোভমানা হইবে, এই এক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কত পাত্র আসিতে যাইতে লাগিল—কোনটিই আর তাঁহার মনের মত হয় না, হুগলীর নবাব খাঁজাঁহা খাঁ মুন্নার হস্ত প্রার্থনা করিলেন তাঁহাকেও মতাহারের পসন্দ হইল না। মতাহার এক আধারে সকল গুণ চান, তিনি চান তাঁহার জামাতা রূপবান, গুণবান, রাজবংশীয় সকল হইবে, কেবল তাহাই নহে, মতাহারের পুত্র নাই, তাহাকে পুত্র করিয়া সে সাধও মিটাইবেন, তাঁহার জামাতা তাঁহার ঘরে থাকিবে।

খাঁজা খাঁর যদিও ধন মান বংশের অভাব নাই কিন্তু ইঁহার সহিত বিবাহ দিলেত কন্যাকে গৃহে রাখা যায় না, তাহার পর আবার খাঁজা খাঁর অনেকগুলি বিবাহ, নবাব হইলে কি হয়—এরূপ স্থলে কোন্ প্রাণ ধরিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহার ত ধনের অভাব নাই, তিনি তাহা ছাড়া আর যাহা চাহেন, একঠাঁই সমস্ত পাইয়া উঠেন না।

অবশেষে মুন্নার বিবাহ হইল, ধন লোভে

পারস্য রাজবংশীয় এক যুবক তাহার বংশ মতাহারকে দান করিল। মতাহার রাজ বংশের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বস্ব সম্পত্তি জামাতার নামে লিখিয়া দিয়া তবে এই মান তাঁহার হস্তগত করিতে হইল। ইহাতে আর মতাহারের দুঃখ কি, তাঁহার ধন সম্পত্তি সকলি তাঁহার কন্যা জামাতার, কিছু দিন পরে ত উহারাই লইবে, না হয় আগেই উহাদের দিলেন, ইহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। মতাহার যেরূপ চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল,তবে ঠিক সেরূপ হইল না। জামাতা রূপবান—রাজবংশীয়, শ্বশুরালয়বাসী সকলি হইল—কেবল যেরূপ গুণবান চাহিয়াছিলেন তাহাই হইল না। কিন্তু বিবাহের সময় জামাতার এ অভাব বুঝিতে পারেন নাই, তখন সকল বিষয়েই মনোমত হইবে আশা করিয়াছিলেন, জামাতার দোষগুলি ক্রমে ফুটিতে লাগিল।

পিতা এত কষ্ট করিলেন, তবু কন্যা সুখী হইল না, মুন্নাকে মতাহার বেগম করিলেন—কিন্তু সুখী করিতে পারিলেন না। জামাতা কন্যার গৌরব বুঝিল না, হস্তীপদতলে রত্ন দলিত হইতে লাগিল।

নবাব মলেউদ্দীন দিনরাত বিলাস-সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন, বিলাস ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না, কিছু চাহেন না। সেই অপরিসীম বিলাস-তৃষ্ণা আর তাঁহার কিছুতেই মেটে না। সে তৃষ্ণা কুবেরের রত্ন সমুদ্রও যেন নিমেষে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে। মতাহার আগার ঐশ্বর্য্য দুই চারি বছরের মধ্যেই ফুরায় ফুরায় হইয়া আসিল। মতাহার দেখিলেন একদিন তাঁহার কন্যার বুঝি বা পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, যে কন্যা রাজযত্নে পালিত হইয়াছে, তাহাকে একদিন সত্যই বুঝি বা একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হইতে হয়। মতাহারের হৃদয়ে অসীম বেদনা, কন্যার মুখের দিকে তিনি আর চাহিতে পারেন না,দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। এক দণ্ড যে মুখ না দেখিলে মতাহার থাকিতে পারিতেন না, সেই মুখ দেখিলেই তাঁহার নয়ন যেন আপনা হইতেই অন্যদিকে ফিরিতে চায়। মুন্না বড় বুদ্ধিমতী,মুন্না বড় স্নেহময়ী, পিতার কষ্টের ভয়ে সে তাহার হৃদয় বেদনা লুকাইয়া রাখে, হাসি দিয়া অশ্রুজল ঢাকিতে চায়। পিতাকে বিষণ্ণ দেখিলে হাসিয়া হাসিয়া কাছে যায়, হর্ষভরে কথা কহে, ছেলেবেলায় পিতার সহিত কোন দিন কি কথা হইয়াছিল সেই সকল সুখের কথা ফিরাইয়া ফিরাইয়া আনে,পিতাকে বুঝাইতে চাহে তাহার প্রাণে কোন কষ্ট নাই, কেন তবে তিনি অসুখী হইবেন।

মুন্নার সেই হাসিতে সেই হর্ষের কথায় মতাহারের প্রাণ আরো কাঁদিয়া উঠে, সেই হাসির আলোকে মুন্নার প্রাণের আঁধার তিনি যেন আরো সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান। মতাহার মনে ভাবেন—"মুন্না ধন আমার, আমি যে তোমার সব হাসি ঘুচাইয়াছি, তবে আবার এ হাসি কেন ?" ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ নেত্রে, কন্যার কাছে সরিয়া আসেন, মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে পিঠে হাত রাখিয়া কি ভাবিয়া কে জানে

বলিয়া উঠেন "আমার সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে পারিবি"—মুন্না হাসিয়া হাসিয়া বলে—"পারিব না? পারিব বইকি" মতাহারের চোখে জল পুরিয়া আসে—"মুন্না ফুলের বাছা ফুলের মেয়ে কত কষ্ট সহিতেছে—আরো কি ইহা হইতে সহিবার কিছু আছে ভগবান।"

এইরূপে দিন যায়, মতাহারের মনের স্থিরতা নাই, কন্যার দুঃখ দেখিবেন না ভাবিয়া কখনো দূরে পলাইতে চান, আবার কন্যার কাছে আসিয়া তাহার সেই মুখখানি দেখিলেই সে ভাব আর মনে ঠাঁই পায় না, তখন মনে করেন—"মাগো এ মুখখানি কি না দেখিয়া থাকা যায়, ইহাকে একাকী কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় যাইব, যা অদৃষ্টে আছে দুজনে ভোগ করিব, ভিক্ষা করিতে হয় দুজনে হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিব।"

কিন্তু এরূপ অবস্থায় দিন কাটিল না, যে রাত্রের ঘটনাটি পূর্ব্বপরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে, পরদিন প্রাতঃকালেই তাহা মতাহারের কাণে উঠিল, কেবল তাহা নহে, যাহা হয় নাই—এমন অনেক কথা পর্য্যন্ত তিনি শুনিতে পাইলেন, তিনি শুনিলেন জামাতা মুন্নাকে মারিয়া সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারপর স্বচক্ষে যখন তিনি কন্যার সেই দীনহীন অলঙ্কারশূন্য বেশ দেখিতে পাইলেন তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। তিনি যে সলেউদ্দীনের সহিত বিবাহ দিয়া কি অধম্য কাজ করিয়াছেন, নিজের নিকট, প্রাণের কন্যার নিকট, তাঁহার দেবতার নিকট কি ঘোর পাপ করিয়াছেন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, এ পাপের শাস্তি কোথায় গিয়া অবসান বুঝিতে পারিলেন না। একদিন হয়ত বা জামাতা মুন্নাকে হত্যা করিবে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আনিয়া হত্যা করিবে, আর তাঁহার তাহাই একটা রক্তমাংসহীন শবের মত বসিয়া দেখিতে হইবে, এমন বল নাই, সামর্থ্য নাই, উপায় নাই, যে তাহা হইতে কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন। মতাহার শিহরিয়া উঠিলেন—আকুল ভাবে কাঁদিয়া উর্দ্ধ নয়নে বলিলেন জগদীশ্বর আমার পাপের শাস্তিতে অনাথা বালিকাকে আর বাধিও না, যত কিছু তোমার দণ্ড আছে—তাহা পাপ তাপের এই বৃদ্ধ মাথায় নিক্ষেপ কর, আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাহা বহন করিব—" হৃদয়ের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে দারুণবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি তাঁহার প্রাণের সমস্ত বল দিয়া অন্তর-দেবতাকে অতি আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, সেই দিন তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল যে দেবতার নিকট গিয়া তাঁহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আর অন্য উপায় নাই, মুন্নার মঙ্গলের আর আশা নাই, দেবতা ভিন্ন মনুষ্যে জামাতার শুভমতি ফিরাইতে পারিবে না। সেই দিন প্রাণের সহিত সবলে যোঝাযুঝি করিয়া, স্নেহের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দূর তীর্থে পীরের নিকট গিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। কাহাকে মনের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন না—কেবল সেদিন সন্ধ্যার

পর আহারান্তে উঠিয়া আসিবার সময় মুন্নাকে বলিলেন—"মুন্না আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—একবার তীর্থ করিয়া আসি। কবে মরিয়া যাইব, শীঘ্র যাইব ভাবিতেছি" মুন্না তখন পান লইয়া পিতাকে দিতে যাইতেছিল, হাতটি কাঁপিয়া হঠাৎ পানটি পড়িয়া গেল, চোখ দুটি জলে ভরিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বড় বড় দুই ফোঁটা জল মাটীতে পড়িল, বৃদ্ধ মতাহার সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন, বাহিরে শয়নকক্ষে গিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর প্রাতঃকালে একদিন মুন্নার চোখের জলের কুয়াসার উপর দিয়া একখানি নৌকা ভাসিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে কত দূরে চলিয়া গেল, ক্রমে দিগন্তের সীমায় মিশিয়া অদৃশ্য হইল, আর কিছুই দেখা গেল না, মুন্নার যাহা কিছু ছিল সব দিগন্তের পরপারে গিয়া হারাইয়া গেল। সত্যই পিতা মুন্নাকে ফেলিয়া গেলেন। মুন্না তাহার পরেও কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, এখনও যেন সেই নৌকাখানি দেখিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যখন দেখিল, সারারাত-দিন দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে নৌকা আর ফিরিবে না,—যখন বুঝিল হয়ত বা এ জনমেই আর তাহা ফিরিবে না—তখন অশ্রুজলের সহিত তাহার হৃদয় যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহিল ; কি করিবে কোথা যাইবে—ভাবিয়া না পাইয়া ছুটিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল—যে গৃহে তাহার স্বামী ঘুমাইতেছিল অজ্ঞাতভাবে সেই দ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল, আস্তে আস্তে চোখের জল মুছিয়া নিঃশব্দপদনিক্ষেপে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

সমস্ত রাত বাহির বাটীতে সুরাপানে মত্ত থাকিয়া সলেউদ্দীন শেষ রজনীতে নিতান্ত বিভোর হইয়া সেই কক্ষেই শয়ন করেন, অন্তঃপুরে শুইতে আসা আর তাঁহার পোষাইয়া উঠে না। মুন্না প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার নিদ্রিত স্বামীকে দেখিতে আসে, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া সাধ মিটিয়া একবার দেখিয়া লয়, স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই আবার চলিয়া যায়। আজও মুন্না সেইরূপ আসিয়া দাঁড়াইল, আজ মুন্নার শূন্য প্রাণের ভিতর দুঃখের উচ্ছ্বাস কি বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে—আর সে সামলাইতে পারিল না, ধীরে ধীরে স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল, স্বামীর পা দুইটি বুকের মধ্যে চাপিয়া মাথাটি নীচু করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনে মনে বলিল "মুন্নার আর যে কেহ নাই, একমাত্র স্নেহের পিতা তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। স্বামী, প্রাণ সর্ব্বস্ব—তুমি এখনো কি একবার এই অভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবে না?

সলেউদ্দীন ঘুমের ঘোরে পা টানিয়া লইলেন—মুন্নার মাথায় পায়ের আঘাত লাগিল। মুন্না তখন অবনত মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে সেই পদে চুম্বন করিল, ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চরণ অঞ্চলে মুছিয়া একবার সমস্ত হৃদয়ভরে স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া, একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর মনের ব্যথা মনে চা-

পিয়া, চখের জল চোখে রাখিয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাগন্ত স্বপ্ন।

মহম্মদ মসীনের সকালে সন্ধ্যায় নিয়মিত দুইটি কাজ ছিল, সকালে কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন, সন্ধ্যার কিছুক্ষণ সঙ্গীত চর্চ্চায় কাটাইতেন। কিন্তু কয়দিন হইতে এসবে তাঁহার যেন ঢিলটান পড়িয়াছে, ব্যায়াম করিতে ত প্রায়ই সুবিধা হইয়া উঠে না, গানের মজলিসটা, নিয়মিত বসে বটে, কিন্তু তাহাও তেমন আর জমাট বাঁধে না। গায়ক ভোলানাথ যে গান করিতে যান মসীন তাহাই অপসন্দ করিয়া বসেন। "ভোলানাথ বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারেন না," "তাঁহার বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটে না," "ইমনগুলা কড়িমধ্যমের জালায় ঘ্যানর ঘ্যানর করে," এইরূপে কোন গানই মসীনের মনের মত হয় না। তাঁহার জালায় ভোলানাথও তিতবিরক্ত হইয়া, ক্রমে সত্যসত্যই গানের বদলে কান্নার সুর ধরিয়া বসেন, রাগ গুলায় বিরাগ করিয়া তুলেন, বেগতিক দেখিয়া বন্ধুরা একে একে উঠিয়া যায়, ভোলানাথও তানপুরাটাকে আছড়াইতে আছড়াইতে রাখিয়া চলিয়া যান, যত রাগ তাঁহার তানপুরার উপর আসিয়া পড়ে।

এরূপ করিয়া ত আর ভোলানাথের প্রাণ বাঁচে না, ভোলানাথের বয়স কাঁচা না হইলেও মনটা বড় কাঁচা, প্রাণটা বড় সখের, গায়কদিগের প্রাণের ধর্ম্মই বুঝি এরূপ। বনের পাখীর মত হাসিয়া গান গাইয়াই এ প্রাণ কাটাইতে চাহে। মহম্মদের বেখোস মেজাজ, তাঁহার বড়ই খারাপ লাগে, মহম্মদ যে বিষন্ন আনমনে বসিয়া বাহারকে বেহাগ বলিয়া খুৎ ধরিয়া বসেন, গান না শুনিয়া গানের সমালোচনা করিতে থাকেন, তাহাতে বৃদ্ধ ভোলানাথ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, যতক্ষণ না ইহার প্রতিবিধানের একটা উপায় দেখিতেছেন, ততক্ষণ তাহার প্রাণটা সুস্থ হইতেছে না।

আজ আহারান্তে মসীন সন্ধ্যার পর মজলিসস্থলে আসিবামাত্র ভোলানাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাতাসটা আজ যেন দক্ষিণদিক থেকে বইতে সুরু করেছে, একটা সময়-মাফিক গান গাইলে হয় না?" মসীনও হাসিয়া বলিলেন—"ওস্তাদজি দক্ষিণে বাতাস কোথায় পেলে? এযে উত্তরে" বাতাস, আমরাত মারা গেলেম" ওস্তাদজি মুস্কিলে পড়িয়া চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে বলেন কি? এখনো উত্তরে বাতাস? এ বুড় হাড়ে সে বাতাস লাগলে যে আর উঠতে পারব না"— মসীন বলিলেন "তোমার প্রাণের ভিতর যে সারাদিন বসন্ত বাতাস বইছে, উত্তরে বাতাস কি তোমাকে ছুতে সাহস করে ওস্তাদ জি" ভোলানাথ হুঁ হুঁ করিয়া একটু হাসিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ

করিয়া বলিলেন—“বাতাস বইছে আর কই, প্রাণের ভিতর আটকা পড়ে গেছে” মসীন বলিলেন—“তা আটকা পড়বার আ-বশ্যক কি, বহুক না যত পারে বহুক, গান টান কি হবে চলুক”—ভোলানাথের প্রাণের মত কথা হইল, মহা আহ্লাদে একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “কিন্তু হুজুর আপনার আকাশ পানে চেয়ে থাকলে চলবে না, এই দখিনে বাতাসটা গায় লা-গান চাই—” মসীন বলিলেন “যে আজ্ঞে ওস্তাদজি—তাই হবে”

ক্রমে মহম্মদের বন্ধু বান্ধবগণ একে একে মজলিসে আসিয়া বসিলেন, ভোলানাথ তানপূরা লইয়া বসন্ত বাহারের রাগ ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন, ভোলানাথ আগে হইতেই স্থির করিয়াছিলেন যে কিছুদিন আর গান ধরিবেন না।

সপ্তসুরে ছুঁইয়া ছুঁইয়া, মধ্যম হইতে ক্রমে, পঞ্চম হইতে সপ্তমে, সপ্তম হইতে মধ্যমে সে তান উঠিতে পড়িতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে উঠিয়া পড়িয়া, সুরে সুরে মিলিয়া মিলিয়া, মধুর মধুভাবে সে তান চারিদিক ভরিয়া তুলিল। সে তানে মলয়ের হিল্লোল উঠিল, কোকিলের কূজন ছুটিল, তানে তানে, প্রাণে প্রাণে নব বসন্তের ফুল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

মহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত জগৎ ভুলিয়া গেলেন, সুখের প্রবাহ ঢালিয়া অবিশ্রান্ত অবিরত সেই মধুর তান মাত্র তাঁহার প্রাণে গিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, ফুলের রায়ের মত হৃদয়কে মত্ত করিয়া দিয়া ক্রমে সে তান তাহার প্রাণের দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া পড়িল, সে তানের ঝঙ্কারও আর তিনি শুনিতে পাইলেন না। দেখার অতীত শোনার অতীত ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত অস্পৃষ্ট কি এক অপূর্ব্বভাবে শুধু হৃদয় পূরিয়া গেল। সহসা শত শত আলোক ছটায় ফুটিয়া, চারিদিক আলোকে আলোকে ছাইয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপে সে ভাব তাঁহার সমুখে বিরাজ করিতে লাগিল, বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মসীন সেই আলোক ছটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই জ্যোতির উচ্ছ্বাস মধ্যে যেন একটি ছায়া ভাসিয়া উঠিল, ক্রমে সে ছায়া একটি অস্পষ্ট ছবির আকার ধারণ করিল, মসীন অনিমেষনেত্রে সেই ছবি দেখিতে লাগিলেন, ছবি অতি অস্ফুট, অতি ভাস ভাস, তাহাকে চেনা যায় না, তাহাকে চোখে ধরা যায় না, দেখিতে দেখিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইল, সে ছবি একটি রমণী মূর্ত্তি; সে মুখে পাপ তাপের মলিনতা নাই, দুঃখ বিষাদের রেখা মাত্র নাই, স্বর্গীয় শান্তিভাবের সে মূর্ত্তি জীবন্ত প্রতিমা। মহম্মদ তাঁহাকে চিনি চিনি করিয়া আকুল হইলেন, সহসা চারিদিকের আলোকছটা ছবির উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সে আলোকে মুন্নার শান্তিময়ী প্রতিমা জ্বলিতে লাগিল। সে প্রতিমার কাছে আর একজনকে মসীন দণ্ডায়মান দেখিলেন, তিনি সেই সন্ন্যাসী।

নিস্তব্ধে স্থির কটাক্ষে মহম্মদ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। সঙ্গীত থামিল, মসীনের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নিমেষে সেই আলোক

সেই ছবি মিলাইয়া গেল, তিনি বুঝি-লেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সেদিনের মত গানের মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, মসীন মুন্নার কাছে গেলেন।

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস।

শ্রীপুরের ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদার রায়।

যে ব্যক্তি পিতৃব্যের প্রাণ বধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন,—যাঁহার ভুজবলে দক্ষিণাপথে সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান পতাকা সংরোপিত হইয়াছিল সেই খ্যাত-নামা দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি আলাউদ্দিন বাদসাহের সময়ে কায়স্থ জাতীয় নিমচাঁদ রায় ও রাজা-রাম রায় নামে দুই ভাই দিল্লীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বংশীয় পদবী "দেব"। কোনও লেখক ইহাদিগকে কর্ণাটী কায়স্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অম্বষ্ঠ কায়স্থ।

আল্লাউদ্দিন বাদসাহের রাজ্যশাসনের চরমাবস্থায় পূর্ব্ব-বঙ্গ মুসলমানদিগের হস্ত-গত হয়। বাহাদুর খাঁ সুবর্ণগ্রাম প্রদেশের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তা। সম্ভবত তাহার নিয়োগ কালেই দিল্লীশ্বরের অনুমতি ক্রমে নিমচাঁদ ও রাজারাম পূর্ব্ব-বঙ্গে উপ-স্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় পারস্য ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শাসন-কর্ত্তার মুনসী খানার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, "পত্রনবিস" তাহাদের কার্য্যের খেতাব-ছিল।

আড়াফুলবাড়িয়া গ্রামে নিমাই রায় প্র-থমেই বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। যে কয়েক খানা পল্লি গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছেন, আড়াফুলবাড়িয়া তাহার মধ্যে একখানি।

নিমাই ও রাজারামের বংশধরগণ সক-লেই যত্নসহকারে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া "পত্রনবিস" দপ্তরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে-ছিলেন।

নিমাই রায়ের পৌত্র মুকুট রায়ের দুই পুত্র জন্মে যথা চাঁদরায় ও সুন্দররায়। চাঁদ-রায় শৈশবকালে মৌলবি আমিরবক্সের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। আরবা পারস্য ভাষায় তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া ছিল। পিতৃবিয়োগের পর তিনি নবাব সর কারে নিযুক্ত হন। ঘটনা ক্রমে তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি দিল্লীর রাজসভায়ও ঘোষিত হইতে লাগিল। গুণগ্রাহী মোগল সম্রাট হুমায়ুন চাঁদরায়কে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনমাস দিল্লীতে অবস্থানের পর হুমায়ুন তাহাকে কর্ণাট প্রদেশের দেওয়ানী আদেল-কারের (জজ) পদে নিযুক্ত করেন। তৎপর হুমায়ুনের চরমাবস্থায় কিম্বা শের সুরের

সময়ে চাঁদরায় বিক্রমপুরের প্রথম "ভৌমিক" উপাধি লাভ করেন।

আধুনিক জমিদারদিগের ন্যায় কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করা ভৌমিকদিগের কার্য্য ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহে হস্তি, অশ্ব, পদাতি, ও রণতরী দ্বারা রাজার সহায়তা করিতে তাঁহারা বাধ্য ছিলেন। রাজচিহ্নোচিত আসা সোটা, নিশান ডঙ্কা প্রভৃতি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে যাইত। আধুনিক "রাজা বাবু" বা 'মহারাজাধিরাজ'দিগের ন্যায় ভৌমিকগণ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের "বিদ্যাভূষণ" উপাধির ন্যায়, অকর্ম্মণ্য রাজচিহ্ন ধারণ করিতেন না। তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন কালের সামন্ত রাজগণের কোন প্রভেদ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রবল পরাক্রান্ত ভৌমিক চাঁদরায়ের সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"———চাঁদ রায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যু বৃত্তি কাম॥
তেনলক্ষ মুদ্রা খায় কর নাহি দেয়।
নবাব আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায়॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয়॥
শক্তি মন্ত্রে উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজা দণ্ড করি লয় পূজা ছল করি॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো ব্রাহ্মণ আদি বধ করিতে না ডরে॥"

চাঁদরায় গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, সুতরাং ভক্তমাল-প্রণেতা তাহার কার্য্য-কলাপ সদাশয়তার সহিত লিপিবদ্ধ করেন নাই। চাঁদরায়ের ইষ্টদেবতা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সম্বন্ধে আমরা শৈশবাবধি নানা প্রকার প্রবাদ শুনিয়া আসিতেছি। প্রবাদ আছে তিনি একদা মৃণ্ময়ী কালীর জানু বিদারণ করিয়া প্রচুর পরিমাণ রুধির বাহির করিয়াছিলেন। এক দিবস অমাবস্যা রাত্রে ভ্রম বশত পূর্ণিমা বলিয়া পূর্ণচন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। আর এক দিন অর্থাভাবে শৌণ্ডিকালয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সার্দ্ধদ্বিপ্রহর সূর্য্যদেবকে ঠিক গগনমণ্ডলের মধ্য ভাগে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ইত্যাদি। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে রামভদ্রপুর নিবাসী গোস্বামীগণ পূর্ব্ব হইতে এই বংশের কুলগুরু ছিলেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি কিছুকালের জন্য তাহার একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু ভক্তমাল-প্রণেতা বলেন ইহাঁরা পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন পরে ঘটনা চক্রে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করেন।

চাঁদরায়, বসু পরিবারে বিবাহ করেন। বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম পুত্র কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * পুত্রের নামানুসারে চাঁদ এক নূতন বাটী

* ডাক্তার ওয়াইজ কেদাররায়কে চাঁদরায়ের ভ্রাতা লিখিয়াছেন। যাঁহারা কেবল ওয়াইজ সাহেবের লেখা অবলম্বন করিয়া ভৌমিকদিগের ইতিহাস লিখিতে যত্ন করিয়াছেন তাহারাও ওয়াইজের ন্যায় ভ্রমমার্গে পাদ বিক্ষেপ করিয়াছেন। ঘরানা বংশাবলীতে কেদারকে চাঁদের পুত্র লেখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাসেও বারংবার কেদারকে চাঁদের পুত্র বলা হইয়াছে। (ঐ ইতিহাসের ৮৬ ও ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

নির্ম্মাণ করত তাহাকে কেদার-বাটী নাম দিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজারাম রায়ের বংশধরগণ রাজাবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। রাজারামের নাম অনুসারেই উক্ত স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেদার বাটীর চতুর্দ্দিকে গড় কাটা হইয়াছিল। †

চাঁদরায় তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তারাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন জন্য চাঁদরায় এক সুদৃশ্য ও বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চাঁদরায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাটীতেও এক বৃহৎ "চিলছত্র" নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সোনামণি নাম্নী কন্যা চাঁদ রায়ের শেষ সন্তান। নয় বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যার বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। বিবাহের ৮ মাস পরে সোনামণি বিধবা হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শিশু কন্যাকে দর্শন করিয়া চাঁদরায়] একপ্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

হায়! হায়! এইরূপ শত শত বঙ্গগৃহে শিশু-বিধবাদিগকে দর্শন করিয়াও বঙ্গবাসীদিগের চৈতন্য হইতেছে না। এইরূপ চির-শান্তিময়-গৃহ বঙ্গদেশে অতি বিরল যেখানে বাল-বিধবার শোকাশ্রু পতিত হয় নাই। এইরূপ শিশুকন্যার বৈধব্য দর্শনে কত পিতা মাতার হৃদয় অবিরাম দগ্ধ হইতেছে। কৈ তাঁহারা ত অগ্রসর হইয়া জঘন্য দেশাচারকে কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইতেছেন না। ধন্য প্রমথভূষণ! প্রমথভূষণের ন্যায় ভূস্বামী কি বঙ্গদেশে নাই? তাঁহারা নিজ গৃহে, প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গের গৃহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহাদের হৃদয় কি এমনই পাষাণ নির্ম্মিত, যে বালবিধবাদিগের উত্তপ্ত শোকাশ্রুতেও তাহা গলিত হইবে না। শিশু হতভাগিনীদিগের প্রতি দয়া করিবার জন্য মানব যদি এদেশে না থাকে তবে এই দেশ রসাতলগামী হউক, বাঙ্গালার নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত হউক, বাঙ্গালা বঙ্গোপসাগরের অতলস্পর্শে প্রবিষ্ট হউক।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন যে সুব গ্রামের ভৌমিক ঈশা খাঁ একবার শ্রীপু আক্রমণ করিয়া সেই বাল বিধবা সোণামণিকে অপহরণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়া তাহাঃ পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡ বঙ্গবাসি! অদ্যাপি কি বঙ্গদেশে এরূপ কাণ্ড হইতেছে না! বাল বিধবাগণ যে কত স্থানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কুল পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ককালিমা দ্বারা আত্মীয় বর্গের মুখ ম্লান করিতেছেন। কত প্রকার পাপ কার্য্য দ্বারা বঙ্গদেশ কলুষিত করিতেছেন। এই সকল

† বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক বলেন যে, গড়খাইর মধ্যস্থিত কেদার বাটীতে এক্ষণ ৪৫৲ টাকা স্থিত হইয়াছে। বঙ্গদেশস্থ কোন একটী পল্লিতে কত পরিমাণ ভূমির রাজস্ব ৪৫০ টাকা হইতে পারে তাহা মফঃস্বল বাসী পাঠকগণ অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন।

‡ J. A. S. Bengal Vol. XLIII part I. page 202.

দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমরা কলির ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি পরাশরের মতানুসরণ করিবে না? ধীশক্তিসম্পন্ন দূরদর্শী মহাত্মা পরাশর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
চতুর্থ অধ্যায় ২৭ শ্লোক।

বাল বিধবা কন্যার বৈধব্য-শোকে অধীর হইয়া চাঁদরায় বৈষয়িক কার্য্য হইতে হস্তোত্তোলন করিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কেদার রায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ৮৩ বৎসর বয়সে শিশু কন্যার বৈধব্যশোক হৃদয়ে লইয়া চাঁদ্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অধিকৃত সমস্ত প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

বীরচূড়ামণি কেদার রায় মোগল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। যে কয়েক জন ভৌমিকের বাহুবলে দীর্ঘকাল সম্রাট আকবরের বিজয় বৈজয়ন্তী বাঙ্গালায় সংরোপিত হয় নাই, কেদার তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার শাসনকালে সুবিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী রল্ফ ফিছ্ বাকলা হইতে শ্রীপুরে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন।

From Bacola I went to Seereepore, which standeth upon the river Ganges, the king is called Choudery. They be all here about rebels against their king Zebaldin Echeber: * for here are so many rivers and islands, that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot privail againest them. Great store of cotton cloth is made here.

পর্ত্তুগিজ লেখক ডু'জারিক "দ্বাদশ ভৌমিক রাজ্যের" বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "পাঠান রাজ এই সকল ভৌমিকের সাহায্যে মোগলদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

ডি' আবিটি, জারিকের বাক্য পোষণ করিয়া বলেন, এই দ্বাদশজন নরপতির মধ্যে শ্রীপুর পতি—(কেদার রায়,) চাঁদখাঁর ঈশ্বর (প্রতাপাদিত্য) ও (খিজিরপুরের ঈশাখাঁ) মছনদেআলীই প্রধান। পোরচাস লিখিয়াছেন "১৬০২ খৃষ্টাব্দে সনদ্বীপের অধিকার লইয়া মগ, মোগল, পর্ত্তুগিজ ও হিন্দু এই চারি জাতির মধ্যে একটি তুমুলকাণ্ড হইয়াছিল। এই দ্বীপ তৎকালীন কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। আকবরের সেনাপতিগণ ইহা অধিকার করেন। তৎপর পর্ত্তুগিজগণ মোগলদিগকে জয় করিয়া সনদ্বীপের আধিপত্য গ্রহণ করিল। আরকাণরাজ পর্ত্তুগিজদিগের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে একবহর রণতরী প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে আরাকানপতি কেদার রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি পর্ত্তুগিজদিগের প্রতিকূলে ১০০ এক শত রণতরী (কোষা) প্রেরণ করেন। পর্ত্তুগিজ লেখক লিখিয়াছেন, যদিও এই যুদ্ধে পর্ত্তুগিজেরাই জয়লাভ ক-

* জালালদ্দিন আকবর।

রিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেদাররায়ের সহিত সন্ধি করিয়া সনদ্বীপ উপভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া লঙ্কা বিজয় করিতে ধাবিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাতির জলরণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি উজ্জয়িনী নগরনিবাসী কবিকুল তিলক কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল, ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজকগণ যে জাতির অর্ণব পোত সকল মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান দর্শন করিয়াছিলেন, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেই বাঙ্গালি জাতির—সেই গৌরব-সূর্য্য বঙ্গোপসাগরে সনদ্বীপ সমক্ষে অস্তমিত হইল। আর কি তাহার উদয় হইবে না? আর কি বাঙ্গালী সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করিবে না? আর কি বাঙ্গালি জাতির অর্ণব-পোত সমূহের উন্নত পতাকার প্রতিবিম্ব সৌরমণ্ডল উপকূলে, † সিংহল, যব, বালী দ্বীপে প-তিত হইবে না। আর কি বঙ্গীয় নাবিক-দিগের সুমধুর ভাটীয়াল-গীত সামুদ্রিক হি-ল্লোলে নৃত্য করিয়া মহাসমুদ্রগামী ভিন্ন-দেশীয় মানবদিগের কর্ণকুহরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে না?

কেদার রায় বিক্রমপুরের কায়স্থ সমাজ পতি ছিলেন। বিক্রমপুরের কুলীন কায়স্থ-গণ "সাড়ে তিন মেলে" বিভক্ত, যথা মাল খাঁ নগরের বসু, পঞ্চৈল দিয়ার ঘোষ ও শ্রীনগরের গুহ (মস্তফী)। এই তিনমেল ও কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন। রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক মূল হইতে উৎ-পন্ন, প্রাচীন কালে বঙ্গজ কায়স্থগণ তিন সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সমাজ, বাকলার (চন্দ্রদ্বীপের) সমাজ, ও যশোর বা প্রতাপাদিত্যের সমাজ।

রলফ্ ফিচ্ বলেন শ্রীপুর, সুবর্ণগ্রাম হইতে ছয় লিগ দূরবর্ত্তী। কিন্তু আমা-দের বিবেচনায় সুবর্ণগ্রাম হইতে শ্রীপুরের দূরত্ব-গণনায় ফিচের ভ্রম হইয়াছিল আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীপুর গঙ্গা মেঘনাদ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল ব্রোকের মানচিত্রে শ্রীপুর Zerepoer প্রধা-নগরী রূপেই চিত্রিত রহিয়াছে। ব্রোক Zerepoer এর নিকট Ceerpoer Fringe নামে একটী নগর অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রফেসার ব্লকমান ভ্রমক্রমে ইহাকেই শ্রীপুর নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু আ-মাদের মতে উক্ত Ceerpoer Fringe আ-ধুনিক রিকাবী বাজারের নিকটবর্ত্তী ফেরিঙ্গী বাজার। বৃদ্ধ মার্সমানও এই ফেরিঙ্গী বা-জারের উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে শ্রীপুরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল।

† "সৌরমণ্ডল" অধুনা করমণ্ডল নামে পরিচিত। সৌরমণ্ডল কিরূপে করমণ্ডল হইল তাহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, 'স' এর উচ্চারণ "ছ"। তদনুসারে ইউরোপীয়গণ ইহাকে ছৌরমণ্ডল শ্রবণ করিয়া "C" অক্ষর নামের অগ্রে সন্নিবে-শিত করেন। তৎপরেই আমাদের ও অজ্ঞ বিলাতী মানবদিগের কৃপায় "C" "ক" এ পরিণত হইয়াছে।

এস্থান হইতে কার্পাস বস্ত্র যুনানী-মণ্ডলে ও চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত। পরিব্রাজক ফিছ আমাদের এক জন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বৃহৎ তোপ্‌ প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীপুরে উপযুক্ত কর্ম্মকার ছিল।

কেদার রায় কার্ত্তিকপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি সেই স্থানটী কেদার বাটী নামে পরিচিত রহিয়াছে। তিনি কেদারপুর নামে আর একটী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য দ্বারা কেদারপুরের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ব্রোকের মানচিত্রে Chedderpoer বৃহৎ নগরী রূপে চিত্রিত আছে। অদ্যাপি বিক্রমপুরের মধ্যে একটী স্থান কেদারপুর নামে পরিচিত, কিন্তু তাহার প্রাচীন উন্নতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তিসমূহ গ্রাস করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যে গঙ্গা কীর্ত্তিনাশা আখ্যা ধারণ করিয়াছে। সেই করালকালরূপিণী কীর্ত্তিনাশার তীরভূমিতে প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নসমূহ দর্শনের আশা দুরাশা। বঙ্গ প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে (উড়িষ্যা, চুটীয়ানাগপুর, আসাম ও ত্রিপুরায়) প্রাচীন উন্নতির কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ রাশি রাশি উচ্চ-চূড় মন্দির ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গে তাহার কোন চিহ্ন নাই, এক মাত্র গঙ্গাই ইহার কারণ।

কীর্ত্তিনাশার উত্তর তীরে একটী মঠ ও দীর্ঘিকা অদ্যাপি কেদার রায়ের কীর্ত্তি সমূহের চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মঠ সাধারণত "রাজবাড়ীর মঠ" ও দীঘি "কেশার মার দীঘি" নামে পরিচিত রহিয়াছে।

মোগল সম্রাটের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া কেদার রায় কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তথাপি তাঁহার অবশিষ্ট যে সম্পত্তি ছিল তাহা তাঁহার বৈদ্য বংশীয় দাস রঘুনন্দন দাস, তাঁহার মৃত্যুর পর অপহরণ করেন। এই রঘুনন্দন দাস নওপাড়ার চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ। ইহাঁরা এক সময়ে বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজপতি ছিলেন। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে দুই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে দুই জন বৈদ্য অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই কায়স্থ জাতির পদসেবা করিয়া আপনাদের উন্নতির সূত্রপাত করেন। একজন কেদার রায়ের ভৃত্য রঘুনন্দন দাস, অন্য ব্যক্তি মালখা নগরের বসুদিগের ভৃত্য খ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ সেন।

শ্রীহট্ট নর্ম্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আমাদিগকে চাঁদ-কেদারের এক খানা ঘরানা বংশাবলী ও পরিবার মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদাদি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই প্রবন্ধে তাহার লিখিত বংশাবলী ও প্রবাদ সমূহ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তাহার লিখিত বংশাবলী এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম কিন্তু ইহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে, যদি কোন পাঠক এই বংশের এক খণ্ড সম্পূর্ণ বংশাবলী আমাদিগকে প্রদান করেন, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব। বাবু স্বরূপচন্দ্র রায় আপনাকে কেদার রায়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তিনি আরও বলেন 'যে ইহারা "ঘৃতকৌষিক" গোত্রীয় "দে" বংশজ।

বংশাবলী।

নীমচাঁদ রায়

কামদেব — ভূদেব

(ভূদেব) আনন্দ — বংশীধর — মুকুট

(মুকুট) চাঁদ রায় — সূর্য্য রায়

(চাঁদ রায়) কেদার রায়

(কেদার রায়) কালীহর — হরিহর

(কালীহর) রামকৃষ্ণ — বিজয়

(রামকৃষ্ণ) যোগীরাম

(যোগীরাম) কেবলরাম

(কেবলরাম) রামকানাই

(রামকানাই) রাজচন্দ্র — মহেশ — স্বরূপচন্দ্র — হরিশচন্দ্র।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

বিদায়।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে!
আবার বাজিছে বাঁশি,
আবার উঠেছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে
শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা,
কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে
আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থর থর,—
জলের পানেতে চেয়ে
ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর।

কি জানি কত কি আশে
চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে!
সবাই ত ভুলে আছে—
কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি
তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস!
সুদূরে বাজিছে বাঁশি,
তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস!
উঠেছে প্রভাত রবি,
আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়,
তারে ত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে
জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—

নিশীথের অন্ধকারে
পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ!
যাহা কিছু ফেলে গেছ
তাদের কে করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত
ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন!
আজি বসন্তের বায়
একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি
হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাক তবে ঢাক মুখ
নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি;
অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্যবিবাহ।

প্রতিবাদ।

ফাল্গুন মাসের "ভারতীতে" বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমি ঐ প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। বাল্যবিবাহ দ্বারা যে আমাদের সমাজের অনেক উপকার হইতেছে তাহা দেখাইবার জন্য প্রবন্ধলেখক বাল্যবিবা-

হের বিরুদ্ধ-আপত্তি সকল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু আমার সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলিবার আছে।

১ম তর্ক। বাল্যবিবাহে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির মনোমত হয় না ইত্যাদি।

লেখক বলেন যুবক যুবতীগণ আপন আপন স্ত্রী ও স্বামী প্রকৃতরূপে পসন্দ করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য লেখকের মতে পিতা মাতা পুত্র কন্যার স্ত্রী ও স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া দিলে পুত্র কন্যার মঙ্গল হয় ও দাম্পত্য প্রেমের বন্ধন চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হয়। এই যুক্তি দ্বারা লেখক যৌবন-বিবাহ অপেক্ষা বাল্যবিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমি লেখককে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বিবাহটা কি স্বাভাবিক না কেবল একটা সর্ব্ববাদী সম্মত সামাজিক ব্যাপার? লেখক বার বার দুইটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন "বাল্যবিবাহ" ও "যৌবন বিবাহ।" আমি ত বাল্যবিবাহের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি না। "বাল্যবিবাহ" কথাটা যেন ঠিক "সোনার পাথর বাটির" মত। প্রকৃত বিবাহ যাহা তাহা কি কখন বাল্যকালে সম্ভবে? বিবাহ ত যৌবনের ধর্ম্ম। যুবক যুবতী ভিন্ন কি কখন প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে? প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বভাবের নির্দ্দিষ্ট সময়ের অগ্রে বুদ্ধিমান মানুষ বিবাহ কার্য্যটা সমাধা করিয়া কি কখন সুখী হইতে পারে? যুবক যুবতী অনেক সময় শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের গুণের ও রুচির প্রতি তত লক্ষ্য থাকে না, এই জন্য রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া অনেক যুবক ও যুবতী শেষে অনুতাপ করিয়াছেন। লেখকের মতে সেই জন্য যৌবন বিবাহ দোষাবহ। বৃদ্ধ পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের উপর বর ও কন্যা নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে এরূপ হয় না। কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আমি বলি কখনই নয়। যুবক, যুবতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন বৃদ্ধ পিতা মাতা হন না লেখককে তাহা কে বলিল? আজকাল হিন্দু সমাজে বিবাহের সময় কন্যার রূপ ছাড়া যে আর কিছু দ্রষ্টব্য আছে তাহা কেহই মনে করেন না। "মেয়েটি ভাল" মানে কি "মেয়েটি দেখিতে ভাল" নয়? সুন্দর জামাই করিব ও সুন্দর বউ করিব অনেক পিতা মাতার কি কেবল এই উদ্দেশ্য নহে। লেখক যে যুক্তি দ্বারা যৌবন বিবাহের দোষ দেখাইয়াছেন আমি ঠিক সেই যুক্তি দ্বারা বাল্যবিবাহের দোষ দেখাইতেছি। পিতা মাতা অর্থলোভী হইয়া পুত্র কন্যার রূপ গুণ ও রুচির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন এই জন্য পরে স্ত্রী ও স্বামীর সহিত মনের মিল হয় না, দিবারাত্র কলহ হইয়া থাকে। লেখক হয়ত ইহার উত্তরে বলিবেন পিতা মাতা শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে এ আশঙ্কা থাকে না। আমিও বলিব যুবক যুবতীগণ শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে লেখক যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা থাকে না। বাস্তবিক যৌবন

কালে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিলে যদি কিছু অমঙ্গল হয়, যদি দুর্ভাগ্য বশতঃ যুবক যুবতী কেবল পরস্পরের শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়া ফেলেন ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ হইলে আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকে তাহা হইলে সে দোষ যৌবন কালে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া হয় নাই, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই বলিয়া হইয়াছে। লেখক বলিবেন পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ভার পিতা মাতার। আমি বলি পুত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তবে পুত্র কন্যা বিবাহ করিবার সময় পিতা মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকের মত ও পরামর্শ লইতে পারেন। শুদ্ধ পারেন কেন পিতা মাতার মত গ্রহণ করা তাঁহাদিগের উচিত। আজ কাল হিন্দু সমাজে যে প্রকার বিবাহ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে শিক্ষিত যুবক শিক্ষিতা যুবতীর বিশেষ সাবধান হইয়া চলা একান্ত আবশ্যক। পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন, কারণ পুত্র এণ্ট্রেন্স পাস দিয়াছেন। ঘটক উপস্থিত। পিতা ঘটককে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন "পাওনা গণ্ডা কেমন, কয় হাজার টাকা দেবে?" ঘটক যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে অনেক স্থলে আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয় না। কিছু দিয়া মেয়ের মুখ দেখা একটা রীতি আছে তাই পিতা মহাশয় একবার মেয়ে দেখ্‌তে যান। কিন্তু সে দেখার উপর বিবাহ দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে না। বিবাহের এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত থাকিতেও কি লেখক মহাশয় শিক্ষিত যুবকদিগকে পিতা মাতার উপর বিবাহের সম্পূর্ণ ভার দিতে বলেন? যদি বলেন, তাহা হইলে আমার মতে কোন শিক্ষিত যুবকের লেখকের কথা শুনা উচিত নহে। আর একটা কথা আছে, আমাদের হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে পিতা মাতা কখন বিবাহ সম্বন্ধে পুত্র কন্যার মনোগত ভাব ও রুচি জানিতে পারেন না। কি প্রকারে জানিবেন? পুত্র বন্ধু বান্ধবের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছেন এমন সময় পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি সকলে নিস্তব্ধ। পুত্র গুন্ গুন্ করিয়া একটি জাতীয় সঙ্গীত অথবা ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা আসিয়া পড়িলেন, অমনি পুত্র জড় শড় হইয়া চুপ করিল। যে সমাজে পিতা পুত্রে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন না সে সমাজে পিতা কি করিয়া পুত্র কন্যার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন। লেখক বলিতেছেন বাল্যকাল হইতে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে বাস করিলে তাহাদের দাম্পত্য প্রেম দৃঢ় হয়। একথা কি সত্য? দুই এক স্থলে হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হয় না। বালক বালিকাদের পরস্পরের প্রতি যে ভালাবাসা থাকে তাহা কি দাম্পত্য প্রেম না তাহা হইতে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত হয়? একটি বালক একটি বালিকাকে ও একটি বালককে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু ঐ বালকটি যখন একজন

যুবক হইল তখন সে আর পূর্ব্বোক্ত বালক ও বালিকাটিকে ঠিক এক প্রকারে ভাল বাসিতে ও এক চক্ষে দেখিতে পারিল না।

বালিকা যুবতী হইলে, তখন সে তাহার বাল্যসখার মন আকর্ষণ করিতেও পারে নাও করিতে পারে। বাল্যকালের ভালবাসার উপর সর্ব্বস্থলে যৌবনের ভালবাসা নির্ভর করে না। দাম্পত্যপ্রেম যৌবনকালেই সঞ্চারিত হয় বাল্যকালের ভালবাসা ইহা জন্মাইয়া দেয় না। সেই জন্য বলি আগে হৃদয়ে দাম্পত্যপ্রেমের সঞ্চার হউক তবে তাহাকে দৃঢ় করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা যাইবে। লেখক একটা বড় পাকা কথা বলিয়াছেন "কিন্তু বাল্যবিবাহে বালক স্বামী ও বালিকা স্ত্রী ছেলেবেলা হইতে একত্রে একপ্রকার শিক্ষা পাইতে পাইতে তাহাদের উভয়ের মন এক ভাবেই গঠিত হইতে থাকে। ... ... উভয়ের মধ্যে এক-জনের কোন দোষ থাকিলে অন্য জনে ছেলেবেলা হইতে উহা দেখিতে দেখিতে উহাতে একরূপ অভ্যাস হইয়া যায় এবং শেষে আর এইরূপ দোষের তীব্রতা অনুভব করিতে পারে না। ইত্যাদি।" মোট কথা এই, বালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে এরূপ প্রকার শিক্ষা প্রদান কর যাহাতে ভবিষ্যতে স্বামীর পাপকে পাপ বলিয়া গণ্য না করে। কি ভয়ানক কথা! স্বামী যদি মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হয় তাহা হইলে ছেলেবেলা হইতে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে রাখ তাহাতে স্ত্রী মদ্যপান ও পরস্ত্রীহরণকে দোষ বলিয়া মনে না করিতে পারে। যদি এই প্রকারে স্ত্রীকে স্বামীর মতের সহিত এক হইতে না শিখাও, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রীর মতভেদ ও রুচিভেদ উপস্থিত হইয়া পরিবারে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হইবে। লেখক বড় শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এপ্রকার শান্তিপ্রিয়তা প্রশংসিত হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যেক শিক্ষিত ধার্ম্মিক লোকের নিকট অতিশয় নিন্দিত তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্বার্থপর পুরুষ! তোমার সুখের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া তুমি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্ম বুদ্ধিকে মলিন করিতে চাহ, তুমি স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে চাহ না, পাছে সে শিক্ষিতা হইয়া আপনার স্বাধীন মত দ্বারা পরিচালিতা হয়, পাছে সে তোমার মতে মত না দেয়। আজ যদি আমাদের স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইত তাহা হইলে অনেক স্বামীকে স্ত্রীর সহিত সাবধানে কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিতে হইত যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীকে পদ দ্বারা দলন করা বড়কঠিন হইয়া পড়িত। হায়! আজ কত শত বঙ্গনারী পাষণ্ড পাপিষ্ঠ স্বামীর অত্যাচারে কাতর হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষের জলে আপনাদের বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতেছেন। কয়জন পুরুষ তাঁহাদিগের চক্ষের জল দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন?

২য় তর্ক। বাল্য-বিবাহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহাদিগের

মধ্যে অসম্মিলনের কারণ হইয়া উঠে—ইত্যাদি।

স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাহা জানা আর পরস্পরের মন যোগাইয়া কাজ করা কি এক? স্বামী ও স্ত্রী দুর্নীতি পরায়ণ হইলে উভয়ে পরস্পরের মন যোগাইয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন। তাই বলি স্বামী ও স্ত্রী বাল্য কাল হইতে এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না, উভয়ের এক প্রকার রুচি হইতে পারে। স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবার জন্য নীতি শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা আবশ্যক। উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন কখন কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। ৯। ১০ বৎসরের বালিকা ও ১৬।১৭ বৎসরের বালকের কি কখন স্ত্রী ও স্বামীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধ হওয়া সম্ভব?

৩য় তর্ক। বাল্য বিবাহে দম্পতীর শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি।

লেখক বলিতেছেন অভিভাবকগণের দোষেই বাল্য-বিবাহ দ্বারা বালক বালিকাগণের শরীর ও মন রুগ্ন হইয়া পড়ে। লেখক যে প্রকার তর্ক অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তাহাতে ত আমি অভিভাবকগণের কিছু দোষ দেখিতে পাই না। কারণ লেখক পূর্ব্বেই বলিয়াছেন বালক-স্বামী ও বালিকা স্ত্রীর ছেলেবেলা হইতে একত্রে থাকা আবশ্যক। অভিভাবক বালক-স্বামী ও বালিকা-স্ত্রীকে একত্র কথা-বার্ত্তা কহিতে ও থাকিতে দেন তাহাতে তাঁহাদিগের দোষ কি? একত্রে না থাকিলে ও কথাবার্ত্তা না কহিলে কি করিয়া তাহারা পরস্পরের মনের ভাব জানিতে পারিবে? লেখক মহাশয় যদি বলেন অভিভাবকগণ তাহাদিগকে রাত্রিতে একত্রে শয়ন করিতে দিবেন না ও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের উপর চক্ষু রাখিবেন তাহা হইলে আর কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি বলি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে তাহা হওয়া অসম্ভব। হিন্দুসমাজে নব-দম্পতীর কথা কহিবার অধিকার নাই। ৮।৯ বৎসরের বউ বালক স্বামীকে দিবা ভাগে কাহার সাক্ষাতে দেখিলে দুই হাত ঘোমটা দিয়া বসেন। সেই জন্য দিবাভাগে তাঁহাদিগের কথা কহিবার সুবিধা না থাকায় অভিভাবকগণ রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে সেই অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অধিকারের কি বিষময় ফল সমাজে প্রতিদিন ফলিতেছে লেখক কি তাহা অবগত আছেন? আমাদিগের দেশে বালিকাদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার যে কি মহানিষ্ট হইতেছে তাহা এখানে লিখিয়া উঠা অসম্ভব। স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের উপযুক্ত সময় স্বয়ং পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তবে কেন হিন্দুসমাজস্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা সে সময়ের পূর্ব্বে বিবাহ ও রাত্রিতে স্বামীর সহিত একত্রে শয়ন করিবার অধিকার দিয়া বালক বালিকাগণের শরীর ও মন চিরদিনের জন্য নষ্ট করেন বুঝিতে পারি না। লেখক বলেন বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজ হইতে দূর করিয়া দিলে স্কুল কালেজের ছেলেদের চরিত্র কলুষিত হইয়া যা-

হইবে। আমি বলি চরিত্র ভাল হওয়া না হওয়া সঙ্গ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে বাল্যবিবাহের উপর নির্ভর করে না। কারণ অনেক বয়সে বিবাহ করিয়াও অনেক ছেলে মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছে আর অল্প বয়সে বিবাহ না করিয়াও অনেক ছেলে ভাল আছে। তবে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগকে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা ও পুরুষদিগকে ২৫।২৬ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে অনেক স্থলে চরিত্র কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

৪র্থ তর্ক। বাল্যবিবাহে দম্পতী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে না ইত্যাদি।

দরিদ্র বাঙ্গালিদিগের অল্প বয়সে বিবাহ করিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই যে শিক্ষার ব্যাঘাত হয় তাহা যিনি না মানিবেন তিনি একজন সুতার্কিক হইলেও আমাদিগের সমাজের অবস্থা জানিতে তাঁহার এখনও অনেক বাকি আছে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আমাদিগের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল লোকেরই যে প্রকার অর্থাভাব হইয়াছে যে প্রকার ভয়ানক জীবন সংগ্রাম উপস্থিত, তাহাতে বিবাহ করিয়া শিক্ষা করিবার অবসর পাওয়া দূরে থাকুক, সামান্য অন্ন বস্ত্রের জন্য চব্বিশ ঘণ্টা ভাবিতে হইতেছে। সাধারণ লোকের যখন এই প্রকার অবস্থা তখন অল্প বয়সে বিবাহ করিলে শিক্ষার কি প্রকার সুবিধা হয় তাহা একটু চিন্তা করিলেই লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন। যাঁহাদিগের অর্থসঙ্গতি নাই তাঁহারা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াও সংসারের ভার লইয়া অর্থ চিন্তায় বিব্রত হইয়া লেখা পড়া শিখিতে পারেন না আর যাঁহাদিগের অর্থের জন্য ভাবিতে হয় না সেই সকল ধনীসন্তান অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া বিলাসপরায়ণ হইয়া পড়েন ও লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া অসার আমোদ প্রমোদে ও নানা প্রকার পাপ কার্য্যে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতে পারেন বটে কিন্তু কয়জন লোকের এ সুবিধাটা ঘটিয়া উঠে? আর এরূপ হইলে অনেক স্থলে জামাতা স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুরের গলগ্রহ হইয়া পড়েন জামাতা স্বয়ং অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া বাটীতে অলস ও আমোদপ্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় কি এটা ভাল মনে করেন?

৫ম ও ৬ষ্ঠ তর্ক। বাল্যবিবাহে ধন সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়। বাল্যকালে বিবাহিত স্বামী অনেক সময় স্ত্রী পুত্রকে ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হয় না ইত্যাদি। যাঁহাদিগের ধন সঞ্চিত নাই তাঁহাদিগেরই ধন সঞ্চয় করিতে হয় সুতরাং লেখক মহাশয়ের জানা উচিত যে এ তর্কটি ধনী লোকদিগের বিরুদ্ধে খাটে না। মধ্যবিৎ গৃহস্থলোকের সন্তানেরা অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া ও বৎসর বৎসর এক একটি সন্তানরত্ন লাভ করিয়া কি করিয়া বর্ত্তমান সময়ে ধন সঞ্চয় করিতে পারেন তাহা লেখক মহা-

শয়ই জানেন। আমিত ইহাতে ধন সঞ্চয়ের কিছু মাত্র সুবিধা দেখি না।

৭ম তর্ক। বাল্যবিবাহে স্ত্রীদিগের মনের স্বাধীন ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি। সকল দেশেই সবল স্বার্থপর পুরুষ অবলা স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার ও তাহাদিগের ঈশ্বর প্রদত্ত অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ও অনেক হতভাগ্য পুরুষ রমণীকে একটি ভোগ্য বস্তু বলিয়া মনে করিতেন ও এখনও করেন। অনেক মুসলমান স্ত্রীলোকের আত্মা নাই বলিতেও ভীত ও কুণ্ঠিত হন না। যে স্বামী আপনার স্বাধীনতার মূল্য বুঝিয়াছেন তিনি কখন আপনার স্ত্রীর স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া সুখী হন না। আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকমাত্রেরই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই লেখক মহাশয়কে তাহা কে বলিল? আমাদের সমাজের হাড়িডোম প্রভৃতি গরিব লোকদিগের স্ত্রীগণ স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। অনেক ভদ্র মহিলাও আজ কাল শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী প্রভৃতি কার্য্যোনিযুক্ত হইয়াছেন। তবে সাধারণভাবে বলিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা নাই বটে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি গৃহকর্ম্মে, ধর্ম্ম-সাধনে স্বামীর অন্যায় কার্য্য প্রদর্শনে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে?

স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিলে যদি একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রজাদিগকে স্ব স্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা ও সেই সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি দিলে কি একটি প্রকাণ্ড রাজ্যে অশান্তি উপস্থিত হইবে না। তবে আমরা উপযুক্ত হইলেও কোন কোন অধিকার হইতে রাজারা আমাদিগকে বঞ্চিত করেন বলিয়া আমরা এত দুঃখিত হই কেন? যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শান্তি আছে তাহাই বাস্তবিক আদর্শ পরিবার। আর যে পরিবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিয়া একটা লোক দেখানগোছ শান্তি থাকে সে পরিবারে কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই সুখী হয় না। পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বাধীনতা হরণ করিলে কখনই প্রকৃত শান্তি থাকিতে পারে না। বাহিরে ভয়ে লোকে চুপ করিয়া থাকে কিন্তু মনে মনে সকলেই অসন্তুষ্ট হয়। আমার স্ত্রী যদি আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সহায় না হন যদি তিনি আমার হস্ত-পরিচালিত একটি যন্ত্রমাত্র হন তাহা হইলে বিবাহ করিয়া সুখ কোথায়? যে স্ত্রীর সহিত আমার এত নিকট সম্বন্ধ সেই স্ত্রী যদি আমার দরিদ্রতার সময় কিছু সাহায্য করিতে না পারেন যদি আমার পাপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলে আপনার স্বাধীন মত ও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা আমাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, যদি আমি কোন ভ্রমে পড়িলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতে না পারেন, যদি অন্যায় কার্য্য করিলে আমাকে ভর্ৎসনা না করেন তাহা

হইলে বিবাহ করিয়া লাভ কি ? বিবাহ কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থতার জন্য ? স্ত্রী যে প্রকার স্বামীর উপর নির্ভর করিবেন স্বামীও সেই প্রকার স্ত্রীর উপর নির্ভর করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে আমরা শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিই নাই বলিয়াই আমরা, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু পাই না। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে, গৃহে অশান্তি আসা দূরে থাক প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে। যেখানে প্রকৃত প্রেম সেখানে স্বাধীন ইচ্ছার বিসর্জ্জন স্বীকার করি। যে কার্য্য করিলে আমার প্রিয় কোন বন্ধুর মনে কষ্ট হয় আমরা ইচ্ছা থাকিলেও অনেক সময় সে কার্য্য করি না বটে, কিন্তু বিবেকের আদেশ হইলে সর্ব্বস্থলে পিতা, মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাহারও নিকট আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করা উচিত নয় তখন কাহারও ভালবাসার খাতির রাখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রেমে যাহার বিশ্বাস আছে সেকি কখন সংসারের ক্ষুদ্র, ভ্রান্ত, অজ্ঞান মানবের প্রেমে ভুলিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারে। যদি সম্পূর্ণ রূপে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে চাহ তবে ঈশ্বরের কাছে কর আর কাহারও কাছে করিও না। লেখক মহাশয়ের আদর্শ-স্ত্রীকে আমি আদর্শ-স্ত্রী করিতে পারি না।

৮ম তর্ক। এখন সমাজে বাল্যবিবাহ রহিত করা সহজ না বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা সহজ ? আমার বোধ হয় বাল্যবিবাহ রহিত করা সহজ। লেখক মহাশয় সমাজে রোগের জন্ম দিবার বিধান করিয়াছেন ও সেই সঙ্গে রোগের ঔষধও বিধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় লেখক মহাশয়ের রোগ জন্মাইবার বিধানটা নিশ্চিত, আর রোগ শান্তির উপায়টা অনিশ্চিত। তাই বলি যতদিন না সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে অন্ততঃ তত দিন কি বাল্যবিবাহ বন্ধ রাখা উচিত নয় ?

৯ম তর্ক। বাল-স্ত্রী প্রসূত সন্তান রুগ্ন ও ক্ষীণকায় হয় ইত্যাদি।

১২।১৩ বৎসরের বালিকারা সন্তান প্রসব করিয়া দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য ও নানা রোগগ্রস্ত হইতেছে ও সন্তানগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় প্রাণধারণ করিতেছে তথাপি লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে "দোষের গুরুত্ব এত অধিক নয় যে তজ্জন্য বাল্যবিবাহ একেবারে রহিত করা উচিত।" লেখক মহাশয়ের কি প্রকার গুরুত্ব জ্ঞান বলিতে পারি না কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা আর অধিক গুরুত্ব বুঝিতে পারে না।

১০ম তর্ক। বাল্যবিবাহে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি। লেখক এই তর্কের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অন্যায় যুক্তি দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন যদি কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে যাহাতে অল্প বয়সে সন্তান না হয় এরূপ চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। অল্প বয়সে সন্তান হইতে আরম্ভ হইলে কি অধিকাংশ স্থলে সন্তান উৎপত্তির ব্যবধান অধিক হয় ? আমরা একথার প্রমাণ ত সমাজে দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য।

অল্প বয়সে সন্তানগুলি উৎপন্ন হইয়া শৈশব কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া জন সংখ্যার হ্রাস করিলেও লেখক মহাশয়ের তাহাতে আপত্তি নাই। লেখক মহাশয় এ প্রকার নৃশংস কথা কি করিয়া বলিলেন বুঝিতে পারি না। লেখক মহাশয় কি নিতান্তই তর্কের জন্য তর্ক করিতেছেন? সাধারণ লোকের মতে মত দিলে কি অপমান বোধ হয়—না একটা সৃষ্টিছাড়া মত বলিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে বাহাদুরি প্রকাশ পায়?

আপনার একান্ত বশম্বদ

শ্রীহরকালী সেন।

প্রবাস পত্র।

সিন্ধুদেশ আর বাঙ্গলাদেশ কি তফাৎ! বাঙ্গলার হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে বাস করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের কাছে সিন্ধু কি নীরস কি শুষ্ক—যে দিকে চাও বালুময় ক্ষেত্র, চক্ষের আরাম আদবে নাই। কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও সুভদ্র হরিতক্ষেত্র নেত্রগোচর হয়। সিন্ধুদেশেও স্থানে স্থানে ভূমি উর্ব্বরা ও শস্য-শালিনী। শীকারপুরের জমি সারাল মন্দ নয়। এই মরুভূমিতে যে এত বড় বড় গাছ—ফলের গাছ, ছায়া তরু জন্মিতে পারে তা সহজে বিশ্বাস হয় না। এ সকল বৃক্ষের বয়স অধিক নয়, কুড়ি বৎসরের মধ্যে কর্ত্তৃপুরুষদের যত্নে এই ষ্টেসন গাছে গাছে ভরিয়া গিয়াছে। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম তার কমপৌণ্ডের বাগানে আম খেজুর ও অন্যান্য ফল ফুলের গাছ ছিল। আঙ্গুর পর্য্যন্ত জন্মিত। দ্রাক্ষালতার জন্য চাল বাঁধিয়া দিতে হয়, আমরা তাহার নীচে চলিয়া বেড়াইতাম। দুঃখের বিষয় যে তাহার ফল ভক্ষণ করিতে পারিলাম না, আঙ্গুর পাকিবার আগেই আমার অন্যত্রে বদলি হইল। অনেক সময় এইরূপ হয়, এক জায়গায় জিনিস পত্র কিনিয়া ঘরকন্না গুছাইয়া বসিয়া নিয়াছি এমন সময় বদলির হুকুম; অমনি তল্পিতল্পা বাঁধিয়া দূরে যাইতে হইল। সর্ব্বিসের প্রারম্ভে এইরূপ অস্থির পঞ্চমে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কলেক্টর কি জিলাজজ কি এরূপ একজন swell হইয়া দাঁড়াইলে আর কোন ভয় নাই, তখন একস্থানে স্থির হইয়া বসা যায়। কোন কোন জজ কিম্বা কলেক্টর এই রকম একটা জায়গা দখল করিয়া ঘরবাড়ী ফাঁদিয়া বসেন আর সেখান হইতে নড়িতে চান না। তাই বলিয়া সিন্ধুদেশ ছাড়িতে আমার যে বড় কষ্ট হইয়াছিল তা নয়। ঐ সৃষ্টি ছাড়া বিজন গহনে বাস করা নির্ব্বাসন বলিলেই হইল, সিন্ধু হইতে গুজরাটে গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমরা যখন প্রথমে

সিন্ধুদেশে যাই তখন বোম্বাই হইতে সমুদ্র পথে ব্রিটিস-ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে করিয়া করাচী-বন্দরে উপস্থিত হই, সিন্ধু ছাড়িয়া যাইবার সময় রেলগাড়ি করিয়া উত্তরপূর্ব্ব মুখে চলিলাম। মুলতান লাহোর হইয়া আম্বালা ষ্টেসন পর্য্যন্ত গেলাম, তথা হইতে কতক ডাকের গাড়ী কতক ঝাঁপানে করিয়া সিমলার পাহাড়ে চড়া গেল। সিমলা কি চমৎকার জায়গা, তার আবহাওয়া কি চমৎকার! কিন্তু যাহা দেখিবার আশা ছিল তাহা হইল না। কাল্পনিক সিমলা ও বাস্তবিক সিমলায় অনেক তফাৎ। সিমলা হইতে হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয় না। সেই দেবতাত্মা হিমালয়—

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য

স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ

কল্পনায় যাহা মুদ্রিত আছে তাহার অনুরূপ ঠিক দেখিলাম না। বাড়ী ঘর দুয়ার—, মানুষের কারিগিরিতে তাহার দেবত্ব ঘুচিয়া গিয়াছে। সিমলায় ৩।৪ দিনের অধিক থাকিতে পারি নাই—আর বেশী সময় ছিল না। মনে কর আমি সেখানে সপরিবারে গিয়াছি—পরিবার রাখিয়া নিজস্থানে একাকী গমন করিতে হইবে। হাতে ঐ সময়—উহার মধ্যে বাড়ী ঠিক করা—দুইটি স্কুল ঠিক করা—একটা ছেলেদের স্কুল একটা বালিকাবিদ্যালয়—সব গুছাইয়া দিয়া যাইতে হইবে—ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছ পাহাড়ের শোভা দর্শন করিবার আমার কত অল্প অবসর ছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া দিল্লী চলিয়া আইলাম। দিল্লীতে দুই এক দিন থাকিয়া মোগল সম্রাটদের কীর্ত্তিকলাপ যত পারিলাম দেখিয়া লইলাম, পরে রাজপুতানা লাইন দিয়া আমার গম্যস্থানে উপনীত হইলাম।

সিন্ধী কুলকামিনীদের কথায় মনে করিও না যে বোম্বায়ের সর্ব্বত্রই এই দুর্ব্বিবহ অবরোধ প্রথা প্রচলিত। যে ভাগে মুসলমান আধিপত্য প্রবল অথবা মুসলমান আদর্শে সমাজ গঠিত সেই সকল প্রদেশে এই প্রথা বদ্ধমূল। যেখানে হিন্দুরা আপনার স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারিয়াছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা প্রত্যক্ষ হয়। সে স্বাধীনতার দৌড় যে বড় বেশী তা নয়। ইংরাজ-সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যেরূপ মেশামিশি তাহা তত দূর যায় না, আবার আগন্তুক দেখিয়া কুলস্ত্রী ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইবে,—তেমন সঙ্কোচ. ভাবও দৃষ্ট হয় না। পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কথা কওয়া দূষ্য নহে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলেও গৃহিণী অন্ন পরিবেশন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পারসী স্ত্রীদের স্বাধীনতা ইহা অপেক্ষাও এক মাত্রা অধিক—তাহার কারণ তাহারা ইউরোপীয় সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিতে সমধিক তৎপর। বিজাতীয় রীতি নীতি গ্রহণ করিতে তাহাদের বিশেষ কোন বাধা নাই। প্রথমত ভারতবাসীদের নিকট তাহারা নিজেই বিদেশী। তাহারা কয়েক শত বৎসর মাত্র এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছে। এখানকার কোন জাতির সঙ্গে তাহারা বিবাহ সূত্রে মিলিত হয় নাই। এদেশের

উপর তাহাদের ততটা মমতা প্রত্যাশা করা যায় না। অতীতের বল তাহাদের উপর তত আক্রোশ করে নাই, দেশাচারের অভেদ্য শৃঙ্খলবন্ধন তাহাদের উপর নাই। আর এক কথা তাহাদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা নাই সুতরাং ভিন্ন জাতিদের সঙ্গে মেলা মেশা তাহাদের পক্ষে সহজ। সাগর পার হইয়া ইংলণ্ড যাইতে হইলে জাতি যাইবার ভয়ঙ্কর কোন দৈত্য আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়ায় না। আশ্চর্য্য এই, পারসীদের এই ক্ষুদ্র দল, ভারতবাসীদের মধ্যে এক বিন্দু বলিলেই হয়, আর জাতিভেদের নিয়ম বহির্ভূত হইয়াও তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, বিবাহ বন্ধনে অন্য কোন জাতির সঙ্গে মিশাইয়া যায় নাই। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজের তুলনায় তাহাদের সমাজ পরিবর্ত্তন ও উন্নতিশীল বলিতে হইবে। আচার ব্যবহার বিষয়ে ইংরাজ অনুকরণে পারসীরা বিলক্ষণ মজবুত। পারসীরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে আসে তখন তাহারা হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির মনোরক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। তাহাদের চালচলন দেশীয় অনুকরণে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্ত হইল। হিন্দুদের অনুরোধে গোমাংস বর্জ্জন করিতে হইল। মুসলমানদের যাহা 'হারাম' তাহাও তাহাদের বর্জ্জনীয়। তাহাদের পরিচ্ছদেও তেমনি বদল—পুরুষদের পাগড়ী, স্ত্রীদের শাড়ী অনেকটা গুজরাটী ধরণের অনুকরণ। পারসীদের কথা (Motto) এই, যখন যেমন তখন তেমন। ইংরাজ-রাজ্য হইয়া অবধি তাহাদের সামাজিক নিয়ম ক্রমে ইউরোপীয় ধরণে গঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে। প্রথমে বোম্বাই আসিয়া আমার চক্ষে যাহা প্রথম ঠেকে তাহা স্ত্রী-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে কলিকাতা ও বোম্বাই মধ্যে ভয়ানক প্রভেদ। কলিকাতায় ভদ্র স্ত্রীগণ সকলেই অন্তঃপুরে রুদ্ধ, বাহিরে কোথাও একটী কুলস্ত্রীর মুখ দেখিবার যো নাই। বোম্বায়ে পথে ঘাটে যেখানে যাও ভদ্র মহিলা চ'খের সামনে পড়ে। গবর্ণমেণ্ট-হৌসের অভ্যাগতের মধ্যে—বিদ্যালয়ের ছাত্র পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষে সমবেত-জনতা-সমূহে দেশীয় স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত দেখিবে। বাগান, বন্দর, বাও বাজিবার স্থান প্রভৃতি নগরের প্রকাশ্য-স্থানে সন্ধ্যা-বায়ু সেবনের জন্য দেশী ও ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ একত্রিত হয়; হিন্দু ও পারসী মহিলারা চিত্র বিচিত্র সাড়ীতে সজ্জিত হইয়া সেই সকল স্থানের শোভা সম্পাদন করে।

বলিতে কি, অন্তঃপুরপ্রথা আমার নিতান্ত অনিষ্টকারী-কুপ্রথা বলিয়া মনে হয়, তাহাতে অবলাদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্যের হানি, সামাজিক হানি। সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অবরুদ্ধ ও বিকল হইলে অপরার্দ্ধ কিরূপে সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল হইবে বল? সে দিন পুনার বালিকা বিদ্যালয়ের ইট-পত্তন কালে বম্বের গভর্ণর সার জেম্স—তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এ সম্বন্ধে বেশ দু এক কথা বলিয়াছিলেন—অনুবাদ না করিয়া নীচে তাহা তুলিয়া দিলাম *। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অবস্থা উন্নতি করিতে চাও তবে আপাতত বোম্বায়ের আদর্শ

* But the custom of secluding your women is not sanctioned by antiquity and it is a custom which not only degrades them, but reduces them to abject slavery. You cannot degrade your wives and the mothers of your children from their rightful position in this life, without degrading your race to a slavery, that is sure to act injuriously on yourselves.

গ্রহণ করিতে পার। আমাদের অনেকের ভয় হয় স্ত্রীলোকেরা বাহিরে গেলে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে, আমাদের দেশের একজন সম্রান্ত লোকের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়। তিনি বলেন আমাদের পুরুষেরাই আপনারা আপনাদেব রক্ষা করিতে অপারক, ঘবের মেয়েকে কি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে, যদি কেহ তাহাকে অপমান করে কিরূপে রক্ষা করিবে।" তাহার উত্তর—এ ভয় কেবল কল্পনা মাত্র, ফলে ওরূপ ঘটনা অতি বিরল। এ মুসলমান রাজ্য নয় যে অত্যাচার-ভয়ে কুলকামিনীদিগকে গৃহ রুদ্ধ রাখা আবশ্যক;ইহা ইংরাজরাজ্য, স্ত্রীলোকের সম্মাননা যাহার প্রধান ধর্ম্ম। ওরূপ আশঙ্কা যে অমূলক তাহা আমার নিজের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখিতেছি। প্রথমে যখন আমি বোম্বায়ে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনি তখন আমাকে কত লোকে কতপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়াছিল, কিন্তু কাজে দেখিতেছি সে সকল কিছুই নয়। আমবা স্বামী স্ত্রীতে প্রকাশ্য ভাবে এতদিন বিদেশে ঘুরিলাম, কই আমাদের ভাগ্যে ত কখন কোন বিপদ ঘটে নাই। কেবল আমার উপদেশ এই যে, বাহিরে যাইতে হইলে রীতিমত ভদ্রবেশ পরিয়া যাওয়া আবশ্যক। 'জনানা' পক্ষপাতীর প্রতি আমার আর একটী কথা বলিবার আছে। যদি বল আমরা আত্মরক্ষায় অক্ষম তবে নিদান-পক্ষে আমাদের কি তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহা কি দেখিতেছ না যে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসাদে আমাদের সে শিক্ষা লাভ হইতে পারে? এ জাতীয় কলঙ্ক দূর হইতে পারে? ভারতমহিলা বল, বিদ্যা ও স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিলে তাহার আভা পুরুষ-সমাজে প্রতিফলিত হইবে ইহা ত ধরা কথা—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এ দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শুদ্ধ তাহা নহে। আর এক দিক দিয়া দেখ, স্ত্রীরক্ষণের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমাদের বল ও সাহস দায়ে পড়িয়া বৃদ্ধি হইবে কি না? আমরা নিজে অনেক সময় অকাতরে অত্যাচার সহ্য করিয়া যাই—কেহ একগালে চড় মারিলে আর একগাল তাহাকে ফিরাইয়া দিই, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অপমান সহ্য করে এমন কাপুরুষ অতি অল্প। স্ত্রীকে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে দুর্ব্বল সেও সবল হয়—ভীরুও অভয় হয়। অবলাকে অন্তঃপুর-রুদ্ধ নিতান্ত 'অবলা' করিয়া রাখিলে কখনই আমাদের জাতীয়-ভীরুতা দূর হইবে না।

এদেশের হিন্দুদের আচার ব্যবহার বর্ণনা করিতে গেলে সর্ব্বাগে জাতিভেদ-প্রথার উল্লেখ করিতে হয়। আমি যত দূর দেখিতে পাই এখানে জাতিভেদের নিয়ম কিছু কড়াক্কড়। এই হেতু এদেশে হিন্দুদের মধ্যে ইউরোপ-যাত্রীর দল অতি অল্প, কেহ সাহস করিয়া সাগর-পার হইলে শেষে জাত লইয়া তাহাকে মহা বিব্রত হইতে হয়। আমাদের দেশে হিন্দু-সমাজের ওদিকে অত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নাই—ইংলণ্ডফেরতা বাঙ্গালী তাহার জাতির মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কোন গুজরাটি কি মহারাষ্ট্রীহিন্দু বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে জাতে উঠিবার জন্য মহা হাঙ্গাম বাধিয়া যায়—একটা প্রকাশ্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। সেদিন এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মার নাম অবশ্য শুনিয়াছ। তিনি প্রোফেসর মনিয়র উইলিয়মের সহিত বিলাত যাত্রা করিয়া অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কালেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি সংস্কৃতে একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যখন এদেশ হইতে যান তখন লাতিন গ্রীকের ক অক্ষর জানিতেন না। অথচ অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই কঠিন ভাষার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যে

ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে Oriental congress বসিয়াছিল তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি আইন শিক্ষা করেন ও বারিষ্টর হইয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়াই তিনি রতলমের দেওয়ানের পদ পাইয়াছেন—ইহাতে তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলেই আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যাহার জন্য পণ্ডিতবরের কথা পাড়িলাম তাহা এই, তিনি একটী ভীরুতার কার্য্য করিয়া অনেককে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। তাঁহার জাতির লোকের অনুরোধে তিনি নাসিকে গিয়া শিরোমুণ্ডণ ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। পবিত্র গোদাবরীতে স্নান করিয়া ইউরোপ প্রবাসের পাপ প্রক্ষালন করিয়াছেন। ইহাতে নানাদিক্ হইতে নানান্ কথা উঠিয়াছে। তিনি যে এতদূর অবনতি স্বীকার করিবেন তাহা আমাদের মনে হয় নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারত প্রত্যাগত হইয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে বিলাতে সঙ্গে লইয়া যান তাহাতে বোধ হইল জাতিভয়ে তিনি বিচলিত হইবার পাত্র নন। এক্ষণে দেখা গেল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতভায়াদের কঠোর শাসনে নতশির হন না এমন সাহসী হিন্দুযুবা এদেশে কেহ আছে কি না সন্দেহ। প্রথমে যখন একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ এদেশ হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জাতিবর্গের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও শেষে তিনি পার পাইলেন না। তাঁর জাতি দুই দলে বিভক্ত হইল, এক দল তাঁহার পক্ষ এক দল বিপক্ষ। কিন্তু এ অনেক দিনের কথা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ২০, ২৫ বৎসরের মধ্যে কি এ সম্বন্ধে কিছুই উন্নতি হয় নাই? এখনো কি জাতির এমন কঠোর শাসন যে তাহার ভয়ে আপনার মত ও বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিতে হইবে? কোন হিন্দুর কি এতটুকু সাহস নাই যে আপনি যাহা সত্য বলিয়া জানেন, যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তাহা অকুতোভয়ে অবলম্বন করিতে পারেন—আপনার আন্তরিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারেন? বহুরূপীর মত একবার ইউরোপীয় সভ্যতার সং সাজিয়া নৃত্য করা আবার তাহা পাপ বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া এই কি সত্য-নিষ্ঠ সাহসী-পুরুষের কার্য্য।

জাতিভেদের ন্যায় বাল্যবিবাহ আর চির-বৈধব্য প্রথা হিন্দু সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু চির-বৈধব্য-প্রথা যে এখানকার সমস্ত হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা নহে। এমন অনেক জাতি আছে যাহার মধ্যে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তে যাহার চলন সেই সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা দৃষ্ট হয়। এই প্রথার আনুষঙ্গিক এক ভয়ানক কুৎসিত নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে—সে কি না বিধবার মস্তক মুণ্ডণ। আমাদের বিধবাদের অনেকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়—উপবাস, একসন্ধ্যা আহার, অলঙ্কার-পরিহার, কিন্তু ভাগ্যক্রমে শিরোমুণ্ডণ-প্রথা তাহার উপর নাই। এদেশীয় বিধবাদিগের সে সব ত আছেই তাহার উপর এ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। ভবিষ্যতে বিধবা-স্ত্রীর যে-সকল জ্বালা যন্ত্রণা অদৃষ্টে আছে পতি বিয়োগের পরক্ষণেই নাপিতের হাতে কেশচ্ছেদন তাহার পূর্ব্বাভাস। স্ত্রীলোকের পক্ষে এ যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এ অপেক্ষা সহমরণ অনেক গুণে ভাল ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে সতীর সকল কষ্টের অবসান হইত। শিরোমুণ্ডণ কিম্বা মুণ্ডচ্ছেদন যদি কোন রমণীর এ

ত্বয়ের একটী বাছিয়া লইতে হয় তাহা হইলে বোধ করি সে বেচারী শেষোক্ত দণ্ডই ঘাড় পাতিয়া লয়। স্ত্রীলোকের যা অমূল্য আভরণ—যে 'রূপের নিগড় কি অমরে কিবা নরে না বাঁধে কাহারে'?—সেইটী হরণ করিতে পারিলেই নির্ভীক হওয়া গেল—আর তাহার রূপলাবণ্যের কোন গৌরব রহিল না—তাহার সতীত্বের প্রতি আঘাতের কোন শঙ্কা রহিল না এই উদ্দেশ্যেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহারাও ব্রাহ্মণদের দেখাদেখি ঐ কঠোর নীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। কুদৃষ্টান্তের এমনি বল! সে দিন দেখিলাম আমার এক কায়স্থ বন্ধু, রায় বাহাদুর, আপনার পরিবারস্থ এক তরুণবয়স্কা বিধবা কন্যার শিরোমুণ্ডণে স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিলেন। 'স্বচ্ছন্দে' বলাটা ঠিক হইল না—জাতির অনুরোধে বলা উচিত, কিন্তু তিনি এক জন শিক্ষিত নব্যদলের লোক হইয়া এরূপ স্থলে এ অনুরোধ এড়াইতে না পারিলেন ত আর কি হইল? সমাজসংস্কার-আশা আর কোথায় রহিল!

বাল্য বিবাহ আর এক বিষম রীতি। শুধু বঙ্গদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার গরলময় ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ হইতে বিদায় করিয়া যে কি স্বর্গ সুখ লাভ করেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা তাহার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেওয়া—এ সকল গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার বিবাহ দিতেই গুরুজনেরা ব্যস্ত। এদেশে বালক বালিকার বিবাহ পুতুলে পুতুলে বিয়ের মতন। একজন গাইকওয়াড় ছিলেন তিনি পায়রার বিয়ে দিতে বড় ভাল বাসিতেন—তাঁহার সভাসজ্জন নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ধুমধামে কপোত কপোতীর বিবাহোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন—এইসব বালক বালিকার বিবাহ অনেকটা সেইরূপ। এ দেশে দশ বার বৎসরের বালক ও সাত আট বৎসরের বালিকা সচরাচর উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইরূপ বাল্যবিবাহ হইতে হিন্দুসমাজের যে কত অনর্থোৎপত্তি হইতেছে বলা যায় না। আমি বলিতেছি না যে আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের উপযোগিতা আদপে নাই—কিন্তু দেখিতে গেলে অনর্থের ভাগই অধিক তাহার কোন সন্দেহ নাই। বালিকা প্রসূতি,—স্কুলের ছাত্রের উপর বৃহৎ পরিবার পোষণের ভার,—নিবীর্য্য রুগ্ন সন্তান সন্ততি, শিক্ষার ব্যাঘাত, দারিদ্র্য, অকাল জন্ম, অকাল মরণ, অকাল পক্কতা, অকাল জীর্ণ দশা, এই সকল অনিষ্ট কাহার চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক করে না, তাহা আমাদের সমাজে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত রহিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের শরীর মনের শক্তিসকল অকালে পরিপক্ক হয় এই জন্য তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়াই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার ত একটা সীমা প্রকৃতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকারা কখন বিবাহের উপযুক্ত হইতে পারে না। চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতেছি যে অমুক বয়সের পূর্ব্বে আমাদের শরীরের পূর্ণতা লাভ হয় না সেই পূর্ণ বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অনিষ্টকারী—সে বিবাহের ফল অমঙ্গল একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে এ রোগের ঔষধ কি? এ সকল অনিষ্ঠ নিবারণের উপায় কি? মালাবারি নামক প্রসিদ্ধ পারসী লেখক বালবিবাহ ও বলাৎকার-বৈধব্য বিষয়ে এক প্যাম্‌ফ্লেট লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এখন

প্রশ্ন এই যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য কোন আইন করা বিধেয় কি না? অনেকে ইহার বিপক্ষে মত দিবেন সন্দেহ নাই, তাঁহারা বলিবেন দেশাচার সংশোধনের জন্য গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হওয়া অন্যায়। কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহার পক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে। সমাজের সুখশান্তি-রক্ষণ—অনিষ্ঠ নিবারণ এই উদ্দেশেই আইন প্রবর্ত্তিত হয়—তাহাতে কখন যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বতা হয় তাহার উপায়ান্তর নাই। এই স্বাধীনতা টুকু হরণ করা সমাজের উপকারের জন্যই অনেক সময় আবশ্যক হয়। আমাদের দেশের অনেক সামাজিক কুরীতির উপর আইনের হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে নহিলে তাহার উচ্ছেদসাধন কঠিন হইত। ভ্রূণহত্যা—নরবলি—সহমরণ প্রভৃতি এদেশের চিরন্তন প্রথা-সকল আইন দ্বারা নিবারিত হইয়াছে, তবে এটা হয়না কেন? যে সকল বিষয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের হিতাহিত নির্ভর করে অনেক সময় আইন তাহার উপর হস্তপ্রসারণ করেন। যে রীতি অনুসারে বালক বালিকা চিরকালের জন্য অকাট্য বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে, যাহার উপর তাহাদের চিরজীবনের সুখদুঃখ নির্ভর, তাহাতে রাজার নিয়ম হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না এমন কখনই হইতে পারে না। আইন দ্বারা বিবাহের একটা বয়স নির্দ্দিষ্ট হওয়া কি ভাল নয়? পুরুষের ধর ১৮ বৎসর মেয়েদের ১৫ বৎসরের নীচে বিবাহ নিষেধ এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া কি নিতান্ত অন্যায়? কেহ বলিতে পারেন এরূপ করিতে গেলে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। কিন্তু আমাদের কোন্ শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ অনুমোদন করে? পুরাতন আর্য্যদিগের যে চতুরাশ্রমের নিয়ম ছিল—ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য—তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অধ্যয়নের বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া কখনই সংসারের ভার গ্রহণ করিবার রীতি ছিল না। মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিবার যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে পুরুষদের সম্বন্ধে তাহা কিছুই নাই। অতএব নিদান পুরুষের বিবাহের একটা বয়স সহজে ঠিক করা যাইতে পারে—মেয়েদের বয়স পরে আপনা হইতেই নিয়মিত হইবে। মালাবারি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইউনিবর্সিটি হইতে অবিবাহিত ছাত্রদের অনুকূলে কোন বিশেষ নিয়ম প্রচারিত হউক। তিনি আরো বলেন, যাঁহাদের হাতে চাকরি বিতরণের ক্ষমতা আছে তাঁহারা বিবাহিত পুরুষদের ছাড়িয়া অবিবাহিত কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে বাছিয়া লইতে উদ্যত হউন তাহা হইলে ক্রমে বিবাহ করিবার নেশা ছুটিয়া যাইবে। এ সকল প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। বিদ্যার চাবি, ধনের চাবি অবিবাহিতের হাতে—লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রসাদ আইবড়র প্রতিই মুক্তহস্তে বিতরিত হইবে আর বিদ্যার দ্বার বিবাহিত পুরুষের প্রতি রুদ্ধ হইবে, স্ত্রী পুত্র কন্যা-ভারাক্রান্ত-পুরুষ কর্ম্মের অভাবে শুকাইয়া মরিবে এ নিয়ম নিতান্ত অন্যায়। সে যাহা হউক আমাদের সমাজ সংস্কারকেরা চেষ্টা করিলে এ কুরীতি উৎপাটনে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা মিলিয়া যদি এক সমাজ বন্ধন করিয়া অমুক বয়সের আগে বিবাহ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা হইলে আপনা হইতেই ক্রমে বিবাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। এবিষয়ে তোমার কি বক্তব্য জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মেহেদি।

(পৃথিবী ধ্বংশ, সম্বন্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যদ্বাণী)

হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, খৃষ্টান, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই পৃথিবীর ধ্বংশ অথবা প্রলয়ের কথা বিশ্বাস করে, সকলেই বলিয়া থাকে যখন পৃথিবী পাপে ডুবু ডুবু হইবে, ধর্ম্ম পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সত্য ও ন্যায় ধরাধাম হইতে বিদূরিত হইবে, ধর্ম্মের নামে শত শত অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, মনুষ্যের আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা কেবল সাংসারিক উন্নতির দিকে ছুটিবে, যখন অন্যায়, অত্যাচার জন-সমাজের নিত্য-কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে, বিবাদ, বিসম্বাদ অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-যন্ত্রের মূলদেশ বিকম্পিত হইবে, তখন ভগবান এই পাপময় স্বার্থপরতাময়, বিবাদ বিসম্বাদ-ময় পৃথিবী ধ্বংশ করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি, সত্য ও ন্যায়, সুখ ও শান্তির রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই বিশ্বাস হইতেই হিন্দুদের কল্কী অবতার, মুসলমানদের মেহেদি, ইহুদিদের মেসোয়ার আগমন, খৃষ্টানদের খৃষ্টের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই জন্যই এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রলয়ের দিন গণনা করিয়া থাকে, প্রলয়ের নামে মাতিয়া উঠে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে একবার ইয়ুরোপখণ্ড এইরূপ প্রলয়ের ভয়ে আলোড়িত হইয়াছিল, নাইট ও বেরণগণ বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় রত হইল, পাপানক্ত পাপ ছাড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান দক্ষিণা আরম্ভ করিল, সংসারী সংসার ছাড়িয়া উদাসীন সাজিল, উদাসীন গভীর ভাবে ধ্যানে মগ্ন হইল, চারিদিগে চিন্তা, চারিদিগে ব্যস্ততা, কৃষক আর হল চষে না, ধীবর আর মাছ ধরে না, ব্যবসায়ী আর দ্রব্য বেচেনা, সকলের মুখেই এক কথা, সকলের মনেই এক প্রার্থনা; চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, প্রলয়, পৃথিবী ধ্বংশ, এই কথা বলিয়া সকলেই শেষের সে দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, প্রেমিক প্রেমের চিন্তা ভুলিল, ভাবুক ভাবুকতা ছাড়িল, কবি তাঁহার বীণা দূরে ফেলিয়া ভগবানের নাম জপিতে লাগিল। সেণ্ট বার্ণার্ড প্রত্যেকের হৃদয়ে চিন্তার তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া তৃতীয় ক্রুসেড্ ঘোষণা করিলেন, রাজা, প্রজা, ধনী, দীন, উচ্চ, নীচ নির্ব্বিশেষে সকলকেই সেরাসিনদের হস্ত হইতে জেরুজেলেম নগর উদ্ধার করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কেবল খৃষ্টান সম্প্রদায়ই এই আন্দোলনবন্যার স্রোতে ভাসিয়াছিল, এমত নহে। মুসলমানগণও মেহেদির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারাও তরবারির সাহায্যে অবিশ্বাসী-দিগকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্য সংস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সময় অনন্ত স্রোতে মিশিল, পৃথিবী ধ্বংশ হইল না, তাহাদের হৃদয়ের ভয় বিভীষিকা হৃদয়েই মিলাইল। প্রায় দশ শত বৎসর কাল নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, এই দশ শত বৎসরের শেষ ভাগে আবার মুসলমানগণ ধূয়া ধরিয়াছে, তবে এইবার তাহারা কল্পনার ছায়া দেখিয়া ভুলে নাই, মিশর দেশে মেহেদির আগমন প্রত্যক্ষ করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, প্রথমতঃ মনুষ্যের হস্ত পরিমিত একখণ্ড মেঘ মিশর গগনে দেখা দিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; মিশর-ভূমে তুমুল

সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, খৃষ্টান ও মুসলমান রক্তে নীল নদীর জল অনুরঞ্জিত হইতেছে। মেহেদি নামের মোহময় মন্ত্র-ধ্বনিতেই মিশরযুদ্ধ এই প্রকার ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, এই নামেই মুসলমান-গণ দলেদলে সমরক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে, ইংরেজ সেনানী ষ্টুয়াটের মস্তক কাটিয়া বিজয়ভেরী বাজাইতেছে, বীরবর গর্ডণকে হত্যা করিয়া সকলের হৃদয় শোকপূর্ণ করিয়াছে। মেহেদি কে এবং তাহার এই গৌরবান্বিত পদে অধিকার আছে কিনা বলিবার পূর্ব্বে মুসলমানদের মতে পৃথিবী ধ্বংশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা প্রয়োজন। মুসলমান শাস্ত্রকারগণ বলেন যে বিনষ্ট পৃথিবী পুনঃ সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে অনেকগুলি চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে, তন্মধ্যে আটটী সামান্য চিহ্ন, সতেরটী বিশেষ চিহ্ন দেখা যাইবে। সামান্য চিহ্নগুলি এই—

১। মনুষ্যদিগের মনে বিশ্বাস কমিয়া যাইবে।

২। ছোট লোক উচ্চপদ গ্রহণ করিবে।

৩। দাসীগণ প্রভুত্ব করিবে, তাহারা তাহাদের প্রভুদিগের মাতৃস্থান অধিকার করিবে। সেইল বলেন ইহার অর্থ এই যে পৃথিবী ধ্বংশের পূর্ব্বক্ষণে মানুষ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইবে।

৪। গোলমাল বিবাদ এবং প্রজা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে।

৫। তুরুকদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবে।

৬। দুঃখ এবং বিষাদ এত হইবে যে মানুষ কবরে যাইয়া শান্তিলাভ করিতে লালায়িত হইবে।

৭। ইরাক এবং সিরিয়া প্রদেশ কর দিতে অস্বীকার করিবে।

৮। মদিনা নগরের অট্টালিকা সমুদায় আহাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

বিশেষ লক্ষণ গুলি এই—

১। পশ্চিমদিকে সূর্য্য উঠিবে।

২। ভূগর্ভ হইতে একটী অস্বাভাবিক জন্তু উৎপন্ন হইয়া মক্কার মন্দির অথবা সফা পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, ঐ সকল স্থান হইতে ইহা দৃষ্ট হইবে না, কিন্তু অন্যস্থান হইতে বেশ দেখা যাইবে, এই জন্তুটীর ষাঁড়ের মস্তক, বরাহের চক্ষু, হস্তির কর্ণ, হরিণের শৃঙ্গ, উষ্ট্র পক্ষীর গলা, সিংহের বক্ষ, ব্যাঘ্রের বিচিত্র চর্ম্ম, বিড়ালের পৃষ্ঠ মেষের লেজ, উষ্ট্রের পা, গাধার শব্দ থাকিবে, কাহার কাহার মতে ইহা ষাট হাত উচ্চ হইবে, কেহ কেহ বলে ইহা মেঘ এবং আকাশ স্পর্শ করিবে, ইহার সঙ্গে মূষার ঐন্দ্রজালিক যষ্টি এবং সলমানের মোহর থাকিবে। ইহার গতি শক্তি এত দ্রুত হইবে যে কেহই ইহাকে ধরিতে পারিবে না এবং কেহই ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা বিশ্বাসীদিগের মুখ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে "মুমেন" (বিশ্বাসী) বলিয়া চিহ্নিত করিবে, এবং মোহর দ্বারা "কাফের (অবিশ্বাসী) চিহ্নিত করিবে।

৩। গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবে, তাহাতে সত্তর হাজার আইজেকের বংশধর, সত্য ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, এবং ঈশ্বর মহান্' এই শব্দ ধ্বনিত করিয়া কনষ্টান্টিনোপল নগরের প্রাচীর ভগ্ন করিবে, কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য বিভাগ করিবার সময় খৃষ্টবিরোধীদিগের আগমন সংবাদ পঁহুছিবে সুতরাং তাহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

৪। দজ্জাল অর্থাৎ প্রধান খৃষ্ট-বিরোধী গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সত্তর হাজার য়িহুদি সমভিব্যাহারে ইস্পাহান হইতে আগমন করিবে; তাহার একটী মাত্র চক্ষু থাকিবে এবং ললাট দেশে ক,ফ,র (কাফের) অক্ষর অঙ্কিত থাকিবে, কাহারও মতে এই

অস্বাভাবিক জন্তু চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে, কাহারও মতে আরও অধিককাল থাকিবে। সেই সময় সে ধরাতল ছারখার করিবে। কিন্তু মক্কা অথবা মদিনা নগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না, স্বর্গীয় দূত গণ ঐ নগর রক্ষা করিবে, অবশেষে খৃষ্ট কর্ত্তৃক ঐ জন্তু নিহত হইবে।

৫। ইহুদিগণ কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, যিশু ডামস্কস্ নগরের পূর্ব্বদিগস্থ উচ্চ ধবল প্রাসাদের নিকটে অবতরণ করিবেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার সন্তান সন্ততি হইবে, দজ্জালকে বধ করিবেন এবং পৃথিবীতে চল্লিশ বৎসর, কাহারও কাহারও মতে চব্বিশ বৎসর কাল থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিবেন। তাঁহার অবস্থান কালে হিংসা, বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইবে, সুখশান্তি বিরাজ করিবে, সিংহ শার্দ্দূল মেষ ভল্লুক, সখ্যভাবে একত্র বাস করিবে, সর্প তাহার ক্রূর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শিশুদের সহিত ক্রীড়া করিবে।

৬। ইহুদিদের সহিত মুসলমানদের সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে, মুসলমানগণ বৃক্ষ এবং প্রস্তরের সাহায্যে অসংখ্য ইহুদি বিনাশ করিবে, কেবল মাত্র যাহারা ঘরকদ বৃক্ষের পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহারা রক্ষা পাইবে।

৭। গোগ এবং মেগোগ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিবে, তাহারা যুদ্ধ যাত্রার সময় পান করিয়া টাইবিরিয়াস্ হ্রদের জল শুষ্ক করিবে, যিশু এবং তাহার সঙ্গিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে, অবশেষে যিষুখৃষ্টের প্রার্থনায় ঈশ্বর তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের মৃত দেহে পৃথিবী পূর্ণ করিবেন, শবের দুর্গন্ধে বায়ু কলুষিত হইবে, যিষু এবং তাহার সঙ্গিদের প্রার্থনায় পক্ষী প্রেরিত হইবে, পক্ষীগণ সেই সকল মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান করিবে, মুসলমানগণ সাত বৎসর কাল মৃত শত্রুগণের ধনু, তীর তূণীর সকল দগ্ধ করিতে ব্যাপৃত থাকিবে; পরিশেষে বৃষ্টির দ্বারা সমস্ত পরিষ্কারের কার্য্য সম্পাদিত হইবে, পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে।

৮। ধূমে সমস্ত পৃথিবী আবৃত হইবে।

৯। চন্দ্রগ্রহণ হইবে।

১০। আরবগণ একশতাব্দীর জন্য পৌত্তলিকতা গ্রহণ করিবে এবং কেবল মাত্র অসৎলোকই উন্নতি লাভ করিবে।

১১। ইউফ্রেটিস নদীবক্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ আবিষ্কৃত হইবে, তাহার জল শুষ্ক হইবে, জলাভাবে বহুসংখ্যক লোক প্রাণ ত্যাগ করিবে।

১২। ইথপিয়েরা মক্কার মন্দির ভগ্ন করিবে।

১৩। পশু এবং অচেতন পদার্থের কথা কহিবার শক্তি জন্মিবে।

১৪। হেডজাজ অথবা কাহারও কাহারও মতে যেমেন প্রদেশে প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

১৫। কাতানের একজন বংশধর তাহার গদা দ্বারা সমুপস্থিত লোকগণ তাড়াইবে।

১৬। সিরিয়া, ডেমোমনিয়া হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রকৃত বিশ্বাসী এমন কি যাহাদের হৃদয়ে কণিকামাত্রও বিশ্বাস থাকিবে তাহাদিগকে কোরাণের সহিত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

১৭। অবশেষে মেহেদি অবতীর্ণ হইবেন।

মিশর দেশে সম্প্রতি যে মেহেদি অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার ইমাম মেহেদির পদে অধিকার আছে কি না জানিতে হইলে আমাদিগকে মহম্মদের পরবর্ত্তী দ্বাদশ জন ইমামের ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচনা করিতে হইবে, কারণ কাহারও কাহারও মতে সর্ব্বশেষ ইমাম দ্বারাই উভয় পদ একত্রিত হইবে; মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ

ও তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে; ইতিহাস পাঠক-দিগের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় অতীব ক্ষমতাশালী এই দুই সম্প্রদায়ের বিষাদময়ী কাহিনীতে ভারত ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা পূর্ণ। সুন্নি তুরক্ক সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহারা মহম্মদের জামাতা আলির পূর্ব্ববর্ত্তী আবুবেকার, ওমার, ও উথামকে মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু সিয়ারা মহম্মদ ও আলির মধ্যবর্ত্তি তিন জন খলিফাকে পঞ্চম খলিফা মোয়াইয়া এবং তদ্‌পুত্র জেজিদের সিংহাসনের অবৈধ অধিকারী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আলি এবং তাঁহার স্ত্রী, মহম্মদের কন্যা ফতেমা হইতেই ইমাম পদের প্রকৃত অধিকারী ধরা যাইতে পারে। আরব, বোগদাদ পারস্য দেশে বিবিধ খলিফা বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে সিয়া সম্প্রদায়-ভুক্ত পারস্যবাসী-গণের সহিতই আলির নিকট সম্পর্ক। সিয়া-সম্প্রদায়-ভুক্ত ষষ্ট ইমাম জাফের অতীব পবিত্রাত্মা, জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন, তা র গভীর জ্ঞানের জন্য লোকে তাঁহাকে মনের সহিত তুলনা করিত। তাঁহার চিত "অদৃষ্ট গ্রন্থ" নামে একখানা গ্রন্থ জ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; তাহার সম্বন্ধে টী কিম্বদন্তী আছে, যে ইহুদিদিগের লেজার মত—তিনি মরেন নাই, কিন্তু পুন াগমন করিবেন; তাহার জীবদ্দশাতেই, তাহার পুত্র ইস্মাইল তাহার উত্তরাধিকারী পদে বরিত হয়, কিন্তু তাহার পিতার

পূর্ব্বেই তিনি কয়েকটীমাত্র শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন, সুতরাং তাহার বৈমাত্র ভ্রাতা মোসা কাজেম ইমাম-পদে অভিষিক্ত হয়। মোষার পুত্র আলি অষ্টম ইমাম, মহম্মদ বেন আলি নবম, মহম্মদের পুত্র আলি দশম, হাসন, একাদশ, তাহার পুত্র মহম্মদ। মহম্মদ তাহার পিতার মৃত্যুকালে কেবল শিশু ছিল; দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে কোথায় চলিয়া যায় কেহই বলিতে পারে না, জনশ্রুতি এইরূপ যে বাগদাদের নিকটস্থ সারমেনির একটী গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, সেইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় ধার্ম্মিক সিয়াদিগের উপর অধিকার স্থাপন করিবেন। তিনি যে গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবলমাত্র উপরিভাগে একটী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

তাঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত একটী পৌরাণিক গল্প আছে, তিনি হিজারা সকের ২৫৫ অব্দে সার মেনরি নগরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার জন্মের সময় তাহার পিতামহের ভগিনী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে একটী কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া গিয়াছে, তিনি বলেন যে তাহার জন্মের পূর্ব্বে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, ইহার মাতার ন্যায় তাহার মাতারও পূর্ব্বে কোন গর্ভলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, জন্মের পরক্ষণেই গৃহ স্বর্গীয় আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তিনি ভূনতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিলেন, প্রার্থনায় তাহার

বাক্‌শক্তি ফুটিল, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "দয়াময়, করুণাময় ঈশ্বরের নামে যাহারা আপনার দুর্ব্বলতা স্বীকার করে তাহাদিগকে বল ও উত্তরাধিকারীত্ব প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" শ্যামল পক্ষীর আকারে দেবদূতগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিল, তাহার পিতা তাহাদের একজনকে বলিল 'আপনারা ইহাকে লইয়া প্রতিপালন করুন, ভগবানের আদেশ হইলে সে এখানে আসিবে, ভগবানের অনুগ্রহে তাহার আগমনের বাধা হইবে না।" তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কথাগুলি অঙ্কিত ছিল 'সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা তাড়িত হইয়াছে কারণ মিথ্যা অসার''। পাঁচবর্ষ বয়স্ক্র সময়ই তিনি পিতৃ-অঙ্কচ্যুত হন; কিন্তু ভগবান শৈশব কালেই তাহাকে জন দি বেপ্টিজের মত অসাধারণ জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময়েই তিনি ইমাম পদে বরিত হন। হিজিরা শকের ২৬৫ আর ২৬৬ অব্দে তিনি যে সারমেনরির গহ্বরে প্রবেশ করিলেন আর বাহির হইলেন না, তাহার মাতা তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিনের পর দিন গণিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি আর দেখা দিলেন না। অনেক সৌভাগ্যশালী মুসলমান সেই নিভৃত স্থানে তাহার দেখা পাইয়াছে, একজন তাহার দেখার কথা এইরূপ বলিয়াছে, "আমি দুইজন সঙ্গিকে লইয়া একদিন সারমেনরির রাজপ্রাসাদে গমন করিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া একস্থানে একটি মসারি ঝুলান দেখিতে পাইলাম, মশারি তুলিয়াই গহ্বরের প্রবেশদ্বার দৃষ্ট হইল, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অনেক দূর পথ অতিক্রম করিয়া একটী সমুদ্র দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম সমুদ্র বক্ষ আবৃত করিয়া একখানা কার্পেট বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উপর একটী সুন্দর পুরুষ ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না, আমার সঙ্গীদ্বয় ইমামের দর্শন লাভের জন্য একে একে সমুদ্রে গমন করিল, কিন্তু তাহারা ডুবিয়া গেল, আমি বহুকষ্টে তাহাদিগকে উঠাইলাম; অনুমতি না লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছি বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করিলেন না, আমরা নীরবে ফিরিয়া আসিলাম।'' ইমামের নির্জ্জনবাস দুই ভাগে বিভক্ত। হিজরা শকের ৩৬০ অব্দে প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে, সেই সময় তিনি অনেক অমানুষিক ও অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিতেন, তাহাদিগের শেষ ব্যক্তির মৃত্যুর পরে আর মর্ত্ত্য-ভূমির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই, তখন হইতেই শেষ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যখন তিনি আসিবেন তখনই এই ভাগ শেষ হইবে। প্রলয়ের সময় যে মেহেদি আসিবে সেই মেহেদি এই নির্জ্জন [illegible] হইতেই উঠিয়া আসিবে। যখন মেহেদি আসিবে তখন যিশু আবার ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। মোল্লা কাজিম খলিফাপদ প্রাপ্ত হইলে তাহাদের গৃহ [illegible] করিয়া উঠিল [illegible]

বহ্নিতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা একবারে জনসমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। তখন কুরেস-পরিবার প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উঠে; তাহাদের অদ্ভুত কাহিনী লিখিবার ইহা সময় নহে, এখন বর্ত্তমান মেহেদি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। মেহেদি সম্বন্ধে নানা প্রকার কথা শুনা যায়, কেহ কেহ বলে তিনি একজন সূত্রধর, কেহ কেহ বলে তিনি বন্য-পশু-ব্যবসায়ী, এবং তজ্জন্যই তাহার চরিত্রে অনেকটা পশু প্রকৃতি দৃষ্ট হয়; তিনি বন্য পশুদের ন্যায় দিনে নিদ্রা যান, রাত্রিতে কার্য্য করেন, এই প্রকার অনেক মত প্রচারিত আছে, রেভারেনট পিটারসন বলেন যে তিনি একজন ডোঙ্গোলাবাসী, তাহার নাম মহম্মদ আসমত, আসমত বাল্যকালে তাহার পিতৃব্যের নিকট শিক্ষানবিশি কার্য্যে নিযুক্ত হন, এক দিন তাহার পিতৃব্য তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করেন, সেই জন্য তিনি পলাইয়া খার্টুমে চলিয়া যান, কিছু দিন পরে খার্টুমের নিকটস্থ হগহালি নামক গ্রামের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে তিনি তাহার ধর্ম্মের অনেক সূক্ষ্ম কথা শিক্ষা করেন, তারপর বারবরে গিয়া আর একটী বিদ্যালয়ে ছয়মাস কাল অধ্যয়ন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ফাকি সেক নরেল ডাইমের সহিত মিলিত হন, এবং তাহা দ্বারাই তিনি ফাকি অর্থাৎ দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রধান পদ লাভ করেন; তারপর [illegible] নীল নদীর তীরবর্ত্তী আববাস দ্বীপে গমন করেন, সেখানে ভূগর্ভে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া অনেক দিন নির্জ্জনবাস, উপবাস, ব্রত ও ধ্যান করেন, এই সংবাদ জন সমাজে প্রচারিত হইল, তাহার পবিত্রতার সৌরভ লোকের মন আকর্ষণ করিল। দলে দলে লোক আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, অজস্র ধন তাহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইতে লাগিল, দেশের প্রধান প্রধান লোক তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইল। মহম্মদ চারিজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ব্বের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া নুতন স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপায় অবলম্বন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রীতিমত মেহেদি উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনাকে কোরাণবর্ণিত মহাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বলেন যে, তিনি জন-সমাজে, সাম্য, নীতি, ধর্ম্ম প্র
করিতে আগমন করিয়াছেন, যাহার
কথায় সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস করি
দিগকে সমূলে বিনাশ করা তাঁ
ব্রত। এই মহত্তর ব্রত সাধনে
ত্যাগ করিবে অমনি তাহার
করিবে। মেহেদি বলেন তাহার কার্য্য
করিতে চল্লিশ বৎসর লাগিবে, চল্লিশ বৎ
তিনি কি করিবেন না করিবেন অ
বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে পর
করা যে ইংরাজদের পক্ষে সহজ হইবে
তাহা বুঝা যাইতেছে। বস্তুত এই সংস
মানুষের মন ধর্ম্মের নামে যেমন মা
উঠে এমন আর কিছুতেই নয়; মৃত্যুনদীর পরপারের সেই অন্ধকারময় প্রদেশের কথা

যে বলিবে তাহার দিকে মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ছুটিতে যায় সেই জন্যই সামান্য আসমত আজ পরাক্রান্ত, আজ মুসলমান সমাজের নেতা। আর জগত মুসলমানদিগকে আজ উন্মত্ত বলুক, নির্ব্বোধ বলুক আর যাহাই বলুক, তাহারা সুদূর ভবিষ্যৎ হইতে আশার মোহন ধ্বনি শুনিয়াছে, তাই নাচিতেছে, সংসারের সুখ-বাসনা ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য সমর-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছে।

শ্রীরজনীনাথ নন্দী।

সুখ দুঃখ।

মনুষ্য স্বভাবত বাল্যকাল হইতেই সুখভোগের অভিলাষ করে এবং সংসারে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত সুখের বিচিত্র কল্পনায় ভোর হইয়া থাকে। কিন্তু একবার এই নিবিড় সংসারারণ্যে প্রবেশ করিয়া— যখন চারিদিক হইতে অরণ্যকন্টকের বিষময় আঘাত সহিতে হয় তখনি তাহার সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়—সে তখন চৈতন্য পাইয়া সংসারের কণ্টক হইতে নিজ চরণ নিরাপদে রাখিবার নিমিত্ত বহু- ...ায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। কিন্তু ...ক্ষুর ক্ষীণজ্যোতি দ্বারা সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর ...মানুষ নিরাশায় কাঁদিতে কাঁ- ...পথে আসিয়া পড়ে, তবে ...গমন করুক না কেন, সুখ ...র নিয়ন্তা। সকলেই চুম্বকের ...ার ন্যায় সুখের দিকেই মুখ ফিরাইয়া ...ছ। কেহ বিষয় সুখে, কেহ বা জ্ঞান- ...ন্য,কেহ রণক্ষেত্রের কোলাহল ও অস্ত্রের ...ার মধ্যে, কেহ বা মান মর্য্যাদা যশ ও ...পত্যের সমারোহের মধ্যে, সুখের ...নাদ কল্পনা করিয়া একই উদ্দেশে অথচ ভিন্ন ভিন্ন দিকে সকলে অগ্রসর হইতেছে। ...কন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সুখকে ধ- ...রিতে গিয়া সকলেই দুঃখের জালে জড়া- ...ইয়া পড়েন—এই নাগ পাশ ছেদন করা বড় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। যিনি যাহাই বলুন এসংসারে সকলেরই দুঃখ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সুখশান্তি লাভ করিবার বাসনা মনোমধ্যে নিহিত রহিয়াছে,সুখলাভ করাই সকলের মনের গূঢ় অভিপ্রায় ও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। লোকে যে পৃথিবীর সকল সুখ তাচ্ছিল্য করিয়া আত্মঘাতী হয়, তাহাও সুখপরবশ হইয়া। সুখ এ জগতের অধিপতি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজদর্শনের বাসনা মনে আসিলেই দুঃখের রাজত্বে ক্লেশভোগ করিতে আসিয়া পড়িতে হয়, জ্ঞান বা বিজ্ঞানও আমাদিগকে ইহার হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না— এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর "আধুনিক" য়ুরোপীয় বিজ্ঞানও এবিষয়ে আলোক দান করিয়া সুখকে আমাদের আয়ত্বাধীনে আনিয়া দিতে পারিতেছে না। যাহা হউক সুখ যখন সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীর নিয়ন্তা, সকলেরই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইহার বিষয় বুঝিবার প্রয়াস পাওয়া কোন ক্রমেই অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে তলাইয়া বুঝিতে হইলে উহা কি সর্ব্ব প্রথম তাহা জানাই কর্ত্তব্য। অবিচ্ছিন্ন স্থায়ী আনন্দের ভাবই সুখ; আর কে না জানেন যে বাসনা-পরিতৃপ্তি করাই আনন্দ পাইবার সাধারণ উপায়। সুখ পাওয়াই যখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সেই সুখ যখন বাসনা পূর্ণ হইলে লাভ করিতে পারিব এক[illegible]

তখন আমাদের সমস্ত বাসনাগুলি পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার বাসনা নীতি-বিরুদ্ধ * হইলে তাহা সফল হওয়ার সম্ভাবনা বড় অধিক থাকে না। কারণ একজন কি কয়েক জন ক্ষুদ্র মানব কি কখনও প্রকৃতির গতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া স্বরাজ্য স্থাপনা করিতে পারে? প্রকৃতি অসীম বলের আধার, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান্ হইলে, আমরাই মহান্ বলের সংস্পর্শে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে পেষিত হইয়া যাই। আমরা আপাততঃ হয়ত একটি মিথ্যা কথা কহিয়া নিজের স্বার্থবর্দ্ধন বা অপরের হিতসাধন করিতে পারি কিন্তু তন্নিমিত্ত আমাদিগকে এক সময়ে না এক সময়ে সহ্য করিতে হইবেই—কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না।

যদি কোন ব্যক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলের অবরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে কৃতকার্য্য হয়, তাহাতে যে সে সুখী হয় এরূপও ত কখন দেখা যায় না। মনে করুন এক ব্যক্তি অর্থের লোভে পিতৃ হত্যা করিল, তাহাতে তাহার বাসনা তৃপ্ত জনিত কিছু সুখ পাইল বটে—কিন্তু সে সুখ, সে আনন্দ কতক্ষণের নিমিত্ত? সেই অস্বাভাবিক শোণিত ও অর্থ তৃষ্ণা কিঞ্চিৎ উপশম হইবার পরই, আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখ ও অনুতাপ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবে, এবং সুখও তাহার নিকট হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিবে। অতএব সুখের বাসনা থাকিলে আমাদিগের সদাই এক মনে জ্ঞান ও নীতির পথে বিচরণ করা আবশ্যক, এমন কি মনের উপর এরূপ সতর্কতার সহিত কর্তৃত্ব করিতে হইবে, যেন কোন রূপ অন্যায় অযোগ্যভাব বা বাসনা আমাদের মনের মধ্যে একেবারে আসিতে না পারে।

মনুষ্যের ক্ষমতা এত অল্প যে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতিসঙ্গত বাসনা সুসিদ্ধ করাও সকল সময় সহজ নহে। কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি অতি সহজেই যে বাসনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন, একজন দরিদ্র কৃষিজীবীর সে বাসনা হয়ত কোন কালেই সিদ্ধ হইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন ইচ্ছা থাকিলেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে তাহার আবার কথা কি? ইংরাজীতে একটা ত কথাই রহিয়াছে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই সিদ্ধিরপথ (where there is a will there is a way)। ধর যেন কথাটি সত্য, কিন্তু ইচ্ছা বা ইচ্ছাসিদ্ধির পথটি যে সকল সময়ে অপকৃষ্ট না হইয়া উৎকৃষ্ট হইবে তাহা কে বলিল? আর পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, বাসনা বা উপায় গর্হিত অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইলেও সুখলাভ অদৃষ্টে ঘটে না। কিন্তু বাসনা উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা যে সকল সময় সফল হয় তাহাও ত নহে। মানবচক্ষু এরূপ দূরদর্শী নহে যে ফল লাভের বাসনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। তবে যে যেরূপ লোক তাহার বাসনা গুলি সেই অনুযায়ী হইলেই তাহা পূরিবার সম্যক সম্ভাবনা থাকে। একজন দরিদ্র কৃষিজীবি অবশ্য তাহার ধান্যাদির বিনিময়ে নুন তেল প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য সকল সহজেই পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা দিয়া আর সে কিছু অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা লাভ করিতে পারে না। তবে কোন বাসনাটি পূর্ণ করা

* "নীতি" অর্থে এখানে কোন ধর্ম্ম পুস্তক গ্রথিত নীতি নহে। প্রকৃতি যে পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাই নীতির পথ, প্রকৃতির যাহা নিয়ম নীতিরও তাহাই নিয়ম। আমরা এখানে সেই নীতির কথাই বলিতেছি। তবে আমরা অজ্ঞানান্ধ থাকায় সকল সময় সদসৎ ও ন্যায়ান্যায় বুঝিতে পারি না।

ক্ষমতাধীন আর কোনটি বা নহে, তাহা নির্ণয় করা মনুষ্যের পক্ষে বড়ই সুকঠিন। নেপোলিয়ান ফ্রান্সের অধিপতি হইয়া সমস্ত পৃথিবীর একাধিশ্বর হইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন? আর তাঁহার স্থাপিত সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যই বা কত কাল স্থায়ী হইল? তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই তাঁহার সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। সত্যের ভিত্তির উপর যাহা নির্ম্মাণ কর তাহাই স্থায়ী ও দৃঢ় হইবে, অসত্যের উপর গ্রথিত প্রাসাদ যতই দৃঢ় মনে হউক না কেন, অল্প বাতাসেই তাহা ভূমিশায়ী হইবে। জগতের সকলই বিনাশ পাইয়া যাইবে কেবল সত্যই অনন্তকাল বিরাজ করিতে থাকিবে। সুতরাং সত্যের সহিত আমাদের বাসনার কতটুকু যোগ তাহা দেখিয়াই তাহাকে সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতে হইবে। আর একটী কথা, বাসনা একবার মনের মধ্যে স্থান পাইলেই সেখানে তাহার সাম্রাজ্য স্থাপনে ও দৃঢ়ীকরণে বিশেষ যত্নশীল হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই মনের মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলে। একবার তুমি একটি বাসনাকে মনোমধ্যে আশ্রয় দাও, সেটিকে হয়ত তুমি পূর্ণ করিতে পারিলে, কিন্তু তাহার পশ্চাৎ সহস্র সহস্র উচ্চতর বাসনা আসিয়া তোমার হৃদয়াধিকার করিল—সেগুলি হয়ত সফল হইল না, এইরূপে বাসনার তৃষ্ণা ক্রমশই তোমার বাড়িতে লাগিল, তৃষ্ণা আর কখন নিবৃত্তি হইল না। তাহাতে তুমি সুখ না পাইয়া অনবরত দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলে। মনে কর একটি বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশটাকা জলপানি পাওয়ার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইল। কৃত কার্য্য হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপর তাহার বিশেষ বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল—সে ভাবিতে লাগিল, তাহার চেষ্টাতীত আর নাই—তাহার যাহা ইচ্ছা সে সকলই করিতে পারে। এল, এ, পরীক্ষার সময় হয়ত প্রথম হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু হঠাৎ এমন কোন প্রতিবন্ধক ঘটিল—হয়ত তাহার শরীর অসুস্থ হইয়া ইচ্ছামত প্রস্তুত হইতে পারিল না—কিম্বা কোন একটা বিশেষ কারণ ঘটিয়া, সে এবারকার পরীক্ষায় হয়ত প্রথম না হইয়া বিশেষ নীচে নামিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ইত এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়া থাকে। কেহ বলিতে পারেন যে তাহার পর বি, এ, পরীক্ষায় উচ্চ হইবার বাসনা তাহাকে কিছুকাল বল দিয়া সতেজ রাখিবে। আচ্ছা মনে কর বি,এ, পরীক্ষাতে সে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইয়া সকলের নিকট আদৃত হইয়া আপনার গৌরবে মত্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এইত গেল একটি দৃশ্য, অপর দৃশ্যটি দেখা যাউক। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া হয়ত যুবকটি মনে মনে নানা প্রকার উচ্চ আশা করিয়াছে। কিন্তু সংসারে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না—তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে মূর্খ লোকেও এসংসারে তাহার অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইতে লাগিল; সে পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সকল বিষয়ে বিফল হইতে লাগিল। কেমন বিধির নির্ব্বন্ধ, কৃতকার্য্য হইবার সম্যক আশা ও সম্ভাবনা সত্বেও সে পদে পদে হুচট খাইতে লাগিল। এরূপ হুচট খাইয়া খাইয়া অকূল সংসারসমুদ্রে বাত্যাহত ভগ্নতরীর ন্যায় কত নিরাশ হৃদয় অনুকূল তরঙ্গের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ইংরাজীতে একটি উক্তি আছে, There is may a slip betwixt the cup and the slip (হাতের গ্রাস মুখে যাইবার আগে অনেক ব্যাঘাত ঘটিতে পারে)—ইহা যে কিরূপ সত্য, তাহা বোধ হয় সকলেই ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়া

অবিচ্ছিন্ন নিশ্চিত সুখলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তবে বাসনা যাহার যত অল্প এবং সঙ্কীর্ণ তাহাকেই আমরা তত সুখী বলিয়া পরিচয় দিই। এইরূপে বর্ত্তমানে সুখ না পাইয়া আমরা ভবিষ্যতের ক্রোড়ে শয়ান হইয়া আপনাদিগকে মায়ার জালে জড়াইতে থাকি; এবং এই উপায়ে একটির পর অপর একটি দুঃখ আসিয়া ক্রমশঃ আমাদিগকে চিরজীবনের জন্য অভিভূত করিয়া ফেলে। পাঁচ লক্ষ লোক এইরূপে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া মরিতেছে আর পাঁচটি হয়ত এসংসারে কৃতকার্য্য হইয়া বুক ফুলাইয়া চলিতেছে। তাহা ছাড়া যোগ্যই জীবিত থাকিবে (Fittest will survive) ফলবাদীদিগের এই যে মত—ইহাও যে দৈবনির্ব্বন্ধের (chapter of accidents)এর অন্তর্ভূত নহে তাহা কে*বলিবেন? আমরা চেষ্টাও যত্নদ্বারাই যে কৃতকার্য্য হই তাহা কি প্রকারে বলিতে পারি—? তাহা যে বিশ্বের কোন অজ্ঞাত নিয়মের অন্তর্ভূত নহে তাহা কে বলিবেন? আমরা যেমন হঠাৎ বলিয়া উঠি কপালে সবই হয়, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া লোকের দুঃখের মীমাংসা করি, সে মীমাংসা অভাগাদের বিষয়েই খাটাইব, আর সৌভাগ্যশালীদের বিষয়ে কপাল বা অদৃষ্টের কথা না বলিয়া তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধিবলের গৌরব করিব— এ কোন বিজ্ঞানের কথা? তাহাই যেন হইল হাজারের মধ্যে আমিই যেন সৌভাগ্যবান হইয়া জীবিতই রহিলাম কিন্তু সুখ পাইলাম একথা কে বলিবেন? এরূপত্ত দেখা গিয়াছে, উচ্চ উচ্চ পদলাভ করিয়াও, এমন কি রাজ্যপদ লাভ করিয়াও মনুষ্যে সুখী হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা বাসনা পূর্ণ করিয়া সুখ লাভ করা অসম্ভব; কারণ বাসনা অনন্ত কিন্তু মনুষ্যের ক্ষমতা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। যযাতি সহস্র বর্ষকাল বিষয় সুখ ভোগ করিয়া পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত শস্য, সুবর্ণ, পশুপক্ষী ও রমণী এক ব্যক্তিরও তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম নহে।

অনেকে হোসেন খাঁ প্রভৃতি লোকের অদ্ভূত কার্য্য দেখিয়া, অমনি মনে করিয়া বসেন, যে সেইরূপ ক্ষমতা পাইলেই, তাঁহারা সকল বাসনা তৃপ্ত করিয়া সুখে থাকিতে পারিতেন। আমাদের দেশে এই প্রকারের অনেক প্রাচীন প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত* থাকাতে আমাদিগকে আরও সেইদিকে আকৃষ্ট করে। বিপুল ক্ষমতা পাইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে নচেৎ মনোকষ্ট ও অনুতাপ আসিবেই আসিবে। মানুষ ত মানুষ বটে। ন্যায় অন্যায় বিবেচনার জ্ঞান যখন আমাদের মনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তখন বিপুল ক্ষমতা থাকিলেও, রিপুদমন না

---

* যাঁহারা কর্ম্মফল স্বীকার করেন তাঁহাদের নিকট Chapter of accidents বলিয়া কোন শব্দব্রহ্ম কখন নাই, আর তাঁহাদের অনিশ্চিতের উপরও নির্ভর করিতে হয় না।

* প্রবাদ আছে, পূর্ব্ব কালের আর্য্য ঋষিরা অনেকে অসাধারণক্ষমতাবান্ ছিলেন; এবং একালেও সেইরূপ মহাপুরুষ আছেন, এরূপও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। এরূপ অসামান্য ক্ষমতা থাকিলেও তাঁহারা যে কোনরূপ অন্যায় করিতে পারেন এরূপত কোন ক্রমেই মনে হয় না। প্রকৃতির গতি সে নীতি বিরুদ্ধ তাহা নহে—তাঁহারা যে উপায়েই ক্ষমতা পাইয়া থাকুন না কেন, তাঁহারা যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিশ্বজগতের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন, এরূপ ত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

করিলেও ক্ষমাবান না হইলে আমাদের আনন্দলাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের ক্ষমতাও আমাদের মনোমধ্যে এরূপ প্রবল হওয়া আবশ্যক যে কোনরূপ অন্যায় অসৎ বাসনা আসিয়া কোন উপায়ে আমাদিগকে অসুখী করিতে পারে না। মনুষ্য যত ক্ষমতাবান্ হইবে, ততই এই ক্ষমতা পরিচালনার পরিসর ক্ষেত্র খুঁজিবে; এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাহাকেই পৃথিবীর ক্রীতদাস হইয়া পড়িতে হইবে, সুতরাং ইহাতেও নিজের সুখ নাই। বরং প্রথম প্রথম পাশব প্রবৃত্তিগুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়, ও মনকে বিশেষ প্রকারে নিজের অধীনে আনিতে হয়, নচেৎ বাসনা আসিয়া সুখদুর্গকে একেবারে চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহাতেই বুঝা যায় যে পৃথিবীতে বাসনা থাকিলে আর কিছুতেই সুখ পাওয়ার উপায় নাই পদে পদে আমাদিগকে দুঃখই পাইতে হয়। তবে সুখভোগের বাসনা করিয়া মনুষ্যের অধিক দুঃখ পাইবার প্রয়োজন কি আছে? তবে এই মায়াবী আলেয়ার পশ্চাৎগামী হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য ও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই কেন? সুখ দুঃখ আমাদের নিকট একই হউক না কেন? কষ্ট বা দুঃখ যখন আমাদিগকে ধরিবেই ধরিবে, তখন অনর্থক উহাদের হইতে পলায়ন করা কিসের জন্য, আমরা প্রসন্ন চিত্তে উভয়কেই আলিঙ্গন করি না কেন? সুখেতেও বিমুগ্ধ থাকিব না, দুঃখেতেও নিরাশ বা কাতর হইব না—তাহা হইলেই আমরা উহাদের হইতে উচ্চে উঠিতে পারিব। আমরা যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হই না কেন, কিছুতেই ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একাগ্রচিত্তে কর্ত্তব্য সাধনেই যত্নশীল হইব। যখন চেষ্টা ও যত্ন করিলেই ফললাভ হয় না, তখন প্রাণ পণে হিতসাধনের চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, ফল লাভ হইল কি না হইল কিছুতেই টলিব না, অটল অচলের ন্যায় কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহাকেই আমাদের জীবনের ধ্রুবনক্ষত্র করিয়া উহার পদতলে সকল আশা বাসনা, অভিলাষ, গর্ব্ব, অহঙ্কার-সমস্তই বিসর্জ্জন দিব। বাসনা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে পারিলে আর কিছুতেই দুঃখ দিতে পারিবে না। পৃথিবীর যাহাকে নিত্য দুঃখ বল তাহা হইতে বিমুক্ত থাকিবে এবং বাসনা সুখ দুঃখ এসকল কিছুই নাই বলিয়া তোমার মন একপ্রকার আনন্দে পূর্ণ থাকিবে। তাহাকে তুমি দুঃখ-মুক্ত (negative) সুখমাত্র বল, তাহাতে ক্ষতি নাই। উহা দুঃখের অভাবই হউক বা স্পষ্ট সুখই হউক আমাদের জীবনের উপর উহার পূর্ণ প্রভাব, মনুষ্য-হৃদয়ে আনন্দ দিবার ক্ষমতা উহার অসীম। বাসনা বিনাশ করিতে পারিলে তুমি মায়াময় এই পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর নহ, এই পাপপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও সংসারী নহ; তখন তুমি নিজের প্রভু, সংসারের প্রভু, জগতের প্রভু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু। তখন তুমি বাসনাধীনদিগের অপেক্ষাও যত্নের সহিত, হৃদয়ের সহিত তোমার সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে। ইহজগতে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া, ভবিষ্যতের সহস্র সহস্র বিমর্ষ বিশুষ্ক হৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন করিয়া, কর্ত্তব্যের পথ দিয়া তুমি চলিয়া যাইবে। কাল তোমার পঞ্চভূতাত্মক এই ছার দেহকে অধিকার করিবে সত্য, কিন্তু তোমার অতুল-কীর্ত্তি ও জ্বলন্তমহিমা তোমাকে চিরকালেরই জন্যই এ পৃথিবীতে জীবন্ত রাখিবে।

শ্রী——শর্ম্মা।